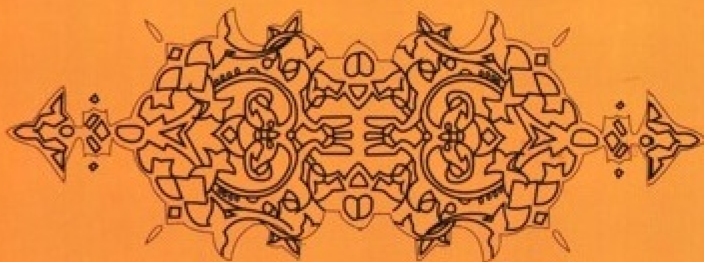


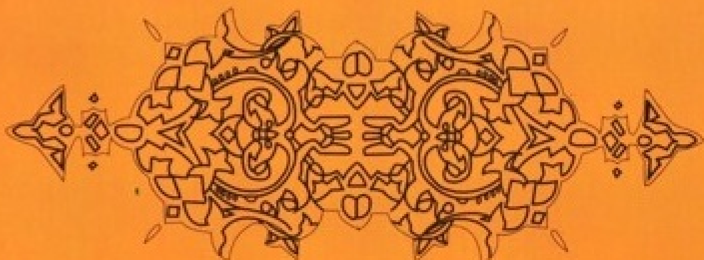
দারসে হাদীস

(ভলিউম-১)

(১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে)

দারসে হাদীস

মাওলানা খলিলুর রহমান মুমিন



রাসূল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা ধারণ করো এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো। (সূরা হাশর : ৭)

দারসে হাদীস

ভলিউম-১

(১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে)

[পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ]

মাওলানা খলিলুর রহমান মুমিন

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
বড় মগবাজার, ঢাকা
ফোন: ০১৭১১ ১২৮৫৮৬, ০১৫৫২৩৫৪৫১৯

দারসে হাদীস

ভলিউম-১

মাওলানা খলিলুর রহমান মুমিন

প্রকাশক

এ এম আমিনুল ইসলাম

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স

ওয়ারলেস রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা।

ফোন: ০১৭১১ ১২৮৫৮৬

প্রকাশকাল

ভলিউম আকারে

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল' ২০০৯ইং

দ্বিতীয় প্রকাশ : এপ্রিল ২০১১ ইং

কম্পোজ ও ডিজাইন

প্রফেসর'স কম্পিউটার

মগবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ:

মার্জান প্রিন্টিং প্রেস

মগবাজার, ঢাকা

PPBN-019/1

ISBN-984-31-1426-0

মূল্য : একশত বিশ টাকা মাত্র

DARS-E-HADISH, VOLUME -01. PUBLISHED BY PROFESSOR'S PUBLICATIONS, BORO MOGHBAZAR,DHAKA-1217. PRICE

নতুন সংস্করণে প্রকাশকের কথা

আলহাম্‌দুলিল্লাহ। মাত্র ৩ বৎসরের ব্যবধানে বইটির দুটো সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় বুঝা যায় সম্মানিত পাঠকবর্গ অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বইটি গ্রহণ করেছেন। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে বইটির কয়েকটি মুদ্রণ দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়া-ই তার প্রমাণ। সাথে সাথে বিভিন্ন জায়গা থেকে পাঠকবর্গ প্রথম খণ্ডটিকে বর্ধিত আকারে প্রকাশ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তাই এ সংস্করণে তিনটি নতুন হাদীস সংযোজন ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হলো। অনেক পাঠক কয়েকখণ্ড একত্রে প্রকাশ করার পরামর্শ দেন। তার আলোকে আমরা বইটির ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে **ভলিউম-১** এবং ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড একত্রে **ভলিউম-২** আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এতে বইটির প্রথম খণ্ডে ১৫টি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ১৭টি বিষয়ের উপর দারস প্রকাশ করা হলো। আল্লাহ্ চাহেতো ভলিউমগুলোও পূর্বের মতই পাঠক প্রিয়তা পাবে, ইনশাআল্লাহ।

ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধির মুখেও আমরা যথা সম্ভব দাম কম রাখার চেষ্টা করেছি। আশা করি পাঠক সমাজ সহজভাবে মেনে নেবেন। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন এবং হাদীসের আলোকে জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

-এ এম আমিনুল ইসলাম
প্রকাশক

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা। সহস্রকোটি দরূদ ও সালাম সমস্ত নবী-রাসূলগণের উপর। শেষ নবী মুহাম্মদ (স.), তাঁর পরিবারবর্গ এবং সমস্ত সঙ্গী-সাথীদের উপর।

সাম্প্রতিক কালে বাংলা ভাষায় কোরআন হাদীসের চর্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এতদসঙ্গে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যেও মাতৃভাষায় ইসলামকে বুঝার অদম্য স্পৃহা জাগছে। ইতিমধ্যে আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন অনেকগুলো তাফসীরগ্রন্থ মাতৃভাষায় প্রকাশ হয়েছে। পাশাপাশি নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থগুলোও অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তাফসির গ্রন্থের তুলনায় হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তেমন একটা হয়নি।

এতদিন আশায় বুক বেঁধে ছিলাম, হয়তো কোন যোগ্যব্যক্তি এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিবেন। কিন্তু হতাশ হয়েই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। আমি জানি এটা ধৃষ্টতার নামান্তর। কারণ আমার জ্ঞানের যে বহর তাতে হাদীসের সমুদ্রে প্রবেশের অধিকার আমার নেই। তবুও আমি মনে করি আমার মতোই অনেক ভাই আছেন যারা দারসে হাদীসের বইয়ের জন্য উম্মুখ হয়ে আছেন। তাই আমার ক্ষুদ্র বইখানা যদি তাদের কোন উপকারে আসে তবে শ্রম স্বার্থক জ্ঞান করবো।

বইটি নতুন আঙ্গিকে ভলিউম আকারে প্রকাশ করার জন্য আমি প্রকাশকের নিকট কৃতজ্ঞ। বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে আমি অনেকের কাছে ঋণী। বিশেষ করে মোহতারাম রেজাউর রহমানের নাম উল্লেখ করতে হয়। তাঁর সহযোগিতার কথা ভোলা যায় না।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে আকুল ফরিয়াদ তিনি যেন হাশর ময়দানে মুসিবতের সময় এই বইখানা আমার নাজাতের উসিলা করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ এবং পাঠকসহ সকলের জন্য আল্লাহর দরকারে দোয়া করছি। আমীন।।

বিনীত
খলিলুর রহমান মুমিন

সূচীপত্র

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِاِمْرِئٍ مَّانَوٰى - فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَاهَاجَرَ اِلَيْهِ (بخارى - مسلم)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঁ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমায়েছেনঃ সমস্ত কাজ–কর্মই নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং প্রতিটি মানুষের জন্য তাই রয়েছে যা সে নিয়ত করেছ। অতএব যে আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে হিজরত করবে তার হিজরত আল্লাহ এবং তার রাসূলের দিকেই (পরিগণিত) হবে। যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে অথবা কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে তার হিজরত সে দিকেই (গণ্য) হবে। যার দিকে সে হিজরত করেছে।" (বুখারী,মুসলিম)

শব্দার্থ

عَنْ – হ'তে। قَالَ –তিনি বলেছেন। اِنَّمَا –নিশ্চয়ই। اَلْاَعْمَالُ –কৃতকর্ম। بِ – সাথে। اَلنِّيَّاتُ –ইচ্ছা, অভিপ্রায়। لِاِمْرِئٍ – প্রত্যেক মানুষের জন্য। مَا – যা। نَوٰى –নিয়ত করেছেন। فَ – অতঃপর। مَنْ – যে (ব্যক্তি) كَانَتْ هِجْرَتُهٗ – হিজরত করেছে। اِلٰى –জন্য, দিকে। دُنْيَا –পৃথিবী। يُصِيْبُهَا –সে তাই লাভ করবে। اِمْرَأَةٌ – স্ত্রীলোক। يَتَزَوَّجُهَا – তাকে (স্ত্রী) বিয়ে করবে। اِلَيْهِ –তার দিকে।

বর্ণনাকারীর (রাবীর) পরিচয়

হযরত উমর (রা) এর পিতার নাম খাত্তাব। মায়ের নাম হান্তামা। তিনি শৈশবে পিতার মেষের রাখালী করতেন। যৌবনে ব্যবসা শুরু করেন এবং যথেষ্ট উন্নতি করেন। তিনি শৈশব হতেই প্রখর মেধাসম্পন্ন ছিলেন। যুদ্ধবিদ্যা, কুস্তি, বক্তৃতা ও বংশতালিকা সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয় কৃতিত্বের সাথে আয়ত্ব করেন। হযরত উমর (রা) ছিলেন তাঁর সময়ের শ্রষ্ঠ কুস্তিগীর। মুসলমানগণ আবিসিনিয়া হিজরতের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাও খুব আকর্ষণীয়। কারণ তিনি কাফের থাকাবস্থায় একদিন হুজুরে পাক (সা) কে হত্যা করতে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে শুনতে পেলেন। তাঁর বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব (রা) মুসলমান হয়েছেন। তখন সরাসরি বোনের বাড়ী গিয়ে বোনকে এবং ভগ্নিপতিকে মারধর করেন। এক পর্যায়ে বোনের রক্ত দেখে অনুতপ্ত হন এবং বোন-ভগ্নীপতির নিকট সূরা ত্বাহা শুনে বা দেখে হযরত খাব্বাব (রা) সাথে গিয়ে নবী করীম (সা) এর নিকট মুসলমান হন। তিনি ছিলেন সেই সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি যাঁর ইসলাম গ্রহণে আসমানের অধিবাসীগণ উৎফুল্ল হয়েছিলেন। হযরত উমর (রা) এর ইসলাম গ্রহণের পর প্রত্যক্ষভাবে দাওয়াতী কাজ ও আযানের প্রচলন হয়। তিন ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক; একাধারে বীরযোদ্ধা, ফকীহ, মোফাচ্ছির, মোহাদ্দিস ও উচ্চ পর্যায়ের একজন মুত্তাকী। তিনি বদর, উহুদ, খন্দকসহ প্রত্যকটি যুদ্ধেই রাসূল (সা) এর সাথে শরীক হয়েছিলেন। তিনি নবী করীম (সা) এর নিকট নিজ কন্যা হযরত হাফসা (রা) কে বিয়ে দেন, সেই সূত্রে তিনি মহানবী (সা) এর শ্বশুর। খোলাফায়ে রাশেদার দ্বিতীয় খলিফা এবং আশারায়ে মোবাশশারার একজন। হযরত উমর (রা) হতে মোট ৫৩৯ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসটির গুরুত্ব

ইসলামে "আকিদাহ্" এবং "ইবাদাত" সংক্রান্ত যা কিছু বলা হয়েছে এ হাদীসটি হচ্ছে তাঁর মূলনীতিস্বরূপ। এ হাদীসটি যদিও একমাত্র হযরত উমর (রা) ছাড়া অন্য কোন সাহাবী-ই বর্ণনা করেননি তবুও এটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে, সর্বজন জ্ঞাত ও প্রসিদ্ধ হাদীস সমূহের অন্যতম এ হাদীসটি। বুখারী ছাড়াও মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিযি, নাসাঈ, ইবনে-মাজাহ সহ মুসনাদে আহমাদ,

দারা কুতনী, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ স্ব স্ব কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। বুখারী শব্দের সামান্য পার্থক্য সহকারে এ হাদীসটি সাত জায়গায় বর্ণনা করেছেন। (মওলানা আব্দুর রহীম কৃত হাদীস শরীফ ১ম খন্ড দ্রষ্টব্য।)

পটভূমি

নবী করীম (সা) এবং মুসলমানগণের উপর যখন কাফেরদের নির্যাতন চরম সীমায় উপানীত হয় তখন আল্লাহর প্রত্যাদেশ (ওহী) অনুযায়ী সকল মুসলমান নর-নারী রাসূলুল্লাহ (সা) এর নির্দেশে মদীনায় হিজরত করেন। তখন এক ব্যক্তি শুধুমাত্র একজন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য হিজরত করেছিলো। ঐ ব্যক্তির নিকট ঈমান এবং হিজরতের গুরুত্বের চেয়েও বেশী ছিলো মহিলাকে বিয়ের গুরুত্ব। তখন নবী করীম (সা) হাদীসটি বর্ণনা করেন।

ব্যাখ্যা

(ক) নিয়ত : নিয়ত শব্দের আভিধানিক অর্থ মনের দৃঢ় সংকল্প, অন্তরের গভীর ইচ্ছা, স্পৃহা। শরীয়তের পরিভাষায়-------

هو قصدك الشئ بقلبك وتحرى الطلب منك

"তোমাদের মনের দ্বারা কোন জিনিসের প্রতি লক্ষ্য আরোপ করা এবং নিজের দ্বারা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা।" (ইমাম খাত্তাবী)

ফতহুর রব্বানী ২য় খন্ডে বলা হয়েছেঃ-

فوجه القلب جهت الفعل ابتغاء وجه الله تعالى وامتثالاً لامره

"খোদার সন্তোষ লাভ ও তাঁর আদেশ পালনার্থে কোন কাজ করার দিকে মনের লক্ষ্য আরোপ ও উদ্যোগ।"

অত্র হাদীস অনুসারে ইমাম শাফেয়ী (রা) বলেনঃ প্রত্যেক কাজে নিয়ত করা অপরিহার্য। তাঁর দলিল "ইন্নামা" শব্দের পর "সিহ্হাতুন" শব্দটি উহ্য রয়েছে। যেমন اِنَّمَا صِحَّةُ الاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

অর্থাৎ আমল ও ইবাদতের বিশুদ্ধতা নিয়তের উপর নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা (রা) বলেনঃ সকল ইবাদাতে বা কাজে নিয়ত শর্ত নয়। হানাফী ইমামগণ বলেনঃ শব্দের পর -- ثَوَابٌ শব্দটি উহ্য আছে। অর্থ

যেমন اِنَّمَا ثَوَابُ الاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"ইবাদতের সওয়াব প্রাপ্তি নিয়তের উপর নির্ভরশীল।" ইবাদাত নিয়ত ছাড়াও শুদ্ধ হয়ে যায়। যেমন ওযুতে নিয়ত না করলে সওয়াব পাওয়া যাবে না কিন্তু এ ওযু দ্বারা নামায শুদ্ধ হবে। যাহোক হানাফী ইমামগণের চূড়ান্ত কথা এই যে, ভালো কাজের সওয়াব নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

নিয়ত বা উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই কাজের গতি প্রকৃতি নির্ণয় হয়। যে কাজ সৎ নিয়তে বা সৎ উদ্দেশ্যে করা হবে তা সৎকাজ রূপে গণ্য হবে এবং তার বিনিময় আল্লাহর নিকট প্রাপ্য হবে। পক্ষান্তরে ভাল কাজও যদি খারাপ নিয়তে করা হয় তবে আল্লাহর নিকট তা কখনও সৎকাজ রূপে গণ্য হবে না, আর এর বিনিময়ও সে পাবে না। এখানে কারো ধারণা হতে পারে, নিয়তের উপর যখন কাজের মুল্যায়ন হয় তখন খারাপ কাজও ভাল নিয়তে করলে তা সৎকাজ হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত। যেমন অনেকে সুদভিত্তিক ব্যাংকে টাকা রেখে সেখান থেকে প্রাপ্ত সুদের টাকা গরীবদেরকে সওয়াবের নিয়তে দান করে। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, যে কাজ স্বয়ং আল্লাহ অথবা তাঁর রাসূল (সা) নিষেধ করেছেন, তা মূলতই খারাপ ও পাপের কাজ। কাজেই কোন পাপের কাজে সৎ নিয়ত করাটাই একটি পাপ। কারণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) যে টা খারাপ হিসেবে ঘোষণা করেছেন তা খারাপ মনে করে দূরে থাকাই ঈমানের দাবী। অধিকন্তু এরূপ করলে আল্লাহর দ্বীনকে খেল তামাসার বস্তু মনে করা হয়।

বস্তুতঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরকালে মানুষের বাহ্যিক কৃতকর্মের উপর বিচার করবেন না, নিয়ত বা আন্তরিকতার উপরই বিচার কার্য অনুষ্ঠিত হবে। কেননা আল্লাহতো মানুষের মানসপটে বুদবুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী যে চিন্তা ভাবনা

স্থান পায় তার খবরও রাখেন। যেমন আল কুরআনে বলা হয়েছেঃ

আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলের খবর ও রাখেন।

হাদীসে বলা হয়েছেঃ

عَنْ اَبِىْ هُـرَيْـرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَايَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ -

(مسلم)

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক আকার আকৃতি ও ধন সম্পদের দিকে চান না বরং তিনি দেখেন তোমাদের মনের অবস্থা ও কাজকর্ম। (মুসলিম)

বুঝা গেল মানুষ মানুষকে প্রতারণা করতে পারে কিন্তু আল্লাহকে প্রতারণা করার ক্ষমতা কারো নেই। তাই সকলকেই যখন তাঁর নিকট ফিরে যেতে হবে তখন সর্বদ্রষ্টা মহান আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁর নিকট ফলাফলের প্রত্যাশা রেখেই যাবতীয় কাজকর্ম করা উচিত।

(খ) **হিজরতঃ** -- (হিজরত) অর্থ ত্যাগ করা বা সম্পর্ক ছিন্ন করা। শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর হওয়ার নাম হিজরত।

কোন মুসলমান অথবা মুসলমান সম্প্রদায় কোথাও যদি কোন কারণে স্বাধীনভাবে ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে না পারে, যেমন কোন দেশের প্রশাসন ক্ষমতা কোন মুশরিক বা কাফেরের হাতি থাকায় ইসলামী বিধি- নিষেধ পালনে বাধার সৃষ্টি করে; অথবা কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধর্মী সম্প্রদায় বাধা সৃষ্টি করার কারণে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, তবে ঐ স্থান হতে অপেক্ষাকৃত ভালো দেশ বা কোন ইসলামী হুকুমতে (যদি থাকে) স্থানান্তর হয়ে দ্বীনি কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়াই হিজরতের লক্ষ্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মক্কী জীবনের ১৩ বৎসর কালের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলেই উপরোক্ত বক্তব্য দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়ে উঠবে।

শিক্ষা

অত্র হাদীস হতে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষাগুলো পাই।

(১) আল্লাহর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কোন কাজ করার ক্ষমতা মানুষের নেই।

(২) ভালো কাজের বিনিময় আল্লাহর নিকট পাওয়া যাবে।

(৩) প্রতিটি সৎকাজে নিয়তের বিশুদ্ধতা থাকতে যাবে।

(৪) সৎনিয়তে অসৎ কাজ করা যেমন অবৈধ তেমনিভাবে সৎকাজ ও অসৎ নিয়তে করা অবৈধ।

(৫) দীনের প্রয়োজনে হিজরত করা জায়েয।

তথ্যসূত্র

১। সহীহ আল বুখারী।
২। সহীহ আল মুসলিম।
৩। রিয়াদুস সালেহীন।
৪। ফতহুল বারী।
৫। উমদাহুল কারী।
৬। হাদীস শরীফ ১ম খন্ড।
৭। সাহারা চিরত ইসলামকি ফাউন্ডেশন।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِىَ الاِسْلاَمُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ - (بخارى، مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত নবী করীম (সা) বলেছেনঃ "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর সংস্থাপিত। যথা– (১) আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা এবং রাসূল– এ কথার সাক্ষ্য দেয়া। (২) নামায কায়েম করা (৩) যাকাত প্রদান করা (৪) হজ্ব করা এবং (৫) রমযান মাসে রোযা রাখা।" (বুখারী, মুসলিম)

শব্দার্থ ঃ

بُنِىَ – ভিত্তি করা হয়েছে। خَمْسٍ –পাঁচ। شَهَادَةُ –সাক্ষ্য দেয়া। اَنْ – যে। وَ –এবং। اَنَّ – নিশ্চয়ই। عَبْدُهٗ – তাঁর (আল্লাহ্‌র) বান্দা। رَسُوْلُهٗ –তাঁর রাসূল। اِقَامِ – প্রতিষ্ঠিত করা। اِيْتَاءِ –দেয়া।

রাবীর (বর্ণনাকারীর) পরিচয়

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) ছিলেন দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) এর ছেলে এবং নবী করীম (সা) এর সাহাবী। তিনিও পিতার মতো একজন উঁচু স্তরে আলেম এবং বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন ফকীহ, মোফাচ্ছের ও মুহাদ্দিস। তিনি মর্যাদা ও পূর্ণতার উচ্চ আসনে সমাসীন ছিলেন। তাঁর এ মর্যাদায় অনেকে ঈর্ষা করতেন। ইমাম মালেক (রা) এর মুয়াত্তায় বর্ণিত আছে যে, তিনি শুধু সূরা বাকারা নিয়েই ১৪ বৎসর গবেষণা চালিয়েছেন। হাদীস শাস্ত্রেও তাঁর দখল ছিলো পূর্ণমাত্রায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইমর (রা) থেকে মোট ১০৩৬টি মতান্তরে ১৬৩০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বুখারী মুসলিমের ঐক্যমত্যের হাদীস ১৭০টি। এছাড়া

বুখারী ৮১টি এবং মুসলিম ৩১টি হাদীসে ভিন্নমত পোষণ করেন। হিজরী ৭০ সনে ৮০ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। মহানবী (সা) ছাড়াও তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে ছিলেন হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা) হযরত উমর (রা) (পিতা), হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা), হযরত হাফসা (রা) (বোন), হযরত আবদুল্লাহ ইবেন মাসউদ (রা), হযরত বেলাল (রা), হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (র) প্রখুখ বিখ্যাত সাহাবীগণ।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এর ছাত্রগণের মধ্যে ছিলেন নাফে (র), হাফস (র), সাঈদ ইবনে যুবায়ের (র) ইকরামা (র), মোজাহিদ (র), তাউস (র), আতা (র) প্রমুখ তাবেয়ীগণ।

বর্ণনা কাল

যেহেতু এ হাদীসে হজ্জের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাই প্রমাণিত হয় যে, অত্র হাদীস ৯ম হিজরীর শেষ দিকে অথবা ১০ম হিজরীতে বর্ণিত হয়েছে। কারণ একথা স্বীকৃত ও প্রমানিত যে ৯ম হিজরীতে হজ্জ ফরজ করা হয়েছে। তাছাড়া নামায, যাকাত ও সওম ইতিপূর্বেই ফরজ ঘোষিত হয়েছিলো।

হাদীসটির গুরুত্ব

প্রত্যেক বস্তুর একটি মূল বা ভিত্তি থাকে। তেমনি ইসলাম নামক সুবিশাল এবং সুদৃঢ় প্রাসাদের ভিত্তি হচ্ছে হাদীসে উল্লেখিত পাঁচটি বস্তু। এ পাঁচটি ভিত্তির উপর ইসলামের যাবতীয় হুকুম-আহকাম, আকাইদ-ইবাদত, তৌহিদ, রেসালত ও আখিরাত নির্ভরশীল, এখানে একটি কথা ভালো করে বুঝে নেয়া আবশ্যক। তা হলো অত্র হাদীসে কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ এবং যাকাত এই পাঁচটি বস্তুকে ইসলামের ভিত্তি বা মূল বলা হয়েছে মাত্র। পূর্ণ ইসলাম বলা হয়নি। কোন ব্যক্তি পাঁচটি ভিত্তি স্থাপন করেই যেমন পূর্ণাঙ্গ প্রাসাদের দাবী করতে পারে না তেমনি কোন ব্যক্তি হাদীসে বর্ণিত পাঁচটি কাজ করেই পূর্ণাঙ্গ ইসলাম পালনের দাবী করতে পারে না। অবশ্য একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, কোন বস্তুর ভিত্তি যতো মজবুত হবে ঐ বস্তুর পরিপূর্ণ রূপও ততো শক্তিশালী হবে। তদ্রূপ ইসলামের এ পাঁচটি ভিত্তি যতো দৃঢ় ও মজবুত হবে ইসলামের পরিপূর্ণ রূপও ততো সুন্দর ও শক্তিশালী হবে। বস্তুত ইসলামে এ হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্যাখ্যা

(ক) কালেমার স্বীকৃতিঃ হাদীসে বলা হয়েছে-"যে সাক্ষ্য দিবে" সাক্ষ্য বা "শাহাদাত" শব্দটি আরবী ভাষায় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি অর্থতো হলো কোন বিষয় জেনে বুঝে এবং চিন্তা ভাবনা করে নিজের স্বীকৃতি দেয়া। উল্লেখিত বাক্যটির দু'টো অংশ আছে, প্রথম অংশ হলো আল্লাহকে "ইলাহ" হিসেবে মানা। "ইলাহ" শব্দটি আরবী অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-স্রষ্টা, বিধানদাতা, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, রিজিকদাতা, মৃত্যুদাতা, প্রতিপালনকারী ইত্যাদি। এখানে "ইলাহ" শব্দের সব কয়টি অর্থ একত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ জীবনের সকল দিক ও বিভাগে একমাত্র আল্লাহকেই "ইলাহ" মানতে হবে। এই বাক্যের দ্বিতীয় অংশ হলো হযরত মুহাম্মদ (সা) কে রাসূল হিসেবে মানতে হবে। সাথে সাথে এ কথাও মানতে হবে যে, তিনি একজন মানুষ বা বান্দা। আর রাসূল হিসেবে মানার অর্থই হলো তাঁর ২৩ বৎসরের নবুওয়তী জীবনে আল্লাহর নিকট হতে যতো হুকুম আহকাম পেয়েছেন এবং তিনি সেগুলোর যেভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা (নবী হিসেবে) করেছেন, যা বলেছেন সব কিছু বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়া। এখানে তাঁর কোন কথা বা কোন কাজ পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে বাদ দেয়ার বা না মানার অধিকার কোন মুসলমানের নেই। উপরোক্ত সমস্ত কথা ও দিক ভালোভাবে জেনে বুঝে স্বীকৃতি দেয়ার কথাই এখানে বলা হয়েছে।

(খ) নামাযঃ মৌখিক কালেমা পাঠ করে মানুষ যে স্বীকৃতি দেয় তার বাস্তব রূপায়ন ঘটে নামাযে। কোন মানুষ ইসলামে প্রবেশ করার পর স্রষ্টার পক্ষ থেকে তার উপর প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে নামায। আর একমাত্র এ নামাযই কাফের এবং মুসলমানের মধ্যে পার্থক্যকারী।

মহানবী (সা) বলেছেনঃ -

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلٰوةِ (مسلم)

"বান্দা এবং কুফুরীর মধ্যে পার্থক্যকারী হলো নামায।" (মুসলিম)

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছেঃ-

اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ فَمَنْ اَقَامَ الصَّلٰوةَ فَقَدْ اَقَامَ الدِّيْنَ وَمَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ -

"নামায দ্বীনের খুঁটি বা স্তম্ভ। যে ব্যক্তি নামাযকে প্রতিষ্ঠিত করলো সে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করলো; যে নামাযকে পরিত্যাগ করলো সে যেন দ্বীনকে ধ্বংস করে দিলো।"

একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়তে নামাযের ভূমিকা অন্যতম। নামাযই পারে ব্যক্তির জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত অন্যায় ও অশ্লীলতাকে রোধ করতে। এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহরাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেনঃ-----

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ –

"নিশ্চয়ই নামায অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে (মানুষকে) বিরত রাখে।"
(সূরা আনকাবুতঃ৪৫)

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে ও নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম। যেমনঃ-

(১) **সংঘবদ্ধ জীবনের প্রেরণা ও ট্রেনিংঃ** মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ও সামাজিকতা ছাড়া কোন মানুষ বাঁচতে পারে না। তাই নামায মানুষকে সংঘবদ্ধ জীবনের প্রেরণা দেয়ার সাথে সাথে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার ট্রেনিং দেয়। যাতে বাস্তব জীবনের অর্থাৎ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অফিস, আদালত, কলকারখানা, যুদ্ধক্ষেত্র প্রভৃতি দিক সুষ্টুভাবে মেনে চলা সহজ হয়।

(২) **ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টিঃ** দৈনিক পাঁচবার মহল্লা বা এলাকার লোকজন একত্র হয়ে জামায়াতের সাথে নামায আদায়ের কারণে একে অপরের নিকটতম ও অন্তরঙ্গ বন্ধু বা প্রতিবেশী রূপে পরিচিতি লাভ করে, ফলে সমস্ত মুসল্লীদের মধ্যেই ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সহমর্তিতাবোধ সৃষ্টি হয়।

(৩) **সাম্যের বাস্তব রূপায়ণঃ** নামাযের মধ্যে ধনী-গরীব, আমীর-ফকীর, মনিব-চাকর, বড়লোক-ছোটলোক ইত্যাদির কোন ভেদাভেদ থাকে না। সকলেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সাম্যের এমন বাস্তব রূপায়ন পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

(৪) **নেতৃত্ব ও আনুগত্যের সীমা পরিসীমাঃ** আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা) এর আদেশ পালনের জন্য নেতৃত্ব দেন ইমাম সাহেব, আনুগত্য করেন মুসল্লীবৃন্দ। এখানে ইমাম সাহেব কালো কি সাদা, ধনী না গরীব, বেটে না

লম্বা, সুন্দর না কুৎসিত সে প্রশ্ন অবান্তর। যতক্ষণ ইমাম সাহেব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) প্রদর্শিত পদ্ধতি অবলম্বন করবেন ততক্ষণ সমস্ত মুসুল্লীগণ বিনা দ্বিধায় তাঁর আদেশ (উমববটভঢ) মানবে। ইমাম সাহেব যখনই কোন ভুল করবেন সাথে সাথে মুসল্লীবৃন্দ তাঁর ভুল সংশোধন করে দিবেন। এতে একবিন্দু বাড়াবাড়ি করা হবে না। ইমাম সাহেবও বিনা দ্বিধায় তা মেনে চলতে বাধ্য হবেন। এভাবেই নামাযের মাধ্যমে ইসলামী জামায়াতের নেতৃত্ব ও আনুগত্যের ট্রেনিং দেয়া হয়ে থাকে।

(৫) **নামায পবিত্রতা শিক্ষা দেয়ঃ** নামাযের পূর্বে ওযুকরে পাক পবিত্র হয়ে অতঃপর নামায পড়তে হয়। হাদীসে আছে-

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلٰوةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ -

"বেহেশতের চাবি নামায এবং নামাযের চাবি ওযু (পবিত্রতা)।"

(মুসনাদে আহমাদ)

দৈনিক পাঁচবার নামায মানুষের শরীরের নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (যে সমস্ত অঙ্গ প্রতঙ্গ সাধারণতঃ খোলা থাকে সেগুলো) ধৌত করে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। এতে দেহ ও মন উভয়ই ভাল থাকে এবং মনের নির্মলতাও বৃদ্ধি পায়।

(৬) **জনমত গঠনে নামাযের ভূমিকাঃ** দৈনিক পাঁচ বার নামায পড়ে সাধারণত সমস্ত মুসল্লীগণই দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যাবলী নিয়ে আলাপ আলোচনা করে থাকেন। এ আলোচনাও দেশে কোন ব্যাপারে জনমত গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা গেলো, ব্যক্তি জীবন হতে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত নামাযে গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যায় এবং অশ্লীলতার প্রতিরোধেও নামায বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

(গ) **যাকাতঃ** ইসলামে নামাযের পরই যাকাতের স্থান। কুরআন মজিদেও নামাযের সাথে সাথে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। নামাযের মতো যাকাতের গুরুত্বও কোন অংশে কম নয়। কেননা হযরত আবু বকর (রা) যাকাত দানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের হুমকী পর্যন্ত দিয়েছেন। এতে কোন সাহাবী আপত্তি করেননি। এ কথার উপর ইজমা হয়ে গিয়েছে যে, যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা প্রতিটি ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও

কর্তব্য। নামায যেমন শারীরিক ইবাদাত তেমনি যাকাত হলো মালের ইবাদাত। এখানে একটি কথা স্মর্তব্য যে, যাকাত সংগ্রহ ও বন্টন কারো ব্যক্তিগত কাজ নয়, এটা ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক সংগ্রহ এবং বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে।

যাকাত শব্দটি আরবী "যাকাওয়া" অথবা "জাকী" ধাতু হতে নির্গত। অর্থ বর্দ্ধিত বা পবিত্র। এ কারণেই বলা হয় সম্পদের যাকাত দিলে সম্পদ পবিত্র হয় এবং তার বরকতে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। শরীয়াতের পরিভাষায় "নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের অতিরিক্ত সম্পদ হলে নির্দিষ্ট হারে বিনিময় ব্যতিরেকে অপরকে এমনভাবে দান করা, যাতে তার ঐ সম্পদে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়।"

(মঈনুল মিশকাত ঃ পৃষ্ঠা-১৮)

নিম্ন লিখিত ৮টি খাতে যাকাত বন্টন করতে হবে।

(১) **ফকীরঃ** গরীব-দুঃখী (নিকটাত্মীয় বা দূর সম্পর্কিত) যারা জীবিকা নির্বাহে অসামর্থ।

(২) **মিসকিনঃ** যারা নিজেদের উপার্জনে চলতে অক্ষম আবার কারো নিকট হাত পাততেও নারাজ-তবে দিলে নেয়। এক কথায় সম্ভ্রান্ত গরীব।

(৩) **যাকাত আদায়কারীঃ** যাকাত আদায়কারী, হিসেব সংরক্ষণকারী ও যাকাত বন্টনকারী কর্মচারী। এ ধরনের লোক নিজেরা ফকীর-মিসকীন না হলেও যাকাতের অর্থ হতে তাদের বেতন দেয়া যাবে।

(তাফহীমুল কুরআনঃ ৫ম খণ্ড ৪৭ পৃষ্ঠা)

(৪) **তালিফে কালবঃ** ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের কোন কল্যাণ সাধনের জন্য অমুসলিমদেরকে দান করা। তারা মালদার অথবা নেতৃস্থানীয় হলেও যাকাতের অর্থ তাদের জন্য খরচ করা বৈধ। নবদীক্ষিত মুসলমানদের জন্যও যাকাতের অর্থ খরচ জায়েয।

(৫) **ঋণগ্রস্থ বৃক্তিঃ** এমন ব্যক্তি যে ঋণ পরিশোধ করলে তার চলতে কষ্ট হয় এবং নেছাবের পরিমাণ সম্পদ তার নিকট থাকেনা এমন ব্যক্তির সাহার্যার্থে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

(৬) **ক্রীতদাস মুক্তির জন্যঃ** ইসলাম দাসত্ব প্রথাকে ঘৃণা করে তাই দাসত্বের কলংক মোচনকল্পে যাকাত দেয়া বৈধ ঘোষণা করেছে।

(৭) **মুসাফিরঃ** পর্যটক বা ভ্রমণকারী যার টাকা শেষ হয়ে গিয়েছে অথবা কোন দুর্ঘটনায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে এরূপ লোককে যাকাত দেয়া বৈধ।

(৮) **আল্লাহপথঃ** আল্লাহর পথের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আল্লামা মওদূদী (রা) তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফহীমুল কুরআনে বলেন "আল্লাহর পথ কথাটি সাধারণ অর্থবোধক। যেসব নেক ও ভালো কাজে আল্লাহর সন্তোষ রয়েছে তা সবই এর অন্তর্ভূক্ত। ..... কিন্তু পূর্বতম ইমামদের অধিকাংশেরই মত এবং সত্য কথা এই যে, এখানে "আল্লাহর পথ" বলতে "আল্লাহর পথে জিহাদ" বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সে চেষ্টা ও সাধনা সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে কুফুরী ব্যবস্থা চূর্ণ করা, নির্মূল করা এবং তদস্থলে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রতিষ্ঠিত করা; তাই "জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ"। এ চেষ্টা ও সাধনা সংগ্রামে যারা কার্যত অংশ গ্রহণ করবে তাদের সফর খরচ হিসেবে , যানবাহন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, অস্ত্র-শস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম ও দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহের জন্য যাকাতের টাকা ব্যয় করা যেতে পারে। --অনুরূপভাবে যারা নিজেদের সমস্ত কর্ম সাধনা ও সমস্ত সময় ও ব্যস্ততা স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে এ কাজের জন্য নিয়োজিত করে, তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্যও যাকাতের টাকা হতে সাময়িক বা ক্রমাগতভাবে সাহায্য দেয়া যেতে পারে। (তাফহীমুল কুরআন ৫ম খণ্ড-৪৭ পৃঃ)

সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়নেও যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম।

যেমনঃ-

(১) **নৈতিকতার ট্রেনিংঃ** মানুষ কালেমার মাধ্যমে আল্লাহকে ইলাহ মানলো তারপর সেই ইলাহর হুকুম মানতে কতটুকু আগ্রহী বা তৎপর তার বাস্তব পরীক্ষা হচ্ছে এ যাকাত। কারণ অর্থলোলুপতা মানুষের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। এর জন্যই জগতের প্রতি মানুষের অন্ধ আকর্ষণ জন্মায়। মানব চরিত্রকে এই কুলুষিত দিক হতে রক্ষা করার ব্যাপারে যাকাতের তৎপর্য অত্যন্ত বেশী। যাকাত দেয়ার ফলে মানুষের মনে উদারতা জাগে এবং মানুষে মানুষে সহানুভূতির বন্ধন সৃষ্টি হয়।

(ইসলামের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, এম আব্দুল্লাহ্-পৃঃ ৭১-৭২)

(২) **দারিদ্রতা মোচনে যাকাতঃ** সমাজে এক শ্রেণীর লোক টাকার পাহাড় গড়বে এবং আরেক শ্রেণীর লোক দারিদ্রের কষাঘাতে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে, এ বৈষম্য যাতে না থাকে এজন্যে শরীয়ত প্রণেতা ধণী শ্রেণীকে প্রথমতঃ উপার্জনে বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন এবং সাথে সাথে উপার্জিত সম্পদ নেছাব পরিমাণে (৫২ $\frac{১}{২}$ তোলা রৌপ্য অথবা ৭ $\frac{১}{২}$ তোলা স্বর্ণ অথবা প্রচলিত মুদ্রায় সমমূল্যের টাকা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হিসাবে ১ বৎসর জমা

থাকা) পৌছলে ২ $\frac{১}{২}$% (শতাংশ) যাকাত দেবার বিধান ধার্য করে দিয়েছেন। যাতে সমাজে দারিদ্রতা দূর করে সাম্য ও মানবতাবোধ সৃষ্টি করা সহজতর হয়।

(৩) সম্প্রীতি স্থাপনে যাকাতঃ যাকাতের অর্থ ধনীরা দান করে এবং দুঃস্থ অভাবীগণ ভোগ করে। এতে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপিত হয় অপর দিকে সমাজের সর্ব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পায়।

(৪) যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিঃ ইসলামী রাষ্ট্রের বাইতুলমালের প্রধান উৎস হল যাকাত। অন্যান্য উৎস সমূহের মধ্যে ওশর, খেরাজ, ফাই ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

(৫) অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানে যাকাতঃ যাকাতের সুষ্ঠু সংগ্রহ এবং বন্টনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাম্যতা সৃষ্টি হলে সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি, চৌর্যবৃত্তি ও লুণ্ঠন বন্ধ হয়ে সমাজে জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। এখানেও যাকাতের ভূমিকা অন্যতম।

মোটকথা যাকাত একদিকে যেমন শ্রেষ্ঠ ইবাদাত অন্যদিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডেও তার ভূমিকা ব্যাপক।

(ঘ) হজ্জঃ "হজ্জ" শব্দের আভিধানিক অর্থ সংকল্প বা ইচ্ছা পোষণ করা। আর শরীয়াতের পরিভাষায় নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত বিধান পালনের জন্য আল্লাহর ঘর যিয়ারতে মক্কা শরীফে যাওয়াকে হজ্জ বলা হয়।

নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে হজ্জ ফরজ হয়।

(১) মুসলমান হওয়া (ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিমদের প্রতি হজ্জ ফরজ নয়।)
(২) জ্ঞানী হওয়া। (পাগল বা জ্ঞানহীন লোকের উপর হাজ্জ ফরজ নয়।)
(৩) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।
(৪) স্বাধীন হওয়া। (ক্রীত দাস-দাসীর উপর হজ্জ ফরজ নয়।)
(৫) হজ্জে যাতায়াতের এবং হজ্জকালীন সময়ে পারিবারিক ব্যয়ভার নির্বাহের সামর্থ থাকা।
(৬) যাতায়াতের পথে নিরাপদ হওয়া। এবং
(৭) নারীদের জন্য মুহরিম সাথী থাকা।

ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকায়ও হজ্জের গুরুত্ব কম নয়। যেমন-

اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ -

"আল্লাহ ঈমানদারদের বন্ধু। (তিনি) মানুষকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে (অর্থাৎ মুক্তির দিকে)পথ দেখান।" (সূরা আল বাকারাঃ ২৫৭)

(১) হজ্জ ঈমানকে মজবুত করেঃ হজ্জের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ঈমানী শক্তিকে মজবুত করা। কারণ নিজের কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে পথের জানা অজানা অনেক রকম বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে, সংসারের মোহ্ ত্যাগ করে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের আহবানে সাড়া দেয়া, এটা আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক আরও গভীরতর করার এক উৎকৃষ্ট পন্থা। নামায শুধমাত্র জানের ইবাদাত, যাকাত মালের ইবাদাত এবং হজ্জ জান ও মাল একত্রে উভয়েরই ইবাদাত।

(২) রাসূলে করীম (সা) এর প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধিঃ হজ্জের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি মহানবী (সা) এর স্মৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় করিয়ে দেয়। ফলে প্রতিটি হজ্জকারীর নিকট মহানবী (সা) এর স্মৃতিসমূহ মূর্তমান হয়ে উঠে এবং নবী প্রেমে উজ্জীবিত হয়ে সাহাবা কেরামের মতো বিপদসঙ্কুল পথে প্রতি মুহূর্তে ঝুকি নিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রতিশ্রুত হয় বলিষ্ঠ অঙ্গীকার।

(৩) গুনাহ্ মার্জনার শ্রেষ্ঠ জায়গাঃ কা'বা শরীফ পৃথিবীর সকল ইবাদাত গৃহের মধ্যে শ্রেষ্টতম ইবাদাত গৃহ। বিশ্বের মুসলমানের কেন্দ্র। তাছাড়া কিছু নিদর্শন আছে, যেখানে মানুষের দু'আ কবুল হয়। এ সমস্ত জায়গায় প্রত্যেক হাজী নিজের কৃতকর্মের (প্রতি) স্মরণ করে মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং সুপথে চলার দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করে। গুনাহ্ মাফের এমন শ্রেষ্ঠ জায়গা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

(৪) সাম্য ও ঐক্যের বাস্তব নমুনাঃ প্রতি বৎসর হজ্জের সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ একত্রিত হোন বাইতুল্লাহ্ জিয়ারতের জন্য। এখানে বিভিন্ন ভৌগলিক পরিবেশের এবং বহু ভাষা-ভাষী মুসলমানের সমাবেশ ঘটে। এখানেও দেখা যায় সাম্য ও ঐক্যের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। কারণ ভৌগলিক, ভাষাগত বংশগত, সম্পদ সংক্রান্ত কোন গৌরব বা অহংকার নেই, সকলেই নির্দিষ্ট এক পোশাক পরিধান করে একই কাতারে দাঁড়ায়।

(৫) বিশ্ব ভ্রাতত্ব প্রতিষ্ঠাঃ হজ্জ উপলক্ষে যখন বিশ্ব মুসলিম একত্রিত হয় তখন তাদের পরস্পরের মাঝে ভাবের আদান-প্রদান হয়, ফলে পারস্পরিক সৌহার্দ্য সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়। এমনি করেই বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৬) মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে একতা সৃষ্টি ঃ প্রতি বছর বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ হতে হজ্জ প্রতিনিধিদল হজ্জব্রত পালনের জন্য একত্রিত হয়। তারা পরস্পর আলোচনা ও ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে

একতার দৃঢ় বন্ধন তৈরীর প্রয়াস পায়।

সত্যি কথা বলতে কি, বিশ্ব মুসলিম একত্রিত হয়ে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করতঃ বিশ্ব প্রভুর ইবাদাতের এমন নজীর পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যাবেনা।

(৬) সাওম বা রোযাঃ "সাওম" শব্দের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। শরীয়তের পরিভাষায় সোবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পনাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নাম সাওম বা রোযা। মুসলমানগণের উপর হিজরী দ্বিতীয় সনে রোযা ফরজ করা হয়। রোযা পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরজ ছিলো কিন্তু তাদের রোযার সংখ্যা ও ধরণ কিছুটা পার্থক্য ছিলো। প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্য রোযা ফরজ ছিলো, কারণ তাকওয়ার জীবন যাপনের জন্য রোযা হচ্ছে উত্তম প্রশিক্ষণ। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মতোই তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে, যেন তোমরা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করতে পারো।" (সূরা আল বাকারাঃ ১৮৩)

তাকওয়া শব্দের মূল অর্থ বাঁচা বা ভয় করা। পারিভাষিক অর্থে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজকর্ম হতে বিরত থাকা। তাকওয়া শব্দের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হযরত উবাই ইবনে কা'ব যা বলেছেন, তার সার কথা হচ্ছে- "সংকীর্ণ কাঁটাযুক্ত জঙ্গলের পথ অতিক্রম করতে জামা-কাপড়ের প্রান্ত ধরে যেভাবে কাঁটার স্পর্শ হতে বেঁচে পথ অতিক্রম করতে হয়, তাই হচ্ছে তাকওয়া।"

মানুষের ব্যক্তি জীবন ও সামাজিক জীবনেও রোযার ভূমিকা অনন্য। যেমন-

(১) সর্বদা অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করাঃ রোযাদারের মধ্যে সর্বক্ষণ আল্লাহর অস্তিত্ব, সর্বশক্তিমান হওয়া ও সর্বদ্রষ্টা হওয়া সম্বন্ধে অনুভূতি থাকে, ফলে এ বিশ্বাস তার মধ্যে দৃঢ় হয় যে, আল্লাহর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কোন কাজ করার সাধ্য কারো নেই। তাই রোযাদার ক্ষুধা পিপাসায় যতো কষ্টই করুক না কেন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পানাহার করে না।

(২) পাপ থেকে বিরত রাখাঃ কোন রোযাদার রোযা রেখে কোন পাপের কাজে লিপ্ত হয় না। কাউকে গালি দেয়না, মিথ্যা কথা বলে না, কারো কুৎসা রটনা করে না, কারো সাথে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয় না। এমনি করে সে নিজেকে পাপ কাজ হতে বিরত রাখার প্রশিক্ষণ অর্জন করে রোযার মাধ্যমে।

(৩) সময়ানুবর্তিতার ট্রেনিংঃ রোযার মাধ্যমে মানুষ সময়ানুবর্তিতার ট্রেনিং

পায়। কারণ প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে সাহরী খাওয়া, ইফতার করা, খানা খাওয়া, তারাবীহ্ নামায পড়া ইত্যাদি সবগুলো বিষয়ই সময়ানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ দেয়। যেনো জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমেই প্রত্যেক মানুষ পৌঁছতে পারে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে।

(৪) ধৈর্য ও স্থৈর্যের প্রশিক্ষণঃ মানুষ সর্বদা ভোগের নেশায় মত্ত থাকে। সমাজে একজন অবাধে ধন-সম্পদ অর্জন ও ভোগ করবে, আরেকজন ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ করতে ব্যর্থ হবে, ফলে সেও চাবে যে কোন উপায়ে তার চাহিদা পুরণ করতে। সমাজে যদি এ অবস্থা চলতে থাকে তবে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হতে বাধ্য। এজন্য ছোট-বড়ো সব লোকেরই চাহিদা মেটানোর জন্য বিধি-নিষেধ থাকা উচিত। একমাত্র ধৈর্য বা সবরের মাধ্যমেই তা বাস্তবায়ন সম্ভব, মানুষ সাধারণত ক্ষুধা পিপাসা ও যৌনাকাঙ্খার কারণেই সীমা অতিক্রম করে। তাই রোযা এ তিনটি জিনিস হতে বিরত রেখে ধৈর্যের প্রশিক্ষণ দেয়।

(৫) সহানুভূতির শিক্ষাঃ সমাজে দু'শ্রেণীর লোক বিদ্যমান। ধনী ও গরীব গরীবশ্রেণী চিরদিন দুঃখ কষ্ট ভোগ করে। অনাহারে অর্ধাহারে দিনাতিপাত করে। পক্ষান্তরে ধনীশ্রেণী দুঃখ-কষ্ট বা অভাব-অনটন কাকে বলে তা বুঝেও না। তাই রোযার মাধ্যেমে ধনী স্তরের লোকদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হয় যে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা কতো তীব্র হতে পারে। যাতে সমাজে গরীব শ্রেণীর মানুষের উপর তারা সহানুভূতির হস্ত প্রসারিত করতে পারে।

বস্তুতঃ রোযা একদিকে যেমন নৈতিক চরিত্র গঠনে প্রশিক্ষণ দেয়; সাথে সাথে সহানুভূতিশীল একটি সমাজেরও বুনিয়াদ স্থাপন করে।

তথ্যসূত্র

১। সহীহ্ আল বুখারী।
২। সহীহ্ আল মুসলিম।
৩। তাফহীমুল কুরআন।
৪। মা'আরিফুল কুরআন।
৫। ইসলামের সাংস্কৃতিক ইতিহাস।
৬। মঈনুল মিশকাত।
৭। মিশকাত শরীফ।
৮। রোযার উদ্দেশ্য ও শিক্ষা।
৯। সাহাবা চরিত্র, ইসলামী ফাউন্ডেশন।

عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا اَبْلاَهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا اَنْفَقَهُ وَمَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ - (ترمذى)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) রাসূলে করীম (সা) হতে বর্ণনা করেছেনঃ কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক কদমও (স্ব—স্থান হতে) নড়তে দেয়া হবে না। (১) তাঁরজীবনকাল কিভাবে অতিবাহিত করেছো (২) যৌবনের সময়টাকে কিভাবে ব্যয় করেছো (৩) ধন—সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছো (৪) তা কোনপথে ব্যয় করেছো এবং (৫) সে দ্বীনের যতটুকু জ্ঞানার্জন করেছে সে অনুযায়ী আমল করেছে কিনা। (তিরমিযি)

শব্দার্থ

لاَتَزُوْلُ – নাড়াতে পারবে না। قَدَمَا – পদদ্বয়। اِبْنِ اٰدَمَ – আদম সন্তান। حَتّٰى – যতক্ষণ। يُسْئَلُ – জিজ্ঞাসা করবে। عَنْ خَمْسٍ – পাঁচটি বিষয়ে। عُمُرِهِ –তার জীবন। اَفْنَاهُ – ধ্বংস করেছে, ব্যয় করেছে। شَبَابِهِ – তার যৌবনকাল। اَبْلاَهُ – (এখানে) সে কিভাবে কাটিয়েছে। مَالِهِ – তার ধন–সম্পদ। اَيْنَ –কোথায়। اِكْتَسَبَهُ – সে উপার্জন করেছে। فِيْمَا – কোনখানে। اَنْفَقَهُ – সে ব্যয় করেছে। عَمِلَ – আমল করেছে, কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। عَلِمَ – সে শিখেছে।

বর্ণনাকারীর (রাবীর) পরিচয়

ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক অবস্থায় যে কজন মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ছিলেন তাঁদের একজন। তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন এবং নবী করীম (সা) এর মদীনায় হিজরতের পর মদীনায় চলে আসেন। তিনি সর্বদা রাসূলুল্লাহ (সা) এর খেদমতে নিয়োজিত থাকতেন এবং ছায়ার মতো তাঁকে অনুসরণ করতেন। আবু মুসা আশায়ারী (রা) বলেন, "আমার ইয়েমেন হতে এসে বহুদিন পর্যন্ত ইবনে মাসউদ (রা) কে নবী পরিবারের লোক বলে ধারণা করতাম।"

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তিনি কুরআন, হাদীস, ফেকাহ ইত্যাদি সব বিষয়েই সমান পারদর্শী ছিলেন। মদীনায় যে কজন সাহাবী ফতোয়া দিতেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কুরআন শিক্ষায় তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। নবী করীম (সা) বলেনঃ "কুরআন শরীফ যেভাবে নাযিল হয়েছে হুবুহু সেভাবে যদি কেউ পড়তে চায় সে যেনো আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এর নিকট যায়।"

এই জ্ঞানের বিশাল মহীরুহ হিজরী ৩২ সনে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ৮৪৮টি। ইমাম বুখারী ও মুসলিমের ঐকমত্যের হাদীস ৬৪টি, তাছাড়া বুখারী ২১৫টি এবং মুসলিম ৩৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির গুরুত্ব

আলোচ্য হাদীসে মানুষের নৈতিক চরিত্রের সংশোধনকল্পে আখিরাতের জবাবদিহির অনুভূতি জাগ্রত করার প্রয়াস পেয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে খোদাভীতি ও পরকালে জাবাদিহির অনুভূতি জাগ্রত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত নৈতিক চরিত্রের সংশোধনের আশা করা বৃথা। কারণ আমাদের এ জীবনের পর অনন্তকালের এক জীবন আছে এবং সে জীবনের সাফল্য এবং ব্যর্থতা সম্পূর্নরূপে নির্ভর করে এ জীবনের কর্মফলের উপর; আর প্রতিটি কর্মেরই সূক্ষ্মভাবে বিচার -বিশ্লেষণ করা হবে। একমাত্র এ অনুভূতিই মানুষকে মহৎ হতে বাধ্য করে।

তাছাড়া পার্থিব জীবনের আচার-আচরণ সম্বন্ধেও ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এ হাদীসের মধ্যে। তাই প্রতিটি মুসলমানের জীবনে এ হাদীসটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ব্যাখ্যা

১. মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য। যেমন কুরআনে বলা হয়েছেঃ----

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ -

"আমি মানুষ আর জ্বীনকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয্ যারিয়াতঃ ৫৬)

ইবাদাত করতে প্রতিটি মানুষ অথবা জ্বীনকে জন্ম হতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর দাসত্ব বা গোলামী করার কথা বলা হয়েছে। কারণ "ইয়াবুদূন" শব্দটি "আবদুন হতে নির্গত। আর "আবদুন" শব্দের অর্থ হল গোলাম দাস। কাজেই দাসত্ব বা গোলামী জীবনের কোন একটি সময় বা মুহূর্ত পর্যন্ত সীমিত নয় বরং সমস্ত জীবনব্যাপী এ দায়িত্ব।

অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لاَتُرْجَعُوْنَ -

(المؤمنون)

"তোমরা কি মনে করেছো যে, আমরা তোমাদেরকে অকারণেই সৃষ্টি করেছি, আর তোমাদেরকে কখনই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে না? (সূরা আল মু'মিনুন-১১৫)

তাই দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর চাকচিক্যময় প্রতিটি বস্তু মানুষের পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এ পরীক্ষার সফলতা বা ব্যর্থতাকে কেন্দ্র করেই শুরু হবে পরকালের জীবন। সত্যি কথা বলতে কি, ছোট্ট একটি প্রশ্নের উত্তর সমস্ত জীবনব্যাপী বিস্তৃত।

২. প্রতিটি বস্তুরই একটি উৎকৃষ্ট অংশ থাকে আর জীবনের উৎকৃষ্ট অংশ হচ্ছে তার যৌবনকাল। নিম্নোক্ত চারটি গুণের পরিপূর্ণ সমাবেশ ঘটে এ যৌবকালেই। যথা-

(ক) চিন্তাশক্তি (Thinking Power)
(খ) ইচ্ছাশক্তি (Will Power)
(গ) মনন শক্তি (Power of soul)
(ঘ) কর্মশক্তি (Physical strength for working capacity)

অতএব দেখা যাচ্ছে ভালো অথবা মন্দ যে কাজই করা হোকনা কেন যৌবনই তার প্রধান উদ্যোক্তা। কারণ মানুষ চুরি, ডাকাতি, জুলুম, নির্যাতন, অহংকার, ব্যাভিচার ইত্যাদি সবকিছুই করে যৌবনকালে। দেখা যায় যৌবনে দুর্ধর্ষ এক লোক বার্ধক্যের কষাঘাতে নেহায়েত গো-বেচারায় রূপান্তরিত হয়। কারণ বার্ধক্য মানুষকে নিরীহ অসহায় করে দেয়। তাই বার্ধক্যে যেমন অন্যায় অত্যাচারের পথ রুদ্ধ হয় তদ্রূপ যতো সৎ নিয়ত এবং চেষ্টাই থাক না কেন বার্থক্য আসার পর কোন একটি ভালো কাজও সুচারুভাবে সমাপ্ত করা যায় না। এখানেও বার্ধক্য তার প্রধান অন্তরায়। এজন্য যৌবনের এতো গুরুত্ব।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ---

اِغْتَنِمْ خَمْسًا شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ –

পাঁচটি বস্তুকে গনীমতের মালের মতোই মনে করো। তার একটি হলো বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনের। (মিশকাত)

অনেকেই মনে করে যৌবনে যা কিছু মনে চায় করে বার্ধক্য আসার পর আল্লাহর নিকট তওবা করে সৎ কাজে মনোনিবেশ করবো। এ ধারণাই মানুষকে স্বৈরাচারী করে তোলে। তাই হাদীসে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে। এইজন্যই পরকালের প্রশ্নবলীর মধ্যে যৌবন সংক্রান্ত প্রশ্নটি তার অন্যতম।

৩. মানুষ পৃথিবীতে ভোগের জন্য সর্বদা পাগলপারা। তার একটা লক্ষ্য ধন-সম্পদের স্তুপে সুখের সন্ধান করা। এজন্য চুরি, ডাকাতি, অপরের সম্পদ হরণ, অথবা ধোকাবাজী যা কিছুই হোক না কেন তাতে কোন পরওয়া নেই। আর এভাবে যদি কোন সমাজ চলে তবে সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। তাই বিশ্বপ্রভু সমাজের ভারসাম্য বজায় রেখে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ কায়েমের লক্ষ্যে ধন-সম্পদ আয় এবং তার ব্যয়ের মধ্যেও শর্তারোপ করেছেন, যাতে সমাজের কারো কোন অধিকার নষ্ট না হয় এবং সকলেই সমভাবে সম্পদ ভোগ করতে পারে। নিম্নে সম্পদ উপার্জনের মৌলিক বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

(১) কারো অধিকার নষ্ট করে সম্পদ উপার্জন করা যাবে না। যেমন মিরাসের অংশ না দিয়ে অথবা মোহরের প্রাপ্য টাকা না দিয়ে নিজে ভোগ করা। এতিমের মাল ভোগ করা ইত্যাদি।

(২) ব্যাভিচার বা কোন প্রকার দেহ ব্যবসার মাধ্যমেও সম্পদ উপার্জন করা যাবেনা।

(৩) চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন, হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমেও জীবিকার্জন বা সম্পদ অর্জন করা যাবে না।

(৪) কাউকে ধোকা দিয়ে বা ঠকিয়ে ধন সম্পদ অর্জন করা যাবে না।

(৫) গান-বাজনা, অভিনয় ইত্যাদিকেও জীবিকার পেশা নির্ধারণ করা যাবে না।

(৬) হারাম মালের দ্বারা ব্যবসার মাধ্যমে। এমন কি হালাল পশু পাখীর মৃতুদেহও এর অন্তর্ভুক্ত।

(৭) হালাল মালের ব্যবসা করলেও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী মূল্য বৃদ্ধির নিয়তে ৪০ দিনের অধিক জমা রেখে ঐ মুনাফালব্ধ টাকার মাধ্যমে।

(৮) সুদ অথবা ঘুষের মাধ্যমে সম্পদ আহরণ বা বর্ধিত করা যাবে না।

(৯) জুয়া, হাউজি, ভাগ্যগণনা, লটারী ইত্যাদির মাধ্যমেও সম্পদ উপার্জন করা যাবেনা।

(১০) কোন পশু পাখীর দ্বারা খেলা দেখিয়ে।

(১১) মূর্তি অথবা প্রাণীর ছবির ব্যবসায়ের মাধ্যমেও সম্পদ অর্জন করা না জায়েজ।

(১২) ওজনে কম দেয়া। ইত্যাদি।

৪. উপরের বিধি নিষেধগুলো সামনে রেখে উপার্জন করতে হবে। ব্যয়ের মৌলিক খাতসমূহ নিম্নে দেয়া হলো।

(১) ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যয় করার অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে কিন্তু শর্তারোপ করা হয়েছে অপচয় করা যাবে না।

(২) নেছাবের মালিক হলে যাকাত দিতে হবে।

(৩) ছদকাহ্।

(৪) নিকটাত্মীয়ের হক।

(৫) ইয়াতিমের হক।
(৬) মিসকিন, ভিক্ষুকের হক।
(৭) আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যয় "জিহাদ ফি ছাবিলিল্লাহ"।
(৮) বিভিন্ন ধরনের কাফফারা আদায়কল্পে।
(৯) পথিক বা পর্যটকদের হক।

বস্তুতঃ প্রত্যেকটি বনী আদমকেই প্রশ্ন করা হবে যে, উপরোক্ত শর্তবলী পালন করেই সে সম্পদ আয় এবং ব্যয় করেছে কিনা?

৫. বিশ্ববাসীকে লক্ষ্য করে রাসূলে আকরাম (সা) এর মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রথম ফরমান- হলো। ----

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ (علق) ۔

"পড় তোমার সেই প্রভুর নামে যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আলাকঃ১)

আয়াতে কারীমার তাৎপর্য হলো রবকে জানা বা বুঝার উদ্দেশ্যে পড়তে হবে। অন্য কথায় দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। মহানবী (সা) বলেছেনঃ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ –

"মুসলমান প্রতিটি নর-নারীর উপর (দ্বীনের) জ্ঞানার্জন অবশ্য কর্তব্য-ফরজ (মুসলিম)।

স্রষ্টা-সৃষ্টি ও বিশ্বজাহান সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই প্রতিটি লোক তার নিজের এবং স্রষ্টা সম্বন্ধে জানতে ও বুঝতে পারে এবং সেই সাথে আরও বুঝতে পারে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক কি আর তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি। এমনিভাবে যখন মানুষ তার স্রষ্টাকে জানতে ও বুঝতে পারে তখন স্রষ্টার দেয়া দায়িত্ব-কর্তব্য পালনও তার জন্য সহজ হয়ে যায়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কালামে ইরশাদ করেনঃ ---

তবে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান "তাগুদ"কে অস্বীকার করেই আনতে হবে। সূরা বাকারায় অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِاسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقٰى لاَ انْفِصَامَ لَهَا - (البقرة)

"যে তাগুত (খোদাদ্রোহী শক্তি) কে অস্বীকার করে আল্লাহর উপর ঈমান আনলো সে এমন একটি মজবুত রশি ধারণ করলো যা কখনো ছিন্ন হবার নয়। (সূরা আল বাকারাঃ ২৫৬)"

এখানে রশি বলতে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতে কারীমা হতে বুঝা যায়, পৃথিবীতে দুটো শক্তি আছে। একটি তাগুদী বা শয়তানী শক্তি অপরটি আল্লাহর শক্তি। আর যে কান এক শক্তির আনুগত্য অপর শক্তিকে অস্বীকার করেই করতে হবে। এখানেও দেখা যাচ্ছে হক ও বাতিল চেনার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ইল্‌ম বা জ্ঞান। তাই দ্বীনি ইলম শিখতে হবে এবং তদানুযায়ী আমল করতে হবে।

অন্য হাদীসে বলা হয়েছেঃ

اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ هَلْكَاءُ اِلاَّ الْعَالِمُوْنَ وَالْعَالِمُوْنَ كُلُّهُمْ هَلْكَاءُ اِلاَّ الْعَامِلُوْنَ —

সমস্ত মানুষই জাহান্নামী একমাত্র আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া, আর সমস্ত আলেমই জাহান্নামী হবে একমাত্র আমলদায় আলেম ছাড়া। (বুখারী)

অর্থাৎ শুধু জ্ঞানার্জন করাই মুক্তির পথ নয় সাথে জ্ঞানানুযায়ী আমলের ও প্রয়োজন। আর এ ব্যাপারে অবশ্যই রাব্বুল আলমীনের নিকট জবাবদিহি করতে হবে। এখানে আলেম বলতে মাদ্রাসা থেকে সনদপ্রাপ্ত উচ্চ শিক্ষিতদেরকে বুঝানো হয়নি। ইসলামের হুকুম আহকাম সম্পর্কে যারা মৌলিক জ্ঞান রাখেন তাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

শিক্ষাবলী

১। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে হবে।

২। জীবনের গুরুত্বপুর্ণ অংশ হলো যৌবন। তার যথাযথ ব্যবহার করতে হবে।

৩। ধন সম্পদ আয় এবং ব্যয় আল্লাহ্র নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে হতে হবে এবং আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জন হবে একমাত্র লক্ষ্য।

৪। দ্বীনের যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এবং

৫। জ্ঞানানুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে।

তথ্যসূত্র

১। জামেউত তিরমিযি
২। সহীহ্ আল বুখারী
৩। সাহাবা চরিত-ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৪। সুপ্ত শক্তিও ঘুমন্ত প্রতিভা-ডেল কার্ণেগী
৫। সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং -সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী
৬। তাফহীমুল কুরআন-ঐ
৭। মিশকাত শরীফ-

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ اَىُّ النَّاسِ شَرٌّ ؟ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ —

হযরত আবু বাকরা (রা) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে জিজ্ঞেস করলোঃ হে আল্লাহর রাসূল! শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে? তিনি বললেনঃ যার জীবন দীর্ঘ এবং আ'মল সুন্দর। সে আবার জিজ্ঞেস করলোঃ নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে? তিনি বললেনঃ যার জীবন দীর্ঘ কিন্তু আ'মল খারাপ। (মুসনাদে আহমদ)

শব্দার্থ

اَنَّ – নিশ্চয়ই। رَجُلاً – পুরুষ, ব্যক্তি। قَالَ – বললো। اَىُّ – কোন, কি। اَلنَّاسِ – মানুষ, ব্যক্তি। خَيْرٌ – শ্রেষ্ঠ, ভালো। مَنْ – কে, যার, যে ব্যক্তি। طَالَ عُمْرُهُ – তার জীবন দীর্ঘ। شَرٌّ – নিকৃষ্ট। سَاءَ عَمَلُهُ – তার আ'মল খারাপ।

বর্ণনাকারীর পরিচয়

নাম নুফাই। উপনাম-আবু বাকরা। পিতার নাম মাসরূহ এবং মায়ের নাম সামিয়্যাহ। তিনি আমীর মুয়াবিয়া (রা) এর গভর্নর যিয়াদের খালাতো ভাই ছিলেন। হযরত আবু বাকরা (রা) প্রথম জীবনে তায়েফের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তায়েফ অবরোধ করে ঘোষণা দিলেন, যে সমস্ত স্বাধীন ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় এসে আমাদের সাথে মিলিত হবে তারা নিরাপদ এবং যে সমস্ত ক্রীতদাস তদের মালিককে পরিত্যাগ করে চলে আসবে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া হবে। এ ঘোষণা শোনামাত্র তিনি বাকরাতে (অর্থাৎ দলের মাঝে অথবা সকাল বেলায়) এসে রাসূল (সা) এর নিকট ইসলামের দীক্ষা

নিয়ে নিজেকে ধন্য করেন। এজন্য নবী করীম (সা) তাকে আবু বাকরা উপাধী প্রদান করেন। তিনি এ নামেই পরিচিত হোন।

হযরত উমর (রা) এর খিলাফতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি মদীনায় ছিলেন। পরবর্তীতে ইরাকের বসরা নগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি ছিলেন সরল সোজা সূফী প্রকৃতির লোক। ইবাদাত বন্দেগী, তাকওয়া পরহেজগারীতে তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

হিজরী ৪৯ অথবা ৫২ সনে বসরা নগরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর থেকে সর্বমোট ১৩২টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তারমধ্যে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম সম্মিলিত ভাবে বর্ণনা করেছেন ৮টি হাদীস। তাছাড়া স্বতন্ত্রভাবে ইমাম বুখারী ৫টি এবং ইমাম মুসলিম ৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির গুরুত্ব

মানুষের জীবন একধরনের পুঁজি। ব্যবসায় যেমন পুঁজি বেশী হলে তার লাভও বেশী হয় আবার লোকসান হলেও তার পরিমাণ বেশীই হয়। তদ্রুপ জীবন বা হায়াতের পুঁজিকে যদি সৎকর্মে নিয়োগ করা যায়, তার লাভ অত্যন্ত বেশী হবে পক্ষান্তরে দীর্ঘ হায়াত পাওয়ার পর যদি তা সৎকর্মে ব্যয় না করা হয় তবে তার ক্ষতির পরিমাণ ও অপরিমেয়। দুটো বাক্যের মাধ্যমে হাদীসটি এতো সুন্দরভাবে মানুষের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারন করে দিয়েছে যে, তা সত্যিই অতুলনীয়। তাই বলা যায় ব্যবহারিক জীবনে এ হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্যাখ্যা

মুসনাদে আহমদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছ। সে হাদীসটিকে এ হাদীসের ব্যাখ্যা বলা যেতে পারে। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

বনু উযরা গোত্রের তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহন করলেন। তিনি সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ কে এদের (নও মুসলিমদের) জিম্মা নিবে? তালহা বললেনঃ আমি নেবো। অতপর তারা তাঁর কাছে অবস্থান করতে লাগলেন। একদিন নবী করীম (সা) একদল মুজাহিদ (কোন স্থানে) পাঠালেন। তাদের একজন মুজাহিদ দলের সাথে অংশ গ্রহণ করে শাহাদাত বরণ

করলেন। কিছুদিন পর নবী করীম (সা) আরেকটি মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করলেন। এবার দ্বিতীয় ব্যক্তি এদলে যোগদান করলেন এবং শহীদ হলেন। তৃতীয় ব্যক্তি স্বাভাবিক মত্যু বরণ করেন। তালহা (রা) বলেনঃ আমি ঐ তিন ব্যক্তিকে (স্বপ্নে) জান্নাতে দেখতে পেলাম। স্বভাবিক ভাবে যিনি মৃত্যু বরণ করেছিলেন তাকে একটু বেশী মর্যাদা সম্পন্ন দেখলাম, অতপর শেষে শাহাদাত বরণকারী এবং সর্ব প্রথম শাহাদাত বরণকারীর মর্যাদার ক্রমধারা প্রত্যক্ষ করলাম। এ অবস্থা দেখে আমার মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি হলো। আমি নবী করীম (সা)কে সব কিছু বললাম। তিনি উত্তর দিলেন তাতে তুমি কি কি ব্যাপারে সঠিক নয় বলে মনে করো? আল্লাহর কাছে সেই মুমিনের চেয়ে কেউ শ্রেষ্ঠ নয়, যে দীর্ঘ জীবন ইসলামের মধ্যে তাসবীহ্, তাকবীর ও তাহ্লীল করে অতিবাহিত করে।-

(মুসনাদে আহমদ)

'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' সর্বোচ্চ মানের ইবাদাত। যিনি এ ইবাদাতে অংশ গ্রহণ করে শাহাদাত বরণ করেন তিনি নিশ্চিত জান্নাতী। তবে শর্ত হচ্ছে যদি কারো কাছে তিনি ঋনের দায়ে আবদ্ধ না থাকেন। তাছাড়া এমন আর কোন ইবাদাতের কথা বলা হয়নি যার বিনিময়ে শহীদের মতো সরাসরি জান্নাতে যায়। হযরত তালহা (রা) মনে করেছিলেন জিহাদ এবং শহীদদের মর্যাদা যেহেতু বেশী তাই তারা জান্নাতেও অনুরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করবেন। কিন্তু তিনি এদিকে চিন্তা করেননি যে, ইবাদাতের মধ্যে শহীদি মর্যাদা শুধু মাত্র একটি কারণেই সর্বশ্রেষ্ট তা হচ্ছে এটিই একমাত্র ইবাদত যা একজন শহীদ খালেছভাবে সম্পাদন করলেই তিনি নিশ্চিত জান্নাতী। তাই বলে তিনি জান্নাতে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করবেন এমন কথা বলা হয়নি। তাই নবী করীম (সা) তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, কোন ব্যক্তি জিহাদে অংশ নেয়ার জন্য মানসিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের পরও জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারলোনা, কিন্তু সে নিজের গোটা জীবন ইসলামের অধীন রাখলো এবং কালেমার দাবী অনুযায়ী জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে তাগুত ও বাতিলের বন্ধন থেকে মুক্ত করে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অনুগত হলো, সেই জান্নাতে শ্রেষ্ট মর্যদার অধিকারী হবে। কারণ জীবন যতো দীর্ঘ হবে সৎকাজের পরিমাপও ততো বেশী হবে। ফলে সৎকাজের বিনিময়ে সে সফলতার শীর্ষে অবস্থান করবে। পক্ষান্তরে সুদীর্ঘ জীবন পেয়ে যদি কেউ অসৎ কাজে লিপ্ত হয় তবে দিন দিন তার আমলনামায় পাপের

বোঝা ভারী হবে। যার পরিণতি তার জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক হতে বাধ্য। তাই দেখা যায় সুদীর্ঘ জীবন একদিকে যেমন সফলতার সোপান অন্য দিকে তা ধ্বংসের সিড়ি। কাজেই দীর্ঘ জীবন লাভ করে কিয়ামতের দিন অনেকে ডান হাতে আমল নামা লাভ করবে আবার অনেকে বাম হাতে আমল নামা লাভ করবে। এ ভাবেই সেদিন শ্রেষ্ট ও নিকৃষ্ঠ ব্যক্তির বাছাই করা হবে।

শিক্ষাবলী

১। মানুষের জীবন বা হায়াত এক প্রকার পুঁজি বা মূলধন।
২। যে ব্যক্তি এ পুঁজিকে সৎকর্মে বিনিয়োগ করবে সে সফল হবে।
৩। আর যে ব্যক্তি এ পুঁজিকে অসৎকর্ম্মে বিনিয়োগ করবে সে ব্যর্থ হবে।
৪। জান্নাতে মর্যাদা নির্ধারিত হবে আমলের বিনিময়ে।
৫। তাগুত ও বাতিলের বন্ধন মুক্ত হয়ে একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর অনুগত হওয়াই মুক্তি লাভের পূর্ব শর্ত।

তথ্য সূত্র

১. মা'আরিফুল হাদীস-মাওলানা মনযুর নুমানী
২. হাদীস বর্ননাকারী একশত সাহাবী- হক লাইব্রেরী, বাংলা বাজার
৩. আসমাউর রিজাল-আশ্রাফিয়া লাইব্রেরী, বাংলা বাজার
৪. মিশকাত শরীফ

মানুষের নিকট অপছন্দীয় অথচ মুমিনের জন্য উত্তম

عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِثْنَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ اٰدَمَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِّلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ اَقَلُّ لِلْحِسَابِ

মাহমুদ বিন লবিদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেনঃ মানুষ দুটো জিনিস অপছন্দ করে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে অথচ মুমিনের জন্য মৃত্যু ফিতনা থেকে উত্তম। সে সম্পদের স্বল্পতাকে অপছন্দ করে অথচ সম্পদের স্বল্পতা আখিরাতের হিসেবকে সংক্ষিপ্ত করবে। -

(মুসনাদে আহমদ)

শব্দার্থ

اِثْنَانِ يَكْرَهُهُمَا - দুটো জিনিস অপছন্দ করে। اِبْنِ اٰدَمَ - আদম সন্তান। يَكْرَهُ الْمَوْتَ - মৃত্যুকে অপছন্দ করে। اَلْمَوْتُ خَيْرٌ لِّلْمُؤْمِنِ - মৃত্যু মুমিনের জন্য উত্তম। مِنَ الْفِتْنَةِ - ফিতনা হতে। يَكْرَهُ - অপছন্দ করে। قِلَّةُ الْمَالِ - সম্পদের স্বল্পতা। اَقَلُّ الْحِسَابِ - হিসেব সংক্ষিপ্ত করবে।

হাদীসটির গুরুত্ব

দীর্ঘ জীবন ও সম্পদের প্রাচুর্যকে মানুষ দুনিয়ার জীবনের সাফল্য মনে করলেও প্রকৃত পক্ষে এ দুটো জিনিস আখিরাতের সাফল্যের পথে প্রতিবন্ধক। এ দুটো এমন জিনিস যা থেকে পরকালিন কল্যাণ লাভ করা সবার দ্বারা সম্ভব হয়না। আর যে বস্তু দিয়ে কল্যাণ লাভ করা যায় না, তা থাকার চেয়ে না থাকাটাই উত্তম। কিন্তু তবুও দেখা যায় এগুলো দিয়ে দুনিয়ার কল্যাণ লাভের

জন্য মানুষ পাগল পারা। সত্যিকার অর্থে একজন মুমিন আখিরাতের কল্যাণের আশার দুনিয়ার সকল কল্যাণকে হাসিমুখে ত্যাগ করতে কখনো দ্বিধা করেনা। তাছাড়া দুনিয়ার সকলপ্রকার কল্যাণই অস্থায়ী-নশ্বর। পক্ষান্তরে আখিরাতের কল্যাণ হচ্ছে চিরস্থায়ী-অবিনশ্বর। সুতরাং প্রকৃত বুদ্ধিমানতো সেই, যে নশ্বর বস্তুর উপর অবিনশ্বর বস্তুকে অগ্রাধিকার দেয়। অত্যন্ত সুন্দরভাবে আলোচ্য এ হাদীসটিতে আখিরাতের গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। এ হাদীসটি ঐ সব লোকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বের দাবী রাখে, যারা পরকাল বা আখিরাতে বিশ্বাসী।

ব্যাখ্যা

মানুষের আদি নিবাস হচ্ছে জান্নাত। সামান্য কিছু দিনের জন্য তাকে পৃথিবী নামক জায়গায় প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে। এ দায়িত্ব পালনের প্রচেষ্টাই হচ্ছে তার এক ধরণের পরীক্ষা। যদি সে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে তবে তাকে পুণরায় তার আদি আবাসস্থল জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। সেখানকার সর্বোত্তম আকর্ষনীয় বস্তু হচ্ছে মহান আল্লাহর অকল্পনীয় অপরূপ দর্শন।

একজন প্রবাসী যেমন দেশে ফেরার নিমিত্তে এবং আপনজনের দর্শন লাভের অভিপ্রায়ে প্লেনের একটি টিকেটের জন্য অধীর আগ্রহে মরিয়া হয়ে উঠে। ঠিক তেমনভাবে একজন মুমিন তার আসল বাড়ি ফিরে সর্বাধিক প্রিয়জন আল্লাহর দর্শন লাভের জন্য মৃত্যুর প্রতীক্ষায় উম্মুখ থাকে। কারণ প্রবাসীর দেশে ফেরার মাধ্যম যেমন প্লেন বা যান, তদ্রূপ আখিরাত প্রবাসীদের গন্তব্যস্থলে পৌছার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে মৃত্যু। কাজেই এ মৃত্যু তার নিকট ভয়ের নয় কামনার বস্তু। সর্বদা সে মৃত্যুর জন্য আগ্রহ নিয়ে প্রস্তুত থাকে। কিন্তু যারা দুনিয়ায় এসে আসল বাড়ির কথা ভুলে যায়, দুনিয়ার জীবনকে সব চাওয়া পাওয়ার কেন্দ্র মনে করে, তাদের জন্য মৃত্যু এক বিরম্বনা। সর্বদা মৃত্যুকে তারা পালিয়ে বেড়ায়। তবুও দুর্ভাগ্য মৃত্যু তাদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়ই।

দীর্ঘ জীবন পেয়েও যদি সে জীবনকে কাজে লাগানো না যায়। দিনের পর দিন শুধু গুনাহর বোঝা বাড়তে থাকে। তবে তার চেয়ে ঐ জীবন উত্তম, যা দীর্ঘ না হলেও পুণ্য কাজে পরিপূর্ণ।

অধিক সম্পদ মানুষকে স্বেচ্ছাচারী ও লোভাতুর করে তোলে। আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয়। বিচারের দিন সে তার হিসেব দিতে হিমশিম খেয়ে যাবে। দুনিয়ায়

দেখা যায়, যার সম্পদ অল্প তার ঝামেলা কম। চোরের ভয় নেই, ডাকাতের ভয় নেই, সম্পদের হিসেব নিকেশ করার জন্য কোন হিসেব রক্ষকের প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে যার সম্পদ বেশী তার চোরের ভয়, ডাকাতের ভয়, সম্পদের সুষ্ঠ হিসেব রাখা যায় কিনা তার ভয় ইত্যাদি সারাক্ষণ তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। বিভিন্ন সেকটরে সুষ্ঠ হিসেবের জন্য হিসেব রক্ষা অথবা ম্যানেজার নিয়োগের প্রয়োজন পড়ে।

তারপরও এক মুহূর্তের জন্য তার স্বস্তি নেই। অদ্রূপ আখিরাতের হিসেবের সময় যাদের সম্পদ অল্প তাদের ঝামেলা কম হবে এবং যাদের সম্পদ বেশী তাদের ঝামেলা বেশী হবে। আর যার ঝামেলা বেশী হবে তার মুক্তির আশা ততো ক্ষীণ হবে। এ জন্যই নবী করীম (সা) বলেছেন?

اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظِلُّ اَحَدُكُمْ يَحْمِىْ
سَقِيْمَهُ الْمَاءَ-

আল্লাহ্ যাকে ভালোবাসেন তাকে দুনিয়া থেকে এমন ভাবে রক্ষা করেন, যে ভাবে তোমরা রোগীকে পানি থেকে হেফাজতে রাখো। (তিরমিযি)

কাজেই দেখা যাচ্ছে সম্পদের স্বল্পতা দূর্ভাগ্যের লক্ষণ নয় সৌভাগ্যের প্রতীক। এ সৌভাগ্যবান আল্লাহ্ তাদেরকেই করেন যাদেরকে তিনি বেশী পছন্দ করেন। এবং যারা ধৈর্যশীল। বেশী পাওয়ার জন্য সীমা লংঘন করে না।

শিক্ষাবলী

১। জীবন দীর্ঘ হোক কিংবা ছোট হোক তা পুণ্যময় করে তোলার প্রচেষ্টা করতে হবে।
২। সুদীর্ঘ জীবন দুঃখের কারণও হতে পারে।
৩। মৃত্যু ভয়ের বস্তু নয় কামনার বস্তু।
৪। মানুষ চায় সম্পদের প্রাচুর্যতা কিন্তু সম্পদের স্বল্পতা মুক্তির পথকে সহজ করে দেয়।
৫। আখিরাতকে অবিশ্বাস করা কিংবা ভুলে যাওয়াই মৃত্যুকে ভয় পাবার মূল কারণ।

তথ্যসূত্র

১। মা'আরিফুল হাদীস-মাওলানা মনযুর নুমানী
২। জামেউত তিরমিযি।
৩। মিশকাত শরীফ।
৪। তাফহীমুল কুরআন - সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী।
৫। মাআ'রিফুল কুরআন - মুফতী মুহাম্মদ শফী।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهٗ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَاَ فِيْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابًّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتَ حَسَبٍ وَّجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّى اَخَافُ اللّٰهِ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُه مَاتُنْفِقُ بِمَيْمَنَه –

হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রা) বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ সাত প্রকার লোককে আল্লাহ্পাক (কিয়ামতের দিন) তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন। যেদিন আরশের ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ণ নেতা। (২) ঐ যুবক যে তার যৌবনকাল আল্লাহ্র ইবাদাতে কাটিয়েছে। (৩) এমন (নামাযী) ব্যক্তি যার অন্তকরণ মসজিদের সাথে ঝুলন্ত থাকে। একবার মসজিদ হতে বের হলে পুণরায় প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত ব্যাকুল থাকে। (৪) এমন দু'ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহ্র মহব্বতে পরস্পর মিলিত হয় এবং পরস্পর পৃথক হয়। (৫) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহ্র ভয়ে চোখের অশ্রু বিসর্জন দেয়। (৬) সম্ভ্রান্ত বংশের কোন সুন্দরী রমণী কোন ব্যাক্তিকে ব্যাভিচারে লিপ্ত হবার আহবান জানায় আর ঐ ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়েই বিরত থাকে। এবং (৭) যে ব্যক্তি এতো গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত কি দান করলো বাম হাতও তা জানলো না।

(বুখারী, মুসলিম)

শব্দার্থ

سَبْعَةٌ - সাত। يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ -আল্লাহ তাদেরকে ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। يَوْمَ لَاظِلَّ - যেদিন কোন ছায়া থাকবেনা। اِلَّا - ব্যতীত, ছাড়া। ظِلُّه -তাঁর (আরশের) ছায়া। اِمَامٌ - নেতা। عَادِلٌ - ন্যায় পরায়ণ। شَابٌّ - যুবক। نَشَأَ - অতিবাহিত করা, জন্ম, প্রবৃদ্ধি। فِىْ - মধ্যে। عِبَادَةِ اللّٰهِ - আল্লাহর ইবাদত। رَجُلٌ - ব্যক্তি। قَلْبُهٗ -তার দিল বা অন্তকরণ। مُعَلَّقٌ - ঝুলানো। بِالْمَسْجِدِ - মসজিদের সাথে। اِذَا - যখন। خَرَجَ - সে বের হলো। مِنْهُ - উহা হতে। حَتّٰى - যতক্ষণ। يَعُوْدُ - প্রত্যবর্তন করে। اِلَيْهِ - তারদিকে। وَ -এবং। رَجُلَانِ -দু'ব্যক্তি। تَحَابَّا - পরস্পর ভালোবাসে। فِى اللّٰهِ - আল্লাহর জন্য। اِجْتَمَعَا -পরস্পর মিলিত হয়। تَفَرَّقَا -পরস্পর পৃথক হয়। ذَكَرَاللّٰهَ - আল্লাহর স্মরণে। خَالِيًا -নির্জন, নিরালয়। فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ-অতঃপর চোখের পানি ফেলে। دَعَتْهُ - তাকে ডেকেছে। اِمْرَاَةٌ - স্ত্রীলোক। حَسَبٍ - সুন্দরী। اَخَافُ اللّٰهَ -আল্লাহকে ভয় করি। تَصَدَّقَ - দান করে। فَاَخْفَاهَا -অতঃপর তা গোপন রাখে। لَا تَعْلَمَ - জানতে পারে না। مَاتُنْفِقُ -কি দান করেছে। شِمَالُه -তার উত্তর (এখানে বাম হাত অর্থে) بِيَمِيْنِهٖ -তার ডান হাত দ্বারা।

রাবীর (বর্ণনাকারীর) পরিচয়

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) এর ইসলাম পুর্ব নাম ছিলো "আবদে শামস"। অর্থ- অরুণ দাস। আবু হুরাইরাহ তাঁর লকব বা উপাধী। একদিন নবী করীম (সা) কৌতুক করে ডাকলেন হে আবু হুরাইরাহ (অর্থাৎ হে ছোট বিড়ালের পিতা!) ব্যাস, সেদিন থেকেই তিনি আবু হুরাইরাহ নামে পরিচিত হলেন।

আবু হুরাইরাহ (রা) হিজরী ৭ম বৎসরে মুসলমান হন। তখন হতে রাসূলুল্লাহ (সা) এর মৃত্যু পর্যন্ত মসজিদে নববীতেই অবস্থান করতেন। তিনি ছিলেন 'আহলে ছুফফাদের' একজন। ঘর-সংসার ব্যবসা বাণিজ্য বিসর্জন দিয়ে সর্বক্ষণ

মহানবী (সা) এর খেদমতে পড়ে থাকতেন। শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোথাও পাঠালে বা কোন দায়িত্ব দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তা পালন করতেন। তিনি মাত্র সাড়ে তিন বৎসরের মতো সময় রাসূলে করীম (সা) এর সান্নিধ্য পান। এ সময়ের মধ্যেই তিনি যে হাদীস মুখস্থ করেছিলেন কোন সাহাবীই তা পারেননি। এ ব্যাপারে তিনি নিজেই বলেনঃ "একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আমার স্মৃতিশক্তির ত্রুটি সম্বন্ধে আরজ করলাম। তিনি বললেন, 'তোমার চাদর বিছাও।' আমি আমার চাদর বিছালাম। নবী করীম (সা) তাঁর উভয় হস্ত মোবারক দিয়ে কি যেনো ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর আমাকে চাদরখানা গায়ে দিতে আদেশ করলেন। চাদরখানা আমি আমার বুকে জুড়িয়ে নিলাম। এ ঘটনার পর আমি আর কিছুই ভুলিনি।"[১] হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) ছিলেন জ্ঞান সমুদ্রের অথৈ জল। আল্লাহর রাসূল (সা) নিজেই বলেছেন "আবু হুরাইরাহ জ্ঞানের আধার।"[২]

তিনি হিজরী ৫৯ সনে ৭৮ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ৫৩৭৮টি। তাঁর ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ৮০০।

হাদীসটির গুরুত্ব

এ হাদীসে সাতটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। এ সাতটি বৈশিষ্ট্যই উৎকৃষ্ট। কেননা এমন কোন আমল বা বৈশিষ্ট্য নেই যার বিনিময়ে কঠিন মুসিবতের সময়ে আরশের ছায়ায় স্থান লাভ করা যেতে পারে। শুধুমাত্র উপরোক্ত আমল ছাড়া। আর এ কথাও ঠিক যে, স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যাদেরকে তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন তারা সত্যিই সৌভাগ্যবান। এ সৌভাগ্য লাভ করতে হলে তাকে হতে হবে অকৃত্রিম মুসলমান। সৌভাগ্য লাভ করতে হলে তাকে হতে হবে অকৃত্রিম মুসলমান। একজন সত্যিকার মুসলমানের দ্বারা স্বেচ্ছায় খোদাদ্রোহী কোন কাজ করার কথা কল্পনাও করা যায় না।

বস্তুতঃ মানুষের ব্যক্তি জীবন হতে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই হাদীসটি "আদর্শের মাপকাঠি হিসেবে" দিক-নির্দেশনা দিবে। প্রতিটি মানুষের জীবনেই হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

---

(১) বুখারী
(২) বুখারী, মুসলিম।

ব্যাখ্যা

(১) ন্যায়বিচারক নেতার কথা বলে এখানে প্রত্যেকটি দায়িত্বশীল ব্যক্তির কথাই বলা হয়েছে। কেউ পরিবারের নেতা; কেউ সমাজের নেতা, কেউ দেশের নেতা অথবা কেউ কোন দল বা সংগঠনের নেতা, যাই হোক না কেন উক্ত কথা সবার বেলায়ই প্রযোজ্য। কেননা রাসূলে করীম (সা) বলেনঃ

اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ –

"সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (বুখারী-মুসলিম)

দেখা যাচ্ছে দায়িত্ব এবং নেতৃত্বের সাথে ন্যায় বিচার বা ইনসাফ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যার যে পর্যায়ের দায়িত্ব বা নেতৃত্বই হোক না কেন তা ইনসাফ ভিত্তিক সম্পাদন করাই হলো ঈমানের দাবী। আর এ দাবী পূরণের মাধ্যমেই দায়িত্বশীল ব্যক্তির অধিনস্তদের মাঝে সৃষ্টি হয় সুখ-সম্প্রীতি। বিনিময়ে মহান আল্লাহও দিবেন এতো বড়ো মর্যাদা। পক্ষান্তরে যে তার এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে তার অধিনস্তদের মাঝেও সৃষ্টি হবে বিশৃংখলা; অবিশ্বাস, শঠতা ইত্যাদি, ফলে ধীরে ধীরে একটি সুন্দর সমাজ চলে যাবে ধ্বংসের মুখোমুখী। তাই নেতৃত্বে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি।

নবী করীম (সা) বলেনঃ

مَامِنْ وَّالٍ يَلِىْ رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ اِلاَّحَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ـ (بخارى، مسلم)

"যে ব্যক্তি মুসলমানদের যাবতীয় ব্যাপারে দায়িত্বশীল হওয়ার পর তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবে।" (বুখারী, মুসলিম)

(২) যৌবন মানুষের জীবনের শ্রেষ্ট সম্পদ। এ সময়ে মানুষের প্রতিভা, সাহস, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি গুণের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। সাথে সাথে যৌনক্ষুধা এবং ভোগের স্পৃহাও বৃদ্ধি পায় পরিপূর্ণ ভাবে। তখন প্রতিটি মুহূর্তই মানুষকে ভোগের হাতছানি দেয় এবং চতুর্দিকে শয়তান বিছিয়ে রাখে তার মায়া জাল-কুহক। প্রতি মুহূর্তে

হৃদয় কন্দরে বসে মানুষকে দেয় কুমন্ত্রণা। পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুকে চাকচিক্যময় করে তুলে ধরে মানুষের চোখের সামনে। এমনি প্রতিকূল পরিবেশে যদি কোন যুবক সবকিছুর আকর্ষণ তুচ্ছ করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট নিজেকে উৎসর্গ করতে চায় তবে সেটি হবে তার জীবনে সবচেয়ে বড়ো কুরবানী। এজন্যই আল্লাহও কিয়ামতের দিন তাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিবেন।

(৩) মসজিদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হৃদয় বলতে জামায়াতে নামায আদায়কারী ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। কেননা যারা সর্বদা জামায়াতে নামায আদায় করেন তারা প্রতি মুহূর্তেই নামাযের কথা এবং সময়ের কথা মনে করেন। প্রতিটি মুমিনের নৈতিকতার প্রাথমিক ট্রেনিং হচ্ছে নামায আর ট্রেনিংয়ের জায়গা হলো মসজিদ। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে নিয়মিত ট্রেনিংয়ে অংশগ্রহণ করবে সে অধিক দক্ষতা অর্জন করবে। আর আল্লাহর বিধানের পূর্ন বাস্তবায়ন একজন দক্ষ মুমিনের দ্বারাই সম্ভব।

তাছাড়া উক্ত কথার আরেকটি ব্যাখ্যা হতে পারে, তখন সমস্ত প্রশাসন ব্যবস্থাই ছিলো মসজিদ কেন্দ্রিক। তাই সকল বিধি-নিষেধ চাই তা ব্যক্তি পর্যায়ের হোক অথবা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়েরই হোক না কেন সবকিছু মসজিদ হতে ঘোষণা করা হতো। এজন্য প্রতিটি মুসলমান সর্বদা উম্মুখ হয়ে থাকতো যে, কখন কি ঘোষণা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) এর পক্ষ থেকে দেয়া হবে। আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বতই ছিলো মসজিদের প্রতি আকর্ষণের একমাত্র কারণ।

(৪) হাদীসের ভাষা হচ্ছে-"যারা আল্লাহর মহব্বতে পরস্পর মিলিত হয় এবং পৃথক হয়।" একথার দু'টো অর্থ হতে পারে এবং উভয় অর্থই এখানে প্রযোজ্য। প্রথমতঃ উভয়ে আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞানার্জনের জন্য অথবা আল্লাহর দ্বীনকে জমিনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরস্পর মিলিত হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা প্রচেষ্টা করা এবং এ উদ্দেশ্যেই একে অপরের নিকট হতে পৃথক হওয়া। দ্বিতীয়ত যারা আল্লাহর দ্বীনের পথে আছে তাদেরকে ভালোবাসা এবং যারা আল্লাহর দ্বীনের সাথে কুফুরী করে আর তা থেকে কোন অবস্থাতে বিরত রাখা না যায় তবে

তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

যেন অন্য হাদীসে বলা হয়েছেঃ

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَطَعَ لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِاسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ—

"যে আল্লাহর জন্য ভালবাসলো এবং শত্রুতা করলো, যে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য দান করলো এবং বিরত রইলো, সে যেন নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিলো।

তবে শর্ত হলো তা হতে হবে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। নিজেদের স্বার্থের জন্য অথবা খেয়াল খুশিমতো হলে হবে না।

(৫) যে ব্যক্তি নির্জনে নিজের গুনাহ্র কথা চিন্তা করে এবং সর্বশক্তিমান মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়ে নিরালায় অশ্রু বিসর্জন দেয়, তাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর আদালতে আখিরাতে আরশের ছায়ায় স্থান দিয়ে ধন্য করবেন। এর চেয়ে কল্যাণ আর কি হতে পারে।

অন্যত্র বলা হয়েছে-

عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ —

"দু'প্রকার চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না। প্রথমতঃ যে চোখ আল্লাহ্র ভয়ে রোদন করে। দ্বিতীয়তঃ ঐ চোখ যা আল্লাহ্র পথে রাত জেগে পাহারা দেয়।" (বুখারী)

(৬) পৃথিবীতে মানুষের ভোগের সামগ্রী মাত্র দুটি- একটি ধনসম্পদ, অপরটি নারী। কোনটার উপরই লোভ সামলানো সহজ নয়। যদিও বা সম্পদের উপর থেকে লোভ সামলানো যায় তবে নারীর কামনার আগুন থেকে দূরে থাকা তার চেয়েও কঠিন। বিশেষ করে যৌবনের প্রতিটি মুহূর্তেই নারীর সান্নিধ্য পেতে যখন মন ব্যাকুল থাকে। কল্পনার মুকুরে ভেসে বেড়ায় অসংখ্য নারীর মুখ। তখন যদি সম্ভ্রান্ত বংশের কোন সুন্দরী রমণী কু-প্রবৃত্তি চরিতার্থের আহবান জানায়, তবে তা থেকে বিরত থাকা ঈমানের এক কঠিন অগ্নি পরীক্ষা। দেখা যায় সমাজের কোন

আদর্শবান যুবক, তাকে যদিও পৃথিবীর কোন সম্পদের মোহে ফেলা যায় না, তবে নারীর প্রলোভনে ফেলতে একটুও কষ্ট হয়না। কারণ নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ চিরন্তনী। তাই মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ভোগের বৈধ রাস্তাও দেখিয়েছেন। তবু এ (ব্যাভিচারের) পথ হতে বাঁচার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে আল্লহ্র ভয় এবং পরকালে জবাবদিহির অনুভূতি। আর এ অনুভূতি যতো তীব্র হতে তীব্রতর হবে ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা ততো সহজ হতে সহজতর হবে। বিনিময়ে আল্লাহ্ও দিবেন এমন অভাবনীয় মর্যাদা।

(৭) দানের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَاكَسَبْتُمْ - (البقرة)

"হে ঈমানদারগণ। তোমরা যা উপার্জন করো সেই পবিত্র বস্তু হতে (আল্লাহর পথে) দান করো। (আল-বাকারা)

তবে শর্ত হচ্ছে দান শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হতে হবে, লোক দেখানো দান অথবা নিজের কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দানের কোন মর্যাদাই আল্লাহর নিকট নেই।

অপর হাদীসে বলা হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ —

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক আকার আকৃতি বা ধনমালের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। বরং তিনি দৃষ্টিপাত করেন মনের অবস্থা ও কাজকর্মের দিকে।" (মুসলিম)

দানকারীর মধ্যে নিজের অজান্তেই অনেক সময় রিয়া বা লোক দেখানো মনোভাবের সৃষ্টি হয়। এ রিয়া ঐ পূণ্যকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। তাই এ হাদীসে গোপনে দানের উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

শিক্ষাবলী

(১) নেতৃত্ব আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের পথে হওয়াই বাঞ্ছনীয়

(২) যৌবনের সমস্ত শক্তি সামর্থ আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত করতে হবে। কেননা বিপ্লব একমাত্র যুবক শ্রেণীর দ্বারাই সংঘটিত হতে পারে।

(৩) সমাজের সর্বস্তরে নামায কায়েম করতে হবে। বিশেষ করে নিজেকে নামাযের পূর্ণ পাবন্দ করতে হবে।

(৪) ভালোবাসা এবং শত্রুতার ভিত্তি হবে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি।

(৫) নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের প্রচষ্টা করতে হবে।

(৬) পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত পর্দা প্রথার অনুসরণ করতে হবে।

(৭) গোপনে এবং নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে হবে।

(৮) জীবনের প্রতিটি কাজ সম্পাদনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং রেজামন্দি।

তথ্যসূত্র

১. সহীহ্ আল বুখারী
২. সহীস আল মুসলিম
৩. ফতহুল বারী
৪. তাফহীমুল কুরআন
৫. মাআরিফুল কুরআন
৬. সাহাবা চরিত- ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৭. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা।

عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ ثَلٰثًا قُلْنَا لِمَنْ ؟ قَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهٖ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ - (مسلم)

"হযরত তামীম দারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলে কারীম (সা) তিনবার বললেছেন—দ্বীন হচ্ছে নসীহত বা কল্যাণ কামনা। আমরা বললাম, (ইয়া রাসূলাল্লাহ) কার জন্য এ নসীহত বা কল্যাণ কামনা? প্রতি উত্তরে রাসূলে কারীম (সা) বললেনঃ আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলমানদের ইমাম বা নেতৃবৃন্দ এবং মুসলিম জনসাধারনের জন্য।" (মুসলিম)

শব্দার্থ

اَنَّ – নিশ্চয়ই। اَلدِّيْنُ – দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা।
اَلنَّصِيْحَةُ – সহমর্মিতা বা কল্যাণ কামনা। ثَلٰثًا – তিনবার। قُلْنَا – আমরা বললাম। لِمَنْ –কার জন্য? قَالَ – তিনি বলেন। لِلّٰهِ –আল্লাহর জন্যে।
وَ –এবং। لِكِتَابِهٖ – কিতাবের জন্য। لِرَسُوْلِهٖ – তার রাসূলের জন্য।
لِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ – মুসলমানদের নেতার জন্য। عَامَّتِهِمْ – সর্বসাধারণ।

রাবীর (বর্ণনাকারীর) পরিচয়

তাঁর নাম তামীম, দারী তাঁর বংশীয় উপাধী। তাঁর দাদার নাম ছিলো দার। এজন্য তাঁদের বংশের সকলের নামের শেষে দারী শব্দটি যোগ করা হয়। তামীম দারী (রা) এর পিতার নাম আউস দারী। তাঁর পিতা এবং দাদা সকলেই ছিলো খ্রীষ্টান ধর্মবলম্বী। তামীম দারী (রা) ও জীবনের বেশ কিছু অংশ খ্রীষ্টান ধর্মের উপর কাটিয়েছেন। হিজরী নবম সনে তিনি পবিত্র ইসলামে দীক্ষা নেন। এবং

বাকী জীবন তিনি ইসলামের অনুশীলন বাস্তবায়নের জন্য অতিবাহিত করেন।

আল্লাহর সন্তুষ্টিই ছিলো তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। কথিত আছে- তিনি এক রাকাত নামাযে পূর্ণ কুরআন খতম করতেন।

হযরত তামীমদারী (রা) থেকে সর্বমোট ১৮টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসটির গুরুত্ব

আলোচ্য হাদীস সম্বন্ধে সহীহ্ মুসলিম শরীফের ভাষ্যকার ইমাম নববী (রা) বলেন-

هٰذَا حَدِيْثٌ عَظِيْمُ شَأْنٍ وَعَلَيْهِ مَدَارُ الْاِسْلَامِ ـ

"এটি বিরাট মর্যাদা ও গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদীস। এর উপরই ইসলামের বুনিয়াদ বা ভিত্তি সংস্থাপিত।"

এ হাদীসটি মুসলিম ছাড়াও তিরমিযি, নাসায়ী, আবুদাউদ, দারেমী স্ব স্ব গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। সকলেরই বর্ননার ভাষা এক ও অভিন্ন। একটি আদর্শ সুন্দর, সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে হাদীসটি ধ্রুব নক্ষত্রের মতোই সঠিক পথের সন্ধান দিবে, প্রতিটি মু'মিনকে।

ব্যাখ্যা

হাদীসে বর্ণিত "নাসিহাতুন" শব্দটি "নুসহ" শব্দ হতে নির্গত। "নুসহা" শব্দের অর্থ হচ্ছে সকল প্রকার ভেজাল মিশ্রণ ও জাল হতে পবিত্র হওয়া। এ শব্দটির আরেকটি প্রতিশব্দ হলো "খালেছ" ।মধু যখন মোম ও অন্যান্য আবর্জনা হতে পৃথক করা হয় তখন তাকে বলা হয় "নাসেহ"। আবার মানুষের মন যখন মোনাফেকী হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি মুক্ত হয়, তখন বলা হয়ঃ

نَصَحَ قَلْبُ الرَّجُلِ ـ

"অর্থাৎ লোকটির ভিতর বাহির এবং কথা ও কাজের মিল আছে। পবিত্র কুরআনে "তওবাতুন্ নসুহা" এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।"

(ক) আল্লাহর জন্যে নসীহাতঃ আন্তরিক ও অকৃত্রিমভাবে আল্লাহ্র প্রতিটি গুণ বা ছিফাতের ও ক্ষমতার স্বীকৃতি দেয়া এবং আল্লাহর প্রতিটি হুকুম

বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা করা। সাথে সাথে আল্লাহর গুণ, ক্ষমতা, অধিকার ইত্যাদির সাথে কোন অবস্থাতেই কাউকে শরীক না করা। এটাই হলো আল্লাহর জন্য নসীহাত এর তাৎপর্য। এর ফলে মানুষ যখন নিজেই নিজের কল্যাণে ব্যাপৃত হবে তখনই একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজের ভিত্তি নির্মিত হবে। আর কল্যাণের ব্যাপারে আল্লাহ্ নিজেই বলেছেনঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ —

"যে ব্যক্তি সৎকাজ বা কল্যাণমূলক কোন কাজ করলো প্রকৃতপক্ষে তা নিজেরই কল্যাণ বয়ে আনলো।"

(খ) আল্লাহর কিতাবের জন্য নসীহতঃ এ কথার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কিতাব অবতীর্ণের মূল কারণ অনুধাবন এবং তা কার্যকরী করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আর এ উদ্দেশ্য কার্যকরী করার উপায় হচ্ছে তিনটি।

(১) শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতঃ কুরআন মজীদ তাজবীদ ও তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করা।

আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا —

"কুরআনকে বিশুদ্ধতার সাথে থেমে থেমে পাঠ কর।" (সূরা আল মুজ্জাম্মিল)

(২) গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়নঃ শুধু তিলাওয়াত করলেই হবে না, কুরআনের বিভিন্ন বিষয়াবলীর উপর চিন্তা ও গবেষণা করতে হবে। কারণ একমাত্র কুরআনই হচ্ছে মানব জীবনের সমস্ত সমস্যার ঐশী সমাধান। তাই এর উপর গবেষণা করে মানুষের মৌলিক সমস্যাবলীর যুগোপযোগী সমাধানের চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য।

(৩) কুরআনের বিধানকে বাস্তবায়ন করাঃ আল কুরআন শুধুমাত্র ইতিহাস অথবা দর্শনের গ্রন্থ নয়। এটি হচ্ছে মানব সমাজের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তাই আল-কুরআনের অধ্যয়ন ও গবেষণার সাথে সাথে সমস্ত বিধি-বিধানকে কার্যকরী রূপ দেয়া। যেমন কোন রোগী যদি দেশের শ্রেষ্ঠ একজন ডাক্তারের "ব্যবস্থাপত্র" মোতাবেক পদক্ষেপ না নিয়ে শুধুমাত্র ব্যবস্থাপত্রটি বার বার আদ্যোপ্রান্ত পাঠ করে, তাহলে রোগীর সুস্থতার কথা যেমন চিন্তা করা যায়

না তদ্রূপ কুরআনের আইন-কানুন বাস্তবায়ন ছাড়া শুধুমাত্র অধ্যয়ন বা তিলাওয়াত এ ঝঞ্জা- বিক্ষুব্ধ সমাজে কোন কল্যাণই বয়ে আনতে পারে না।

(গ) রাসূলের জন্য নসীহতঃ রাসুল (সা) এর নবুয়তকে স্বীকার করা এবং তাঁর সমস্ত আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা করা। সাথে সাথে পৃথিবীর সব কিছুর উর্ধ্বে তাঁর স্থান দেয়া ও ভালোবাসা। কেননা নবী করীম (সা) নিজেই বলেছেনঃ

لَايُؤْمِنُ اَحَدُ كُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مَنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ - (مسلم، انس رض)

"তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তার নিকট তার পিতা, সন্তানাদি ও সমস্ত মানুষ অপেক্ষা আমি অধিকতর প্রিয় হবো।" (বুখারী, মুসলিম)

(ঘ) ইমাম বা নেতৃবৃন্দের জন্য নসীহতঃ অত্র হাদীসে নামাযের বা মসজিদের ইমাম বা নেতাদের কথা বলা হয়নি। তেমনিভাবে যারা কুরআন সুন্নাহর আইনকে পরিহার করে মানুষের মনগড়া আইনের ধারক ও বাহক তাদের নেতৃত্বের কথাও বলা হয়নি বরং এখানে ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শবাদী খোদাভীরু নেতৃবৃন্দের কথাই বলা হয়েছে।

নেতৃবৃন্দের জন্য নসীহত করার অর্থ সর্বদা তাদের আনুগত্য ও সহযোগিতা করা এবং অন্যায় হলে তাদের সমালোচনা করা, সৎপথে চলার জন্য পরামর্শ দেয়া। না শুনলে আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নেয়া। কেননা স্বয়ং নবী করীম (সা) বলেছেনঃ

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ اِلاَّ اَنْ يُّؤْمَرَ بِمَعْصِيَّةٍ وَاِنْ اَمَرَ بِمَعْصِيَّةٍ فَلَاسَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ - (بخارى، مسلم)

"পছন্দ হোক বা না হোক প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে নেতার কথা শ্রবণ করা এবং নেতার আনুগত্য করা। কিন্তু যদি কোন নাফরমানী বা গুণাহর কাজের

আদেশ করে তবে অন্য কথা। যদি গুণাহ্ বা নাফরমানীর আদেশ দেয়া হয় তবে তার কথা শুনা এবং আনুগত্য করা যাবে না।" (বুখারী, মুসলিম)

(ঙ) সাধারণ মুসলমানের জন্য নসীহতঃ মুসলমান জনসাধারণের জন্যে নসীহত বা সহমর্মিতা বলতে বুঝায় ইহলৌকিক ও পরলৌকিক কল্যাণের জন্য তাদেরকে সদুপদেশ দেয়া এবং মানুষের ক্ষতি বা কষ্ট না হয় সেজন্য সদা সজাগ থাকা। নিম্নোক্ত কয়েক ভাবে এ কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে।

(১) সাধারণ লোকদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত বা তাবলীগ করে তাদেরকে সৎপথের দিকে আহবান করা।

(২) কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযা ও দাফন-কাফনে অংশ গ্রহণ করা এবং তার পরিবারবর্গকে সবরের নসীহত করা।

(৪) কোন মুসলমান বিপদগ্রস্থ হলে ব্যক্তিগতভাবেই হোক অথবা সমষ্টিগতভাবেই হোক তার সহযোগিতা করা।

(৫) কেউ দাওয়াত দিলে গ্রহণ করা; কারণ এতে পরস্পর সৌহার্দ সৃষ্টি হয়।

(৬) সাক্ষাত হলে সালাম দেয়া।

(৭) উপস্থিত বা অনুপস্থিত সর্বাবস্থায় সকল মুসলমানের কল্যাণ কামনা করা।

বস্তুত একটি সুন্দর সমাজ গঠনে অত্র হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা পূর্ণাঙ্গ ইসলামকে একটি সংক্ষিপ্ত আকারে এ হাদীসে শামিল করা হয়েছে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْاِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاذَّةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ وَاِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ ـ (مشكوة، احمد)

"হযরত মোয়াজ ইবনে জাবাল (রা) কর্তৃক বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ মেষপালের নেকড়ে বাঘের মতো শয়তান মানুষের নেকড়ে বাঘ স্বরূপ। যে মেষপালের মধ্য হতে কোন একটি মেষ দল হতে আলাদা থাকে অথবা খাদ্যের সন্ধানে একাকী দূরে চলে যায় অথবা যেটি অলসতাবশত দলের একপ্রান্তে পড়ে থাকে, সেটিকে নেকড়ে বাঘ উঠিয়ে নিয়ে যায়। সাবধান! তোমরা কখনো জামায়াত ছেড়ে একাকী দুর্গম পার্বত্য ঝুঁকিপূর্ণ পথে চলবে না। সুতরাং সর্বদা জামায়াত বা মুসলিম জনসাধারণের সাথে থাকবে। (মিশকাত, মুসনাদে আহমদ)

শব্দার্থ

ذِئْبُ - নেকড়ে বাঘ। اَلْاِنْسَانُ - মানুষ। كَ - মত। اَلْغَنَمُ - মেষ। يَاْخُذُ -নেয়া। اَلشَّاذَّةُ - দল হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া। اَلْقَاصِيَةُ - খাদ্যের সন্ধানে একাকী দূরে চলে যাওয়া বা কোন জায়গায় একাকী অবস্থান করা। اَلنَّاحِيَةُ - অলসতাবশতঃ এক প্রান্তে পড়ে থাকা। اِيَّاكُمْ - অবশ্যই তোমরা। اَلشِّعَابُ - ঝুঁকিপূর্ণ দুর্গমপাহাড়ী পথ। عَلَيْكُمْ - তোমাদের উপর। بِالْجَمَاعَةِ - জামায়াতের সাথে। اَلْعَامَّةُ - জন সাধারণ।

রাবীর (বর্ণনাকারীর) পরিচয়

হযরত মোয়াজ ইবনে জাবাল (রা) মদীনার খাযরাজ বংশের বনী সালমা গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে আকাবার দ্বিতীয় শপথে অংশগ্রহণ করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসেন। জ্ঞান-বুদ্ধি, ধৈর্য- সাহস, সততা ও ন্যায়নিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক যুবক। তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। মহানবী (সা) এর খেদমতে আসার পর তাঁর শিক্ষার দ্বার উম্মোচিত হয় এবং অল্পকালের মধ্যেই তিনি ইসলামের ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি অধিকাংশ সময় রাসূলে করীম (সা) এর সান্নিধ্যে কাটাতেন এবং রাসূলে করীম (সা) ও তাঁকে অত্যাধিক স্নেহ করতেন। হযরত মোয়াজ ইবনে জাবাল (রা) থেকে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার অধিকাংশ হলো রাসূলে করীম (সা) কর্তৃক তাঁকে নসীহত কল্পে বর্ণিত হাদীস।

হযরত মোয়াজ (রা) কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জ্ঞান- বিজ্ঞানে পরিপূর্ণতা দান করেছিলেন। তাঁকে কখনো দেখা যায় ইয়েমেনের গভর্ণর; কখনো দেখা যায় রোমের রাষ্ট্রদূত হিসেবে; আবার হযরত আবুবকর (রা) এর উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের মধ্যেও তিনি একজন। সেনাপতিত্ব, শিক্ষকের দায়িত্বও পালন করেন। বস্তুত তাঁকে যতো রকমের দায়িত্বই দেয়া হয়েছে তা তিনি সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছেন।

তিনি হাফিজে কুরআন ও উঁচুস্তরের আলেম ছিলেন। কুরআন, হাদীস ও ইলমে ফেকাহ্য় তিনি গভীর জ্ঞান রাখতেন। নবী করীম (সা) যে চারজন সাহাবীকে সাধারণ লোকদেরকে শিক্ষা দেবার দায়িত্বে নিয়োজিত রেখিছিলেন, হযরত মোয়াজ ইবেন জাবাল (রা) ছিলেন তাঁদের একজন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) ই বলেছেনঃ "আমার সাহাবীদের মধ্যে হারামঃ হালালের জ্ঞান সম্পর্কে মোয়াজই বেশি অভিজ্ঞ।" হযরত মাসউদ (রা) বলেছেনঃ "পৃথিবীতে মাত্র তিনজন (বড়ো) আলিম আছেন, তার মধ্যে মেয়াজ ইবনে জাবাল একজন।"

হযরত মোয়াজ (রা) মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে সিরিয়ার গোর প্রদেশের বাইশান শহরে ইন্তেকাল করেন। তাঁর থেকে মোট ১৫৭ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে ইমাম বুখারী মুসলিমের ঐকমত্যের হাদীস ২টি।

হাদীসটির গুরুত্ব

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কালামে ইরশাদ করেনঃ-

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا –

"তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করো, আর তোমরা পরস্পর বিভিন্ন হয়ে পড়ো না।" (আলে-ইমরান)

এ আয়াতকে সামনে রেখে আলোর হাদীস মূল্যায়ন করলে জামায়াতবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব ও জামায়াতবিহীন জীবন যাপনের ভয়াবহ পরিণতি আমাদের সামনে দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়ে উঠে। বিশ্বের সকল মুসলমানের জন্যই জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপনে উৎসাহ প্রদানকারী এ হাদীসটি মাইলষ্টোন হিসেবে কাজ করবে।

ব্যাখ্যা

মুসলমানকে অবশ্যই জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে। চাই তা কোন জনপদেই হোক অথবা কোন সমাজে কিংবা রাষ্ট্রে। এমনকি যদি তিনজন লোকও লোকালয়ের বাইরে জনমানবহীন কোন জায়গায় যায় অথবা যেতে মনস্ত করে সেখানেও একজনকে আমীর নিযুক্ত করে তাঁর অনুসরণপূর্বক জামায়াত কায়েম করতে হবে।

অন্য হাদীসে বলা হয়েছেঃ

لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُوْنُ بِفَلَاةٍ مِّنَ الْاَرْضِ اِلَّا اَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ - (مسند احمد)

"তিনজন লোকও যখন জনমানবহীন মরুভূমিতে থাকবে তখন তাদের একজনকে আমীর বা নেতা নিযুক্ত করে তার অনুসরণ না করে বিছিন্ন থাকা বৈধ নয়। (মুসনাদে আহ্মদ)

অন্য হাদীসে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) ও আবু হুরাইরা (রা) উভয়েই রাসূলে করীম (সা) হতে বর্ণনা করেন -

اِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِى السَّفَرِ فَلْيُؤَمِّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ - (ابوداؤد)

"তিনজন লোক যখন কোথাও সফরের নিয়তে বের হবে তখন অবশ্যই একজনকে আমীর বানিয়ে নিবে"। (আবু দাউদ)

সব ক'টি হাদীসেই তিনজন লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ এখানে সর্বনিম্ন পরিমাণের কথাই বলা হয়েছে। সর্বোচ্চ কোন পরিমাণের কথা উল্লেখ নেই। কেননা সব কটি হাদীসের বর্ণনায় একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সামান্য তিনজন লোকের বেলায়ই যখন জামায়াত ছাড়া গত্যন্তর নেই। তখন এর চেয়ে বেশি লোককে তো অবশ্যই জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে। জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পরিণাম অত্র হাদীসে অবশ্য একটু নমনীয় ভাষায় বলা হলেও অন্য হাদীসে আরো কঠিন ভাষায় সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّعَةِ وَفَارِقُ الْجَمَاعَةِ فَمَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً -

" যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিলো, আর এ অবস্থায় (যদি) মৃত্যুবরণ করে তবে তা হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু।"

সত্যি কথা বলতে কি, যদি কোন সমাজে বা রাষ্ট্রে একজনের নেতৃত্বাধীন জীবন যাপন না করা হয় এবং সবাই স্বেচ্ছাচারীতায় লিপ্ত হয় তবে ঐ সমাজের শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট হতে বাধ্য। তাই সুন্দর ও সুশৃংখল সমাজ গঠনের প্রথম শর্তই হচ্ছে নেতৃত্ব ও নেতার আনুগত্য।

শিক্ষাবলী

(১) জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে।
(২) যে জামায়াত ছেড়ে একাকী থাকে সে শয়তানের ক্রীড়নকে পরিণত হয়।
(৩) জামায়াতবিহীন মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যুও হতে পারে।
(৪) লোকালয়ে অথবা বিজন মরু যেখানেই হোক না কেন নেতৃত্ব এবং আনুগত্যের ধারা ঠিক রাখতে হবে।
(৫) ঈমানকে প্রতিষ্ঠিত রাখার সহজ পথ হচ্ছে জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপন করা।

তথ্য সূত্র

১. মশকাত শরীফ।
২. হাদীস শরীফ ১ম খন্ড
৩. তাফহীমূল কুরআন।
৪. তাফসীরে ইবনে কাসীর।
৫. সাহাবা চরিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ اَلاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهٖ —

"হযরত আবুজর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন— একবার আমি রাসূলে কারীম (সা) কে জিজ্ঞেস করলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন আমল (সবচেয়ে) উত্তম? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ আল্লাহর উপর ঈমান এবং আল্লাহর পথে জিহাদ।" (বুখারী, মুসলিম)

শব্দার্থ

قَالَ – তিনি বললেন। قُلْتُ – আমি জিজ্ঞেস করলাম। اَىُّ – কোন।
اَلْعَمَلُ – কাজকর্ম/ এবাদত। اَلْاِيْمَانُ – বিশ্বাস। اَلْجِهَادُ – আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা। চাই সেটা যুদ্ধই হোক অথবা অন্য কিছু।
فِىْ – মধ্যে। سَبِيْلِهٖ – তাঁর (আল্লাহর) পথে।

রাবীর (বর্ণনাকারীর) পরিচয়

হযরত আবুজর (রা) হলেন আদ্দান উপত্যকার গিফার গোত্রের লোক। এ স্থানটি মক্কা হতে সিরিয়া যাবার পথে। এজন্য তাঁকে গিফারী বলা হয়। গিফার গোত্রের লোকদের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম ছিলো বানিজ্য কাফেলাসমূহের নিরাপত্তার বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ। তাছাড়া ডাকাতি রাহাজানি ও লুটতরাজ করেও তারা জীবিকা নির্বাহ করতো। কিন্তু হযরত আবুজর (রা) শৈশব থেকেই লুটতরাজের কাজকে ঘৃণা করতেন এবং এক আল্লাহয় বিশ্বাসী ছিলেন। যখন শুনতে পেলেন মক্কায় এক লোক নবুওয়াতের দাবী করছেন এবং তৌহিদের দাওয়াত দিচ্ছেন, তখন তাঁর ভাই আনিস (রা) কে মক্কায় পাঠান ঘটনার সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য। ভাই এসে যখন বললেনঃ "আল্লাহর কসম মানুষকে তিনি মহৎ চরিত্রের দিকে আহবান করেন, আর এমন সব কথা বলেন যা কোন

কবি বা গণকের কথা বলে মনে হয় না।" একথা শুনে তিনি সামান্য একটি পুটলী নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হোন এবং হযরত আলী (রা) এর সহায়তায় ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন।

ইসলাম গ্রহণের দিক থেকে হযরত আবুজর গিফারী (রা) হলেন ৫ম মুসলমান। কেউ কেউ তাঁকে ৪র্থ মুসলমান বলেছেন। তিনি মুসলমান হয়ে নিজ গোত্রে ফিরে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। আহ্যাব বা খন্দকের যুদ্ধ শেষ হবার পর তিনি মদীনায় আসেন এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে রাসূলে কারীম (সা) এর সান্নিধ্যে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অবস্থান করেন।

হযরত আবুজর (রা) খুব সরল সোজা প্রকৃতির লোক ছিলেন। সাদাসিদা জীবন যাপন ও নির্জনতা বেশি পছন্দ করতেন। নিম্নের ঘটনাটি তাঁর সহজ সরল জীবন যাপনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একদিন এক ব্যক্তি হযরত আবুজর (রা) এর বাড়ি আসলেন এবং তাঁর ঘরের চারদিক দেখে গৃহস্থালীর কোন দ্রব্য তাঁর দৃষ্টিতে না পড়ায় জিজ্ঞেস করলেনঃ "আবুজর! আপনার মালামাল কোথায়?" উত্তরে তিনি বললেন ঃআখিরাতে আমার একটি বাড়ি আছে, আমার সমস্ত ভালো ভালো সম্পদ সেখানে পাঠিয়ে দেই।"

তিনি হিজরী ৩১ মতান্তরে ৩২ সনে রাবজার মরুভূমিতে স্বেচ্ছা নির্বাসিত জীবন যাপনের সময় ইন্তেকাল করেন। তাঁর থেকে মোট ২৮১টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে ১২ টি বুখারী-মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। ২টি বুখারী এবং ১৭টি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির গুরুত্ব

এ হাদীসে ইবাদতের দু'প্রান্তিক অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রথমটি আল্লাহ্র উপর ঈমান দ্বিতীয়টি জিহাদ। কেননা পৃথিবীতে যতো সৎকাজই করা হোক না কেন, যদি আল্লাহ্র উপর ঈমান না থাকে তবে তার কোন মূল্যই নেই। আবার ঈমানদারগণ যতো সৎকাজই করুন না কেন জিহাদের চেয়ে উত্তম কোন সৎকাজই নেই। এ দুপ্রান্ত সীমার মধ্যে যতো প্রকার আমল বা কাজ আছে তা সবই ইবাদত। ইসলামে ইবাদতের এ প্রান্তিক দিক - নির্দেশনায় হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্যাখ্যা

(ক) আল্লার উপর বিশ্বাসঃ আল্লাহর উপর ঈমান বলতে নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ের উপর ঈমান আনা বুঝায়। যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে চারটি বিষয়ের উপরই ঈমান আনবে সেই হবে পূর্ণ মুমিন। বিষয়গুলো হচ্ছে -

(১) আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস ঃ সমগ্র বিশ্ব জাহানের যে সামান্যতম অংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং এ সামান্যতম অংশেই প্রকৃতির রাজ্যে যে সুন্দর ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণ; কোথাও বিন্দুমাত্র বিশৃংখলা ও বিরোধ নেই। যেখানে কোন স্রষ্টা ছাড়া একটি সামান্য মাটির হাড়ির অথবা একটি কাঠের পিঁড়ির কথাও কল্পনা করা যায় না, আবার একজন পরিচালক ছাড়া যেখানে ছোট একটি দোকান অথবা একটি ছোট নৌকাও চলতে পারে না, সেখানে এ বিশাল বিশ্বচরাচরও কোন স্রষ্টা এবং পরিচালক ছাড়া সৃষ্টি বা পরিচালিত হতে পারে কি? এ প্রশ্নের উত্তরেই নিহিত রয়েছে স্রষ্টার অস্তিত্বের স্বীকৃতি। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ - اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ - بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ - اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ - (الطور)

"এ লোকগুলো কি সৃষ্টিকর্তা ছাড়া নিজে নিজেই অস্তিত্ব লাভ করেছে, নাকি নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা? অথবা পৃথিবী ও আকাশমন্ডলী কি এরাই সৃষ্টি করেছে? সত্যি কথা বলতে কি, এরা কোন কথায়ই প্রত্যয়ী নয়। (হে নবী) তোমার আল্লাহর রত্নাগার কি এদের মুঠোর মধ্যে, না কোন ব্যাপারে তাদের কোন হুকুম শাসন চলে?" (সূরা আত্ তুর)

অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ (اَعْرَاف)

"সাবধান! সৃষ্টি তাঁর। প্রশাসনও চলবে তাঁর।" (সূরা আল আ'রাফ)

(২) আল্লাহর গুণাবলীতে বিশ্বাস ঃ আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেয়ার সাথে সাথেই যে প্রশ্নটি আমাদের সামনে এসে হাজির হয়, সেটি হলো আল্লাহ যখন

আছেন তখন তিনি কি কি গুণ বা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী? এ ব্যাপারে মহাগ্রন্থ আল- কুরআনে আল্লাহ নিজেই নিজের গুণাবলীর সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ - (اخلاص)

"বলো, আল্লাহ এক তিনি (আল্লাহ) কারো মুখাপেক্ষী নন। বরং তার মুখাপেক্ষীই সমস্ত কিছু। না তাঁর কোন সন্তান আছে আর না তিনি কারো সন্তান। (বস্তুত) তাঁর সমতুল্যও কেউ নেই।

(সূরা ইখলাছ)

مَااتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ (ط) سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ - (المؤمنون)

" আল্লাহ কাউকে নিজের সন্তান বানাননি আর দ্বিতীয় কোন ইলাহ্ও তাঁর সাথে শরীক নেই। যদিই বা থাকতো তবে প্রত্যেক ইলাহ্ই তার সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেতো। অতঃপর একে অপরের উপর চড়াও হতো। মহান আল্লাহ পবিত্র সে সব কথাবার্তা হতে, যা লোকেরা মনগড়াভাবে বলে।" (সূরা আল মুমিনুন)

অন্যত্র আরো ব্যাপক আকারে তাঁর গুণের পরিচয় দেয়া হয়েছে-

هُوَاللّٰهُ الَّذِىْ لَااِلٰهَ اِلَّاهُوَ (ج) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (ج) هُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ – هُوَاللّٰهُ الَّذِىْ لَااِلٰهَ اِلَّاهُوَ (ج) اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّار الْمُتَكَبِّرُ (ط) سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ - هُوَاللّٰهُ الْخَالِقُ

الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (ج) وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ - (الحشر)

"তিনি আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনিই প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য সকল জ্ঞানের আধার। তিনি রহমান ও রাহীম। তিনি আল্লাহ যিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি মালিক - বাদশাহ্। পবিত্রতম সত্তা, পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা। রক্ষণাবেক্ষণকারী পরিদর্শক, মহাপরাক্রমশালী, নিজের বিধান প্রতিষ্ঠায় কঠোর ও স্বয়ং বড়ত্ব গ্রহণকারী। আল্লাহ মহান পবিত্র সেই শিরক থেকে যা লোকেরা করছে। তিনিই তো আল্লাহ্ যিনি (সমগ্র) সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী এবং তার বাস্তবায়নকারী। আর সে অনুপাতে আকার আকৃতি রচনাকারী। তাঁর (জন্য) উত্তম নাম সমূহ বিদ্যমান। আসমান জমিনের প্রতিটি বস্তুই তাঁর তাসবীহ্ করে। তিনি মহা পরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ বিজ্ঞানী।" (সূরা-আল হাশর)

(৩) আল্লাহর ক্ষমতায় বিশ্বাসঃ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন অসীম ও নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক। তিনি পৃথিবী সহ সমগ্র সৃষ্টি রাজ্যের স্রষ্টা। তিনি সকল সৃষ্টির প্রতিপালনকারী, জীবন ও মৃত্যুর একমাত্র মালিক। তিনি যাকে চান ইজ্জত সম্মান, রাজত্ব ইত্যাদি দিয়ে থাকেন আবার যার কাছ হতে (তিনি) চান রাজত্ব ছিনিয়ে নেন এবং ইজ্জত- সম্মান ভূলুণ্ঠিত করে দেন। আল্লাহ্ প্রতিটি সৃষ্টির অন্তর রাজ্যে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে খবরও রাখেন। সত্যি কথা বলতে কি আল্লাহর ক্ষমতার কথা লিখে শেষ করা যাবে না।

নিম্নের আয়াত কটি হতে সামান্য ধারণা পাওয়া যেতে পারে মাত্র।

مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ (ط) مَايَكُوْنُ مِنْ نَجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَاكَانُوْا (ج) ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ (ط) اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ -

(المجادلة)

"আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুর (একচ্ছত্র) মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্। এমন কখনো হয় না যে, তিনজন লোক কোন পরামর্শ করবে আর আল্লাহ চতুর্থ হবেন না। কিংবা পাঁচজনে গোপন আলাপ করবে আল্লাহ ষষ্ঠ হবেন না। গোপন পরামর্শকারীরা এর কম হোক অথবা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে থাকবেন। অতঃপর কিয়ামতের দিন জানিয়ে দিবেন তারা কোথায় কি করেছে। কেননা আল্লাহ্ তো প্রতিটি বস্তু সম্পর্কেই অসীম জ্ঞানের অধিকারী।"

(সূরা মুজাদিলা)

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَايَعْلَمُهَا اِلَّاهُوَا (ط) وَيَعْلَمُ مَافِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (ط) وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ-

(انعام-٥٩)

"তাঁর (আল্লাহ্র) নিকট সমস্ত অদৃশ্য লোকের চাবিকাঠি। তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানেন না। এবং তিনি আরও জানেন পানিতে বা স্থলে কোথায় কি আছে। তিনি জানেন না এমনভাবে কোন বৃক্ষের একটি পাতাও বৃন্তচ্যুত হয় না। জমিনে অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্দার আড়ালে এমন একটি দানাও নেই যা তাঁর জানার বাইরে। ভিজা অথবা শুষ্ক যা ই হোক না কেন সমস্তই এক উম্মুক্ত কিতাবে লিপিবদ্ধ।"

(সূরা আনয়ামঃ ৫৯)

يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا (لا) وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ (ط) —

"যিনি রাতকে দিনের উপর বিস্তার করে দেন। অতঃপর দিন রাতের পিছনে দৌড়াতে থাকে। যিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারকাসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং সবকিছুই তাঁর আইনে বন্দী।" (আল- আ'রাফ)

(৪) আল্লাহর হুকুম আহকামে বিশ্বাসঃ আল্লাহ যেমন প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন তেমনিভাবে প্রতিটি বস্তুর জন্যই কিছু বিধি বিধানও দিয়েছেন। আর এ বিধি- বিধান শুধুমাত্র মানুষ এবং জ্বিন ছাড়া আর সবাইকে মেনে চলতে বাধ্য করেছেন কিন্তু মানুষ এবং জ্বিনকে বাধ্য করা হয়নি। তবে তাদেরকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি এবং বিচারশক্তি দিয়েছেন। যেনো তারা চিন্তা ভাবনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী চলতে পারে। আর এ সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা অর্পণের মাধ্যমেই আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করতে চান। মানুষ যেন পথ ভুলে অমাবস্যার অন্ধকারে দিকভ্রান্ত নাবিক অথবা রাতের আধারে পথহারা মরুচারীর মতো বিভ্রান্ত না হয়। সেজন্য মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টির প্রথম থেকে সঠিক দিক-নির্দেশনার ঐশীক গ্রন্থ পাঠিয়েছেন এবং তাঁর সঠিক ব্যাখ্যাতা হিসেবে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। সে ধারাবাহিকতা শেষ হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) এর নবুয়্যতের মাধ্যমে। মানুষের ব্যক্তি জীবন হতে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সমস্ত সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে আল-কারআন ও হাদীসের মাধ্যমে। মানুষ কিভাবে ঘুমাবে, চলাফেরা করবে, ব্যবসা-বাণিজ্য করবে, লেন-দেন করবে, বিয়ে-সাদী করবে, কিভাবে পিতামাতার হক, আত্মীয় স্বজনের হক, ছেলেমেয়ের হক, বন্ধু-বান্ধবের হক আদায় করবে, কিভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম পরিচালনা করবে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়েই মহান আল্লাহ সমাধান ও পথ নির্দেশ দিয়েছেন। এ সমস্ত আইনের শুধুমাত্র মৌখিক স্বীকৃতি দিলেই হবে না বরং সমস্ত আইন-কানুন বাস্তবে কার্যকর করাই হলো আল্লাহর হুকুম আহকামের প্রতি ঈমানের তাৎপর্য।

যারা মৌখিক স্বীকৃতি দিয়েই খালাস, তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্র বাণীঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ –

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারা কাফের।" (সূরা আল মায়েদা)

(খ) আল্লাহর পথে জিহাদঃ "জিহাদ" শব্দটির মূল হচ্ছে ।
এটাকে দুভাবে পড়া যায় এবং কুরআন মজীদেও দু'ভাবে এর ব্যবহার হয়েছে। যথা "যুহদ" ও "যাহ্দা"। এই শব্দ দুটোর অর্থ হচ্ছে, ব্যাপক চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও কঠোর শ্রম"।

সুরা মায়েদার ৫৩ নং আয়াতাংশে বলা হয়েছে- -

اَهٰؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ (ط) اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ(ط)

"এরা কি সে সব লোক? যারা আল্লাহর নামে কসম করে এ বিশ্বাস জন্মাতে চেষ্টা করতো যে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি।" -

الَّذِيْنَ لَايَجِدُوْنَ اِلَّاجُهْدَ هُمْ -

"এবং যারা নিজেদের শ্রম মেহনত ছাড়া কোন সামর্থ রাখে না।"

আল জিহাদ শব্দের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আল্লামা বদরউদ্দীন আইনী (রা) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ উমদাতুল ক্বারীতে বলেনঃ

"জিহাদের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে চেষ্টা প্রচেষ্টা করা, কষ্ট স্বীকার করা। শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ অর্থ হচ্ছে খোদার কালেমার বিজয় ও প্রতিষ্ঠাকল্পে কাফের নিধনের পূর্ণ চেষ্টা করা এবং কষ্ট ক্লেশ স্বীকার করা। এবং আল্লাহর ব্যাপারে জিহাদ হচ্ছে নফসকে কাজে বাধ্য করার জন্য এবং শরীয়তের পথের অনুগামী বানাবার জন্য আর কামনা-বাসনা, স্বাদ-আস্বাদনও পাশবিকতার প্রবল আকর্ষণ হতে নফসকে ফেরানো। নফসকে এ সবের বিরোধী বানিয়ে দেয়ার জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যয়ে প্রচেষ্টা করা।"

(উমদাতুল কারী ১৪ খন্ড পৃঃ ৭৮)

জিহাদ শব্দটি আল-কুরআনের একটি নিজস্ব পরিভাষা। আর এ পরিভাষাটি যেখানেই ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেই "ফি সাবলিল্লাহি" বা আল্লাহর পথে কথাটির উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ জিহাদ হবে একমাত্র আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য এবং আল্লাহ প্রদত্ত নিয়মনীতির ভিতরে। জিহাদ আবার তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। যথা-

(১) নফসের সাথে জিহাদঃ ঈমানদার ব্যক্তির প্রথম ও প্রধান জিহাদ হচ্ছে নিজের নফস বা কুপ্রবৃত্তির সাথে। কেননা নফসই মানুষকে বিভিন্ন অপকর্ম সম্পাদনের উৎসাহ ও প্রলোভন দেয়। তাই নফসের এহেন প্রলোভনের হাত হতে বাঁচাকে কুরআনে "হিজরত" বলা হয়েছে। আর এ হিজরতকারীকে বলা হয়েছে

আল "মুহাজির"।
নবী করীম (সা) বলেছেনঃ

اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَانَهَى اللّٰهُ عَنْهُ –

প্রকৃত মুজাহির হচ্ছে সে, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ যাবতীয় কাজ ও বিষয় পরিত্যাগ করেছে।"
আল-কুরআনে বলা হয়েছে--

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا –

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে হিজরত (অপকর্ম পরিহার ও প্রয়োজনে দেশ ত্যাগ) করেছে ও জিহাদ করেছে।"
এটা হচ্ছে জিহাদের প্রথম ধাপ বা স্তর। এ স্তর অতিক্রম না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তিই দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হতে পারে না।

(২) শয়তানী আধিপত্যকে উৎখাত করে, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদঃ
যেখানে আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত নেই অথবা আংশিক প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানে শয়তানের আধিপত্য ও মানুষের সার্বভৌমত্ব কায়েম হয়। শয়তানী আধিপত্যকে নস্যাত করে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা প্রতিটি ঈমানদারের জন্য অপরিহার্য। কেননা আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠিত না থাকলে সেখানে পূর্ণ মুসলমান হিসেবে বসবাস করা অসম্ভব। তাই জান এবং মাল দিয়ে আল্লহর দ্বীনকে বিজয়ী এবং প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জিহাদ করতে হবে। আর এ কাজ করতে গিয়ে কারো তিরস্কার অথবা নির্যতনের পরওয়া করা যাবেনা।
আল্লাহ বলেনঃ -

يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ –

"তারা কোন উৎপীড়কের উৎপীড়নকে একবিন্দু ভয় না করে দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে।" (সূরা আল মায়েদা)
নবী করীম (সা) আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন যে, --

جَاهِدُوْا النَّاسَ فِى اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيْدَ وَلاَ تَبَالُّوْا فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ – وَاَقِيْمُ حُدُوْدَ اللّٰهِ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِّنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ عَظِيْمٌ يُنْجِىْ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بِهٖ مِنَ الغَمِّ وَالْهَمِّ (مسند، الحمد، بيهقى)

"তোমরা সকলে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিকটবর্তী ও দূরবর্তী লোকদের সাথে জিহাদ করো। আর আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কোন নিন্দুক বা উৎপীড়কের উৎপীড়নকে ভয় করো না। বরং তোমরা দেশে-বিদেশে যেখানেই থাকো না কেন আল্লহর আইন ও দণ্ড বিধানকে কার্যকরী করে তোল। তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। কেননা জিহাদ হচ্ছে জান্নাতের অসংখ্য দরজার জধ্যে একটি অতি বড়ো দরজা। এর সাহায্যেই আল্লাহ্ (জিহাদকারী লোকদেরকে) সকল প্রকার চিন্তা-ভাবনা ও ভয়ভীতি হতে নাজাত দিবেন।"
(মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী)

আল্লাহ্‌র দ্বীন পরিপূর্ণভাবে কায়েম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। ইরশাদ হচ্ছেঃ-

وَقَاتِلُوْاهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّه لِلّٰهِ -
(انفال : ٥٠)

তুমি তাদের সাথে লড়াই করে যাও, যতক্ষন না ফেৎনা বিদূরিত হয়ে যায়, এবং দ্বীন সর্বতোভাবে আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে যায়। (সূরা আনফালঃ ৫০)

(৩) ইসলাম ও মুসলমানদের উপর হস্তক্ষেপকারীদের সাথে জিহাদঃ যদি মুসলমানদের উপর কোন বিধর্মী সম্প্রদায় আক্রমণ করে অথবা ইসলামী বিধি-বিধানের বিরোধিতা করে অথবা ইসলামী বিধান জারীর ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তবে তাদের সাথে সশস্ত্রভাবে জিহাদ করতে হবে। আর এ তৃতীয় পর্যায়ে জিহাদকে কুরআন মজীদে কিতাল বলেও অভিহিত করা হয়েছে। বস্তুতঃ জিহাদ

হচ্ছে ব্যাপক অর্থবোধক একটি পরিভাষা। জিহাদ সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা পেশ করা হলো। -

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ -

"যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে তাগুদের পথে।"-

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ (ط) -

"হে নবী! মোনাফেক এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো এবং তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করো।"
------- (সূরা তওবা)

فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْيَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا -

"আল্লাহ্র পথে লড়াই করা উচিত সে সব লোকেরই যারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে দেয়। যারা আল্লাহ্র পথে লাড়াই করবে এবং নিহত হবে অথবা বিজয়ী হবে তাদেরকে আমরা অবশ্যই বিরাট প্রতিদান দিবো।" (সূরা নিসা)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ - تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ (ط) ذَالِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ - اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -
(صف)

"হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসার কথা বলবো, যা তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক আজাব হতে রক্ষা করবে? (আর তা হচ্ছে) তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। এটাই তোমাদের জন্য অতীব উত্তম যদি তোমরা বুঝো।" (সূরা আছছফ)

একদা কোন এক ব্যক্তি এসে রাসূলে কারীম (সা) এর নিকট আরজ করলোঃ আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা (হবে) জিহাদের সমতুল্য। প্রতি উত্তরে নবী করীম (সা) ইরশাদ করলেনঃ

لاَ اَجِدُهُ - هَلْ تَسْتَطِيْعُ اِذَاخَرَجَ الْمُجَاهِدُوْنَ اَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُوْمَ وَلاَتَفْتُرِ وَتَصُوْمَ وَلاَ تُفْطِرَ قَالَ مَنْ تَسْتَطِيْعُ ذَالِكَ - (بخارى)

"না, জিহাদের সমতূল্য কোন আমল নেই। তবে মুজাহিদগণ যখন আল্লাহর পথে জিহাদে নেমে পড়ে তখন হতে যদি তুমি মসজিদে পবেশ করে বিরতিহীনভাবে নামায পড়তে থাকো এবং বিরতিহীনভাবে একাধিক্রমে রোযা রাখতে পারো তবে তা জিহাদের সমতূল্য হতে পারে। এ কথা শুনে লোকটি বললোঃ কোন ব্যক্তিই এমন করতে সক্ষম নয়।" (বুখারী)

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? উত্তরে নবী কারীম (সা) বললেনঃ

مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - (بخارى، مسلم)

"সেই মুমিন ব্যক্তি, যে নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে।" (বুখারী, মুসলিম)

শিক্ষাবলী

(১) তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

(২) আল্লহ্র বিধান ছাড়া অন্য কারো বিধান বা মতাদর্শের অনুসরণ করা যাবে না।

(৩) নিজের মধ্যে যতটুকু মোনাফেকী আচরণ আছে তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে।

(৪) কথা ও কাজে পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

(৫) পূর্ণ শক্তিও সামর্থ দিয়ে আল্লহ্র দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করতে হবে।

(৬) দ্বীন প্রতিষ্টিত হওয়ার পর তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য প্রয়োজনে সশস্ত্র জিহাদ করতে হবে।

(৭) জিহাদের চেয়ে উত্তম কোন ইবাদাত নেই।

ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرْبَعٌ مَنْ اُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ اُعْطِىَ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ قَلْبٌ شَاكِرٌ وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ وَزَوْجَةٌ الَّا تُبْغِيْهِ خَوْنًا فِىْ نَفْسِهَا وَلَامَالِهٖ - (بيهقى-شعب الايمان)

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তিকে চারটি নেয়মত দান করা হয়েছে তাকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ দান করা হয়েছে। (১) কৃতজ্ঞ হৃদয় (২) জিকিরে রত রসনা (জিহবা)। (৩) বিপদে ধৈর্যশীল শরীর ও (৪) নিজের ব্যাপারে ও স্বামীর ধন সম্পদে খেয়ানত না করতে সংকল্পবদ্ধা নারী।

(বাইহাকী,-শোয়াবুল ঈমান, মিশকাত)

শব্দার্থ

رَبَعٌ –চার। مَنْ –যে (ব্যক্তি)। اُعْطِىْ هُنَّ – সেগুলি দেয়া হয়েছে। فَ – অতঃপর। قَدْ اُعْطِىَ – তাকে দেয়া হয়েছে। خَيْرُ الدُّنْيَا –দুনিয়ার কল্যাণ। وَ – এবং। اَلْاٰخِرَةُ – পরকাল। شَاكِرٌ –শুকরকারী/কৃতজ্ঞ। لِسَانٌ –জিহবা। ذَاكِرٌ – স্মরণকারী। بَدَنٌ –শরীর। اَلْبَلَاءُ – বিপদাপদ। صَابِرٌ – ধৈর্যশীল। زَوْجَةٌ – স্ত্রী। نَفْسِهَا – তার (স্ত্রী) নিজের। لَامَالِهٖ – না তার মালের।

রাবীর (বর্ণনাকারীর) পরিচয়

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) এর জন্ম নবী করীম (সা) এর মদীনা হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে। তিনি রাসূলে করীম (সা) এর এর চাচা আব্বাস ইবনে মোত্তালিবের পুত্র। নবী করীম (সা)-এর ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিলো মাত্র তের বৎসর। দশ বৎসর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন কণ্ঠস্থ। করেন যদিও তিনি সর্ব কনিষ্ঠ একজন সাহাবী ছিলেন বিধায় রাসূলে করীম (সা) সাহচর্য বেশিদিন লাভ করতে পারেননি তবুও অত্যন্ত মেধা ও প্রচেষ্টার বলে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ আলেম হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বিভিন্ন সাহাবা কেরামের নিকট গিয়ে দীনের বিভিন্ন বিয়য়ে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তাঁর কুরআনী জ্ঞানের সাক্ষ্য স্বরূপ হযরত ইবনে উমর (রা) বলেনঃ "কুরআনের শানে-নযূল সম্বন্ধে ইবনে আব্বাস ছিলেন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।" এজন্যই তাফসীর সংক্রান্ত এতো হাদীস আর কোন সাহাবী বর্ণনা করতে পরেননি। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেনঃ

"আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস হলেন আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার (মোফাচ্ছের)।" তিনি যেমন ছিলেন মোফাচ্ছিরে কুরআন তেমনি আবার শাইখুল হাদীস। এমনকি বড়ো বড়ো সাহাবী পর্যন্ত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

হিজরী ৬৮ সনে ৭১ বৎসর বয়সে তায়েফ নগরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ১৬৬০টি। সম্মিলিত ভাবে ইমাম বুখারী ও মুসলিম মোট ৯৫টি এবং একক ভাবে ইমাম বুখারী ১২০টি এবং ইমাম মুসলিম ৪৯টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে অধিকাংশ হাদীস হচ্ছে আল-কুরআনের তাফসীর সংক্রান্ত।

হাদীসটির গুরুত্ব

পৃথিবীতে মানুষকে আল্লাহ্ যতোই দেন আর মানুষের অতৃপ্ত আত্মা ততোই অধিক পাবার মানসে সর্বদা ব্যাকুল থাকে। এই যে আত্মার ব্যাকুলতা বা লাগামহীনতা এটাকে পৃথিবীর কোন শক্তিই রুখতে পারে না। শুধু মাত্র খোদাভীতি, আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ হৃদয়-ই এনে দিতে পারে মানসিক প্রশান্তি, প্রকৃত সুখ। তাছাড়া বান্দা কিভাবে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করবে বা একজন

খোদা প্রেমিকের কি বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকা দরকার অত্র হাদীসে তা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্যাখ্যা

(১) মানুষ প্রকৃত তৃপ্তি বা শান্তি পেতে পারে না যতক্ষণ না তার মধ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাবে। মানুষ যখন কৃতজ্ঞ বা শোকর গুজারী বান্দাহ্ হয়ে যায় তখন তার সমস্ত মানসিক অস্থিরতা দূর হয়ে হৃদয় মন প্রশান্তিতে ভরে যায়। আর আল্লাহ্-রাব্বুল আলামীনও তাঁর নেয়ামতসমূহ বাড়িয়ে দেন।

আল্লাহ বলেনঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ –

"তোমরা যদি আমার নেয়ামতের শোকর করো তবে তোমাদের নেয়ামতকে আরো বাড়িয়ে দেবো। আর যদি আমার নেয়ামতের কুফুরী করো তবে জেনে রাখ নিঃসন্দেহে আমার আজাব বড়ো কঠোর।" (সূরা ইব্রাহীম)

(২) জিকির শব্দের অর্থ স্মরণ। এ স্মরণ দু'ভাবে হতে পারে। যেমন (ক) জিকরুল লিছান (খ) জিকিরুল ক্কালব।

জিকরুল লিছান হচ্ছে মৌখিক জিকির অর্থাৎ সর্বদা আল্লাহ্র বিভিন্ন নামসমূহ হ'তে যে কোন নামের স্মরণ অথবা কুরআন তিলাওয়াত। তাসবীহ্-তাহ্লীল, দু'আ-দরুদ ইত্যাদি। এটা হচ্ছে জিকিরের প্রথম স্তর। দ্বিতীয় হচ্ছে জিকরুল ক্কালব অর্থাৎ সর্বদা আল্লাহ্র ভয় অন্তকরণে চিরজাগ্রত করা। এবং আল্লাহ্র মর্জি মোতাবেক চলার জন্য মনকে গড়ে তোলা। এমন এক পর্যায়ে মনকে নেয়া যেখানে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া মন অন্য কোন কাজেরই আগ্রহ প্রকাশ করবে না। এমনকি অবচেতন মন পর্যন্ত নিজের অজান্তেই আল্লাহর নাফরমানীমূলক কোন কাজের সাথে বিদ্রোহ করে বসবে। আর সকল কাজের পূর্বেই মন চিন্তা করতে বাধ্য করাবে যে, কাজটি আল্লাহ্র মর্জি মোতাবেক হচ্ছে কিনা; কোন নাফরমানী তো হচ্ছে না? ইত্যাদি। জিকিরের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেনঃ

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ –

"সাবধান! একমাত্র আল্লাহর জিকিরেই (হচ্ছে) আত্মার প্রশান্তি।"
(৩) বিপদে ধৈর্য্যধারন করা এবং স্থিরচিত্তে চিন্তা-ভাবনা করে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া এটা সব চেয়ে বেশি কঠিন কাজ। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেনঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِيْنَ

"তোমরা নামায এবং ধৈর্য্যের বিনিময়ে আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো। তবে শুধুমাত্র খোদাভীরু লোকদের ছাড়া অন্যদের জন্য এটা খুব কঠিন (একটি) কাজ।"
মানুষকে চঞ্চল প্রকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই মানুষ কোন বিপদ আপদের মুহূর্তে স্থিরচিত্তে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়। এভাবে ভুল সিদ্ধান্তের কারণে পরে অনুতাপের আগুণে দগ্ধ হতে না হয় তাই মহান আল্লাহ্ ধৈর্য্যের এতো গুরুত্ব দিয়েছেন। বস্তুত ধৈর্য্য মুমিনের একটি বিশেষ গুণ।
(৪) পৃথিবীতে আল্লাহ্ প্রদত্ত যতো নিয়ামত আছে তার মধ্যে সর্বোত্তম নিয়ামত হচ্ছে সতী এবং স্বামী পরায়ণা স্ত্রী। কেননা এ স্ত্রীর বদৌলতে যেমন পৃথিবীতে স্বর্গ সুখ অনুভব করা যায়, তেমনি আবার এ স্ত্রীর আচরণেই জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে এবং পৃথিবীটাকে জাহান্নামের একটি গহ্বর সদৃশ মনে হয়। তা সরওয়ায়ে কায়েনাত রাসূলে খোদা (সা) বলেছেনঃ
"পৃথিবীতে সেই (বেশি) ভাগ্যবান যার ঘরে সতী সাধ্বী স্ত্রী আছে।"
আলোচ্য হাদীসে স্ত্রী লোকেরা নিজের ব্যাপারে খেয়ানত না করা বলতে নিজের সতীত্বের হেফাজতের কথা বলা হয়েছে।

শিক্ষাবলী

(১) আল্লাহ্ যখন যে অবস্থায়ই রাখুক না কেন সর্বদা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।
(২) আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো মুখাপেক্ষী হওয়া যাবে না।
(৩) বিপদাপদ, জুলুম নির্যাতন, রোগ-শোক সর্বাবস্থায়ই ধৈর্য্য অবলম্বন করতে হবে।
(৪) আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ বিপদাপন্ন অবস্থা দূর করতে পারে এ বিশ্বাস না করা এবং এ ব্যাপারে আর কারো সাহায্য প্রার্থী না হওয়া।
(৫) সর্বদা আল্লাহ্র জিকিরে রত থাকা।
(৬) স্ত্রীকে দ্বীনি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আদর্শ স্ত্রী রূপে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করা।
(৭) দ্বীনদার দেখে পাত্রী নির্বাচন করা।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ না করার পরিণাম

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِيْ حُدُوْدِاللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا مَثَلُ قَوْمٍ اِسْتَهَمُوْا سَفِيْنَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِيْ اَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِيْ اَعْلاَهَا فَكَانَ الَّذِيْ فِيْ اَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِيْنَ فِيْ اَعْلاَهَا فَتَأَذُّوْا بِهٖ فَاَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ اَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ فَاَتَوْهُ فَقَالُوْا مَالَكَ قَالَ تَاَذَّيْتُمْ بِيْ وَلاَ بُدَّ لِيْ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ اَخَذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ اَنْجَوْهُ وَنَجُّوْا اَنْفُسَهُمْ وَاِنْ تَرَكُوْهُ اَهْلَكُوْهُ وَاَهْلَكُوْا اَنْفُسَهُمْ - (بخارى)

"হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা) নবী করীম (সা) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেনঃ আল্লাহ্ যে সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার ব্যপরে শিথিলতা প্রদর্শনকারীদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন, কোন এক জলযানে একদল আরোহী লটারীর মাধ্যমে নিজেদের স্থান নির্বাচন করেছেন। কিছু জলযানের উপরতলার আরোহী এবং কিছু জলযানের নিচ তলার আরোহী। নিচ তলার আরোহীগণ পানির জন্য উপতলায় যাতায়াত করতে লাগলো। এতে উপর তলার আরোহীগণ বিরক্ত বোধ করে তাদেরকে বাধা দিলো। তখন নিচ তলার আরোহীদের মধ্য থেকে একজন একটি কুঠার নিয়ে জাহাজের তলদেশ ছিদ্র করতে লাগলো। তখন উপরের

আরোহীগণ এসে জিজ্ঞেস করলোঃ তুমি এটা কি করছো? জবাবে লোকটি বললোঃ তোমরা আমাদের উপরে যাতায়াতকে ভালো মনে করো না, তাই পানি পাওয়ার জন্য এ ব্যবস্থা করছি। এ অবস্থায় যদি সকলে মিলে লোকটাকে বিরত রাখে তবে লোকটা এবং জাহাজ ডুবে যাওয়ার হাত হতে রক্ষা পেলো, সাথে অন্যরাও। আর যদি বাধা না দেয় তবে লোকটিও ধ্বংস হলো এবং সকল আরোহীও ধ্বংস হয়ে গেলো" (বুখারী)

শব্দার্থ

اَلْمُدْهِنُ – ধর্মীয় ব্যাপারে শিথীলকারী। فِىْ حُدُوْدِ اللهِ –আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা। اَلْوَاقِعُ فِيْهَا – যা নির্দিষ্ট করেছেন। مَثَلُ – দৃষ্টান্ত। قَوْمٌ – জাতী, সম্প্রদায়, দল। اِسْتَهَمُوْا – লটারী করলো। سَفِيْنَةٌ –নৌকা, জলযান, জাহাজ। فَصَارَ – অতঃপর অবস্থান নিলো। بَعْضُهُمْ – তাদের মধ্যে কিছু। اَسْفَلَهَا –তার (জাহাজের) নিচে। اَعْلاَهَا – তার উপর। يَمُرُّ – যাতায়াত। بِالْمَاءِ – পানির জন্য। فَتَاَذَّوْا بِهِ – এতে তারা বিরক্ত হলো। اَخَذَ – নিলো। فَاْسًا –কুঠার/ কুড়াল। يَنْقُرُ – ছিদ্র করতে লাগলো। مَالَكَ – কি করছো? تَاَذَّيْتُمْ – তোমরা কষ্ট পাও। لاَبُدَّ – অতি প্রয়োজন। نَجَوْا – মুক্তি পেলো। اِنْ –. যদি। تَرَكُوْهُ – তাকে ছেড়ে দেয়। اَهْلَكُوْا – তারা ধ্বংস হয়ে গেলো।

বর্ণনাকারীর (রাবীর) পরিচয়

নুমান ইবনে বশীর (রা) মদীনার খাযরাজ বংশের লোক। তাঁর পিতা বশীর (রা) ইবনে সা'দ ছিলেন আনসার সাহাবী। হযরত নুমান (রা) হুজুরে পাক (সা) এর ইন্তেকালের ৬/৮ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতাসহ অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবীগণ ছিলেন তাঁর উস্তাদ। আমীর মোয়াবিয়া (রা) তাকে প্রথমে কুফা ও পরে হিমসের গর্ভনর নিযুক্ত করেন। ইয়াজিদের মৃত্যুর পর তিনি

সিরিয়াবাসীদেরকে আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের এর খিলাফত স্বীকার করে নিতে আহবান জানালে হিমসবাসীরা তাকে হিজরী ৬৪৫ সনে শহীদ করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ১২৪টি।

হাদীসটির গুরুত্ব

আল্লাহ প্রদত্ত সীমা লংঘনকারী ব্যক্তি অথবা সমাজ বা রাষ্ট্র কতো ভয়াবহতার দিকে যেতে পারে তার রূপক দৃষ্টান্ত হচ্ছে নবী কারীম (সা) এর এ বাণীটি। সমাজ বা রাষ্ট্র যখন অন্যায়, জুলুম নির্যাতনে গ্রেফতার হয়ে যায় এবং সাধারণ জনগণ যখন তার ন্যায্য অধিকারটুকু হারিয়ে ফেলে তখন সমাজের বিবেকবান মানুষের দায়িত্ব কতটুকু এবং কিভাবে তা সম্পাদন করতে হবে তার দিক নির্দেশকারী নবী কারীম (সা) এর এ হাদীসটি।

তাই এ কথা নির্দিধায় বলা যায় যে, এ হাদীসটির গুরুত্ব চিরন্তনী।

ব্যাখ্যা

এটি একটি রূপক হাদীস। এখানে লটারী বলতে মানুষের তাকদীর বুঝানো হয়েছে। জলযান বা জাহাজ বলতে রাষ্ট্র বা সমাজের কথা বলা হয়েছে। রাষ্ট্রের বা সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং সমাজের নিরীহ, নির্যাতিত, নিস্পেষিত মানুষকে যথাক্রমে উপর তলার ও নিচ তলার আরোহী বলে বুঝানো হয়েছে। আর পানি দ্বারা বুঝানো হয়েছে, মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ।

কেননা সর্বদা আওয়াম বা জনসাধারণ সমাজের বা রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের নিকট তাদের মৌলিক প্রয়োজন অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির মুখাপেক্ষী। আর এ সমস্ত সমস্যার সমাধানের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা বা আইন এবং সৎ প্রশাসকের মাধ্যমে তার বাস্তব রূপায়ন।

একমাত্র আল্লাহর নির্দেশিত এবং রাসূল (সা) এর দেখানো পথেই সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের অধিকার আদায় করা সম্ভব। অন্যথায় বিপর্যয় অনিবার্য। কারণ আওয়াম নিজেদের চাহিদা পুরণের জন্য বিভিন্ন প্রকার ঘৃণ্য ও অনৈতিক পথ অবলম্বন করে, ফলে নীতিহীনতা ও অবক্ষয় জাতিকে কুড়ে কুড়ে খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়। আবার সমাজ বা রাষ্ট্রের পরিচালনার ভার যাদের হস্তে ন্যাস্ত তারাও যদি অসৎ এবং খোদা বিমুখ হয় তবে সমাজের সাধারণ মানুষ যতো ভালো

চরিত্রের অধিকারীই হোক না কেন তবুও রাষ্ট্র কখনো কল্যাণের মুখ দেখবে না। এ অবস্থায় প্রতিটি বিবেকবান মানুষের কর্তব্য অন্যায়কারীদের কালো হাত ভেঙ্গে দিয়ে সৎ লোকদের ক্ষমতায় সমাসীন করা। যদি তা করা না হয় তবে সমাজের প্রতিটি মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। কেননা জাহাজ যদি অথৈ পানিতে ডুবে যায় তবে কোন আরোহী যেমন একাকী বাঁচতে পারে না। তেমনিভাবে রাষ্ট্র যদি ধ্বংসের দিকে যায় তবে ঐ রাষ্ট্রের সার্বিক পরিবর্তন ছাড়া কোন ব্যক্তি বা সমাজই কল্যাণ পেতে পারে না।

নবী করীম (সা) অতীতের কোন এক জাতির ধ্বংসের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন- "একবার আল্লাহ্ জাল্লা জাল্লালুহু জিব্রাইল (আ) কে বললেনঃ হে জিব্রাইল! অমুক শহর উল্টিয়ে দাও। প্রতিউত্তরে জিব্রাইল (আ) বললেনঃ

يَا رَبِّ اِنَّ فِيْهِمْ عَبْدَكَ فُلاَنًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ -

"হে প্রতিপালক! সেখানে তোমার এমন এক বান্দাহ্ আছে যে চোখের একটি পলকের সময় পরিমানও তোমার নাফরমানী করেনি।" আল্লাহ বললেনঃ তাকে সহ্ উল্টিয়ে দাও। কেননা সে একটি বারও এ ধ্বংসোম্মুখ জাতির কথা চিন্তা করেনি বা জাতিকে বাঁচানোর কোন পেরেশানী তার মধ্যে ছিলো না।"

বস্তুত এ ভয়াবহ পরিণতি হতে বাঁচার একমাত্র পথ হচ্ছে সৎকাজের প্রতিষ্ঠা ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ।

শিক্ষাবলী

(১) সৎ কাজের আদেশ দিতে হবে অর্থ্যাৎ সৎ কাজের প্রতিষ্ঠাকল্পে চেষ্টা করা অপরিহার্য।

(২) অসৎ কাজের মূলোৎপাটন করে সমাজকে পতনের হাত হতে রক্ষা করতে হবে।

(৩) সমাজের যে কোন স্তরের লোকের বিরুদ্ধেই হোক না কেন কোন ভয় না করে প্রয়োজনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও একাজ অব্যাহত রাখতে হবে।

(৪) সমাজ বা রাষ্ট্রের সংশোধনের চিন্তা বাদ দিয়ে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা করলে পরকালে সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهٖ وَمَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهٗ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاٰثِرُوْا مَايَبْقٰى عَلٰى مَايَفْنٰى ـ (مشكوة)

"আবু মুসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রেমে ডুববে সে তার আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে ভালবাসবে সে তার দুনিয়ার জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতএব হে মানুষ! তোমরা স্থায়ী জীবনকে অস্থায়ী জীবনের উপর প্রাধান্য দাও।" (মিশকাত)

শব্দার্থ

مَنْ – যে ব্যক্তি। اَحَبَّ – ভালোবাসলো। دُنْيَاهُ – তার দুনিয়াকে। اَضَرَّ – ক্ষতিগ্রস্ত করলো। بِاٰخِرَتِهٖ – তার আখেরাতকে। اٰثِرُوْا – গুরুত্ব দাও। مَا – যা। يَبْقٰى – অবিনশ্বর/চিরস্থায়ী। عَلٰى – উপর। يَفْنٰى – নশ্বর/ক্ষণস্থায়ী।

বর্ণনাকারীর (রাবীর) পরিচয়

প্রকৃত নাম আব্দুল্লাহ্। আবু মূসা তাঁর উপনাম। ইয়েমেনের আল-আশায়ার গোত্রের সন্তান ছিলেন বলে তিনি আল-আশয়ারী বলে পরিচিত। পিতার নাম কায়েস এবং মায়ের নাম তাইয়্যেবা। ইসলামের দাওয়াত পাওয়া মাত্রই তিনি ইয়েমেন থেকে মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর হাতে ইসলাম কবুল করেন। তিনি ছিলেন তাঁর গোত্রের প্রভাবশালী নওজোয়ান এক নেতা। শৈশব হতেই সৎ ও সত্যবাদীতা ছিলো তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য। ইসলাম পূর্ব সময়ে তিনি সর্বদা গোত্রের সবার কল্যাণ কামনা করতেন এবং ইসলাম গ্রহণের পর জীবনের শেষ

মুহূর্ত পর্যন্ত উম্মতে মুসলিমার মঙ্গল কামনা করেছেন। ধোকা অথবা বাহানা কি জিনিস তা তিনি কল্পনাও করতে পারতেন না। তিনি অত্যন্ত সহজ সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন।

আজীবন জ্ঞান সাধনা করাই ছিলো তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। শুধু মাত্র তিনি জেনেই ক্ষ্যান্ত হননি, অপরকে জানানো তিনি অবশ্য কর্তব্য বা ফরজ মনে করতেন। তাছাড়া ইলমের সাথে আমলের পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিলো তার জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা) বলেছেনঃ "মাথা হতে পা পর্যন্ত আবু মূসা ইলমের রঙ্গে রঞ্জিত।" হুজুরে পাক (সা) এর জীবদ্দশায় যে ছয় ব্যক্তি ফতোয়া দানের অনুমতি পেয়েছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। অবসর সময়ে তিনি কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন। নবী করীম (সা) তাঁর কুরআন তিলাওয়াত খুব পছন্দ করতেন এবং তিনি বলতেন "আবু মুসা হযরত দাউদ (আ) এর সুমুধুর কণ্ঠস্বরের কিছু অংশ লাভ করেছে।"

পবিত্র কুরআনের সাথে সাথে হাদীসের খেদমতেও তিনি কম ছিলেন না, কুফায় তিনি নিয়মিত হাদীসের দারস দিতেন। তাঁর থেকে সর্বমোট ৩৬০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে বুখারী এককভাবে ৪৫টি এবং মুসলিম এককভাবে ২৫টি বর্ণনা করেছেন। তিনি হিজরী ৪৪ সনে পবিত্র মক্কা নগরীতে ইন্তেকাল করেন।

গুরুত্ব

হাদীসটিতে একজন প্রথমশ্রেণীর ঈমানদার মুসলমানের সিদ্ধান্ত কি হওয়া উচিত তা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। দুনিয়া এবং আখিরাতের দ্বন্দ্বের মুহূর্তে সে কি সিদ্ধান্ত নিবে তা হাদীসে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। পৃথিবীতে যেখানে মানুষের ভোগের জন্য অসংখ্য ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং প্রতিনিয়ত তাকে দিচ্ছে ভোগের হাতছানি। সেখানে এ হাদীসটি মানুষকে পরকালের প্রাধান্যের মাধ্যমে সংযমের লাগাম পরিয়ে দিচ্ছে। বস্তুতঃ প্রতিটি মুমিনের জীবনেই এ হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্যাখ্যা

দুনিয়া এবং আখিরাতের মধ্যে এমনভাবে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে যেন কোন ব্যক্তি দুনিয়া বাদ দিয়ে বনে জঙ্গলে গিয়ে বৈরাগ্য সাধন না করে। আবার আখিরাতকে বাদ দিয়ে দুনিয়া পূজায় লিপ্ত না হয়। যেমন হাঁস এবং পানি, কারণ হাঁস অধিকাংশ সময় পানিতে থাকে বটে কিন্তু কখনো পানি তার শরীরকে ভিজিয়ে দেয় না। যারা আখিরাতকে বাদ দিয়ে শুধু দুনিয়ার পিছনে দৌড়ায় তাদের কথা বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেনঃ

اِعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِىْ اَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ (ط) -

"জেনে রাখো! দুনিয়ার জীবন তো একটা খেলা-মনভুলানোর উপায় এবং বাহ্যিক চাকচিক্য ও তোমাদের পরস্পরের গৌরব অহংকার করা। আর ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততির দিক দিয়ে একজন হতে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার চেষ্টা মাত্র"।

(সূরা হাদীদঃ ২০)

অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَالَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ - (الشورى : ٢٠)

"যে পরকালের ফসল চায়- তার ফসল আমরা বৃদ্ধি করে দেই, আর যে লোক দুনিয়ার ফসল পেতে চায়- আমরা তাকে দুনিয়ায় দিয়ে দেই। পরকালে তার কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না" (সূরা আল শুরাঃ ২০)

সূরা ত্বাহা-এ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাহার মাহবুব বন্দাদেরকে এক দিকে শান্ত্বনা এবং অপরদিকে উপদেশ দিতে গিয়ে ইরশাদ করেনঃ

وَلَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَامَتَّعْنَابِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا - لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ (ط) وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى -

"আর চোখ তুলে দেখবেও না দুনিয়ার জীবনের সেই জাকজমক যা আমরা এদের মধ্য হতে বিভিন্ন লোকদেরকে দিয়েছি। এগুলোতো আমরা দিয়েছি তাদেরকে পরীক্ষার নিমিত্তে। তোমার প্রভুর দেয়া হালাল রিজিক উত্তমও স্থায়ী।" (সূরা ত্বা-হা)

হাদীসে বলা হয়েছে আখিরাতকে ভালবাসলে দুনিয়ার জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, অর্থাৎ আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমার ভিতর থেকে কোন অবস্থাতে দুনিয়ার সমস্ত সুখ ভোগ করা সম্ভব নয়। কেননা দুনিয়াটা একটি সরাইখানা, আর প্রতিটি মানুষই তার মুসাফির। পৃথিবীটা জীবন চলার একটি মঞ্জিল মাত্র।

নবী করীম (সা) মুমিনের জন্য পৃথিবীকে জেলখানার সাথে তুলনা করে

اَلدُّنْيَا سِجْنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَجَنَّةٌ لِلْكٰفِرِيْنَ –

"পৃথিবীটা হচ্ছে মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফেরদের জন্য জান্নাত (স্বরূপ)। এ তো সর্বজনবিদিত যে জেলখানার কোন কয়েদীই পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে সব ধরণের সুখ ভোগ করতে পরেনা।

আখিরাতকে যারা পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেনি তারা দুনিয়ার সাফল্য ও ব্যর্থতাকেই চুড়ান্ত মনে করে বিধায় হাদীসে ক্ষতিগ্রস্তের কথা বলা হয়েছে। মুলতঃ কোন মুমিনই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না, তা দুনিয়াই হোক কিংবা আখিরাতে।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ اِغْتَنِمْ خَمْسًا شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ - (مشكوة)

"রাসূলুল্লাহ (সা) জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেনঃ পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটি বস্তুর পূর্বে গুরুত্ব দিবে এবং মূল্যবান মনে করবে। (১) বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে (২) অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে (৩) দারিদ্রতার পূর্বে স্বচ্ছলতার। (৪) ব্যস্ততার পূর্বে অবকাশকে। এবং (৫) মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে।" (মিশকাত)

শব্দার্থ :

لِرَجُلٍ – একব্যক্তির জন্য। وَ – এবং। هُوَ –তিনি, সে। يَعِظُهُ –তাকে উপদেশ দিতে গিয়ে। اِغْتَنِمْ –মূল্যবান মনে করো। خَمْسًا –পাঁচ। شَبَابَكَ – তোমার যৌবন। قَبْلَ – পূর্বে। هَرَمِكَ – তোমার বার্ধক্য। صِحَّتَكَ – তোমার সুস্থতা। سُقْمِكَ – তোমার অসুস্থতা। غِنَاكَ – তোমার স্বচ্ছলতা। فَقْرِكَ – তোমার দারিদ্রতা। فَرَاغَكَ – তোমার অবকাশ। شُغْلِكَ – তোমার ব্যস্ততা। حَيَاتَكَ – তোমার জীবন কাল। مَوْتِكَ – তোমার মৃত্যু।

গুরুত্ব

হাদীসটি যদিও নবী করীম (সা) এর উপদেশের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে তবুও গভীর দৃষ্টিতে চিন্তাভাবনা করলে বুঝা যায় যে, একজন মুসলিম তার জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করার পর কিভাবে সে দ্রুততার সাথে লক্ষ্যে পৌঁছবে তার বাস্তব

ফর্মূলা হচ্ছে এই হাদীসটি। কেননা যদি কোন ব্যক্তির লক্ষ্যে পৌঁছবার দৃঢ়তা ও তৎপরতা না থাকে তবে তার কর্মতৎপর হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আলোচ্য হাদীসে এ কথাই বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা

(১) হাদীসে বার্ধক্যের পূর্বে জীবনকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, কেননা এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে একজন মানুষের যৌবনই হচ্ছে তার সমস্ত কর্মক্ষমতার উৎস। যেসব মহান ব্যক্তিগণ পৃথিবীতে ইতিহাস সৃষ্টি করে গিয়েছেন তা সবই তাদের যৌবনের ফসল। যৌবন মানুষকে কর্মক্ষম, দৃঢ়চেতা ও সাহসী করে তোলে। এ সময় মানুষ কঠোর পরিশ্রম করতে পারে এবং দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারে। ফলে সব কাজই সে পরিশ্রম হলেও সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন করতে পারে। এমনকি সকল প্রকার ইবাদাতও। পক্ষান্তরে বার্ধক্যে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে সত্যিকারের মান বজায় রেখে আল্লাহর উবাদাত করা সম্ভব নয়। আর যদি মান মোতাবেক ইবাদাত করা না হয়, তবে তার প্রতিদানও আশানুরূপ হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহর সন্তুটি ও পুরস্কার কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব (আবার যৌবনের তেজ ছাড়া কঠিন পরিশ্রম করা সম্ভব নয়।)

নবী করীম (সা) বলেছেনঃ

اَلاَ اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةٌ اَلاَ اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ الْجَنَّةُ ۔ (ترمذی)

"যেনে রেখো আল্লাহ্র সম্পদ অত্যন্ত মূল্যবান-দাম বেশি না দিলে পাওয়া যায় না। আর মনে রেখো আল্লাহ্র সম্পদ হলো জান্নাত।" (তিরমিযি)

(২) অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে কারণ মানুষের শরীরটা একটা স্বয়ংক্রীয় (ইর্লমবর্টধড) যন্ত্র বিশেষ। তাই এ যন্ত্রের একটু ব্যতিক্রম হলেই দেহে বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তার নাম অসুস্থতা। কিন্তু কে কখন অসুস্থ হয়ে যাবে মানুষ তা অনুধাবন করতে অক্ষম। তাছাড়া অসুস্থ শরীরে যেখানে প্রাকৃতিক প্রয়োজনই সারা যায় না সেখানে আল্লাহর ইবাদত করা যাবে কিভাবে? এ জন্যই হাদীসে প্রতিটি সুস্থ মুহূর্তের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

(৩) দারিদ্রের ব্যাপারটাও উপরোক্ত বক্তব্যের অনুরূপ। কারণ স্বচ্ছলতা এবং

অস্বচ্ছলতা এর কোনটাই মানুষের নিয়ন্ত্রণে নেই। এগুলো নিয়ন্ত্রণ করেছেন স্বয়ং বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ - (اسرى)

"তোমার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছে করেন তার রিজিক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছে করেন তার রিজিক সংকীর্ণ করে দেন।" (সূরা বনী ইস্রাঈল)

অন্যত্র ধনসম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে-

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ (ط) بِيَدِكَ الْخَيْرِ (ط) اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ - (ال عمران)

"বলো, হে আল্লাহ! সমস্ত রাজ্য ও সাম্রাজ্যের মালিক। তুমি যাকে চাও রাজত্ব দান করো এবং যার নিকট হতে ইচ্ছে করো রাজত্ব ছিনিয়ে নাও। যাকে চাও সম্মানিত করো এবং যাকে চাও লাঞ্ছিত করো। সকল কল্যাণ তোমার হস্তে। নিঃসন্দেহে তুমি সর্বশক্তিমান।" (সূরা আল-ইমরান)।

বস্তুত আল্লাহ মানুষকে যে অবস্থাতেই রাখুক না কেন সে অবস্থাতেই নিজেকে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল মনে করতে হবে। কেননা যদি আল্লাহ চান তবে এর চেয়েও ভয়ংকর অবস্থার সম্মুখীন করতে পারেন। তাই আল্লাহ যেভাবেই রাখুন না কেন সর্বাবস্থায়ই মানুষের দান ছদকা করা উচিত। বিশেষ করে স্বচ্ছলতার সময় কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বেশী দান করা উচিত।

(৪) মানুষের একটি দুর্বলতা বা প্রবণতা আছে, কোন কাজ তার সামনে এলে মনে করে একটু পরে কাজটি শেষ করবো বা আগামী কাল শেষ করবো ইত্যাদি। কিন্তু দেখা গেলো একটু পরেই তার সামনে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ উপস্থিত হলো। সেটা শেষ হতে না হতেই আরেকটা উপস্থিত। এমনিভাবে প্রথম যে কাজটি অনায়াসে করা যেতো সেটা হয়তো আর পরে করার কোন সুযোগই সে পাবেনা। অদ্রুপ আল্লাহর ইবাদাতের ব্যাপারেও যদি কেউ এরূপ মনোভাব পোষণ

করে তার পরিণতিও তেমন হতে বাধ্য। তাছাড়া প্রতিনিয়ত মানুষের যে সময় অতীত হয়ে যাচ্ছে সে সময়তো আর কখনো ভবিষ্যৎ হয়ে আসবে না। তাহলে কি করে এর ক্ষতিপূরণ হতে পারে?

(৫) পৃথিবীতে যতক্ষণ সময় মানুষের অবস্থান সে সময়টুকুকেই আমরা জীবন বলি। যেমন কোন শিশু ভূমিষ্ট হওয়া মাত্র তার জীবন শুরু হলো এবং মৃত্যুর মাধ্যমে তার জীবনের অবসান হলো। এখন কথা হচ্ছে পৃথিবী নামক এ গ্রহটিতে কার অবস্থান কতো সময় তা আমরা কেউ বলতে পারবো না, তাই একথা মনে করেই আল্লাহর ইবাদত করতে হবে যে, এটাই আমার জীবনের শেষ ইবাদত। হাদীসে বলা হয়েছে-

"তোমরা দুনিয়ার কাজ এমন ভাবে করো যেন অনন্তকাল জীবিত থাকবে এবং আখিরাতের কাজ এমনভাবে করো যেনো কালই তুমি মৃত্যুবরণ করবে।"

শিক্ষাবলী

(১) যৌবনের পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ একমাত্র আল্লার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করতে হবে।

(২) আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কার কেবলমাত্র কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও আনুগত্যের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব।

(৩) চলমান সময়কেই অপেক্ষাকৃত উত্তম সময় বলে মনে করতে হবে। সংকল্প করা ঠিক নয়- যখনকার কাজ তখন করাই উত্তম।

(৪) যেহেতু মানুষের মৃত্যুর নির্দিষ্ট কোন সময় নেই সেহেতু জীবনের প্রতিটি মূহুর্তই অত্যন্ত মূল্যবান। মনে করতে হবে একটু পরেই হয়তো আমার জীবনের অবসান হবে।

(৬) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান-ছদকা করতে হবে, পরিমাণে যাই হোক না কেন।

عَنْ عَلِّي قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُوْشِكُ اَنْ يَّاْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَيَبْقَى مِنَ الْاِسْلاَمِ اِلاَّ
اِسْمُهٗ وَلاَيَبْقٰى مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلاَّ رَسْمُهٗ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ
وَّهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدٰى عُلَمَاءُ هُمْ شَرٌّ مَّنْ تَحْتَ اَدِيْمِ
السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُوْدُ

(رواه البيهقى فى شعب الايمان)

"হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত —তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেনঃ ভবিষ্যতে মানুষের সামনে এমন এক সময় আসবে যখন নাম ব্যতিরেকে ইসলামের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কুরআনেরও অক্ষর ব্যতীত আর কিছুই থাকবে না। তাদের মসজিদ সমূহ বাহ্যিক দিক দিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ হবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হেদায়াত শূন্য হবে। তাদের আলেমগণ হবে আকাশের নিচে (সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে) সবচেয়ে নিকৃষ্ট আর তাদের তরফ হতে দ্বীন সম্বন্ধে ফিৎনা প্রকাশ পাবে, অতঃপর সে ফেতনা তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।" (বায়হাকী)

শব্দার্থ

يُوْشِكُ – খুব তাড়াতাড়ি। اَنْ – যে। يَاْتِىْ –আসবে। عَلَى النَّاسِ – মানুষের উপর। زَمَانٌ – সময়। لاَ يَبْقٰى – অবশিষ্ট থাকবে না। اِلاَّ – ব্যতীত। اِسْمُهٗ – তার নাম। رَسْمُهٗ – বহ্যিক আচরণ (এখানে শুধু তেলওয়াতের কথা বলা হয়েছে।) عَامِرَةٌ – সুরম্য অট্টালিকা। خَرَابٌ –হেদায়েত বিহীন। شَرٌّ – ক্ষতিকর। تَحْتَ – নিচে। اَدِيْمُ –পৃষ্ঠ। تَخْرُجُ বের হবে। اَلْفِتْنَةُ।– বিভ্রান্তি। تَعُوْدُ – প্রত্যাবর্তন।

বর্ণনাকারীর (রাবীর) পরিচয়

রাসূলে কারীম (সা) এর দ্বীনের দাওয়াত দেয়া মাত্র সর্বপ্রথম যে সব সাহাবীগণ ইসলাম গ্রহণ করেছেন হযরত আলী (রা) তাঁদের অন্যতম। তাছাড়া কিশোর বয়সে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হযরত আলী (রা)। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে তিনি পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। যে দশজন সাহাবী পৃথিবী হতে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন, হযরত আলী (রা) তাঁদের একজন।

ডাক নাম আবুল হাসান। নবী করীম (সা) এর নবুয়ত লাভের ১০ বৎসর পূর্বে মক্কায় তাঁর জন্ম। নবী করীম (সা) এর পরিবারেই প্রতি পালিত হন। তিনি একাধারে রাসূলুল্লাহ (সা) চাচাত ভাই, জামাতা এবং ঘনিষ্ট সহচর। তাবুক যুদ্ধ ছাড়া আর সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেছেন।

তাবুকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে মদীনার দায়িত্বে নিয়োজিত করে যান, তাই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। হযরত আলী (রা) একদিকে ছিলেন সাহসী যোদ্ধা এবং অপরদিক ছিলেন জ্ঞানের মহাসাগর। দ্বিতীয় খলিফার শাসনামলে তিনি ছিলেন মজলিশে শু'রার সদস্য।

আলী (রা) সম্বন্ধে নবী করীম (সা) বলেনঃ

أَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِىٌّ بَابُهَا - (ترمذى)

"আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী তার দরজা" (তিরমিযি)

হাসান, হোসাইন, ইবনে মাসউদ, আবু মূসা, ইবনে আব্বাস, আবু রাফে, ইবনে উমার, আবু সাঈদ, সুহাইব, যায়েদ ইবনে আরকাম, জারীর, আবু জুহাইফা, বারায়া, আবুত্ তুফাইল (রা) প্রমুখগণ এবং অনেক তাবেয়ী তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির গুরুত্ব

এ হাদীসটিতে ভয়ংকর দিকে মানুষকে পূর্বেই সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। যদি এ রকম অবস্থার সৃষ্টি হয় তবে তার পরিণতি যে অত্যন্ত মারাত্মক হতে বাধ্য এবং সমাজ বিশৃঙ্খলা ও ফেতনা ফ্যাসাদের শিকার হয়, এদিকে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কাজেই আমরা যদি সুন্দর ও সুস্থ একটি সমাজের আকাংখা করি তবে দিক-দর্শন যন্ত্রের ন্যায়ই এ হাদীসটি পথ নির্দেশ দিবে।

ব্যাখ্যা

বলা হয়েছে নাম ব্যতীত আর ইসলামের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, অর্থাৎ ইসলাম পৃথিবীতে এসেছে হক প্রতিষ্টার এক বিপ্লবী পয়গাম নিয়ে। মানব রচিত সমস্ত মতবাদের মূলোৎপাটন করে আল্লাহ্ প্রদত্ত মতবাদের প্রতিষ্টার জন্য। আমারা দেখেছি, পৃথিবীতে মানব রচিত কোন মতবাদই পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন নয়। কিন্তু আল্লাহ্ প্রদত্ত মতবাদ সম্পূর্ণ নির্ভুল, পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন।
আল্লাহ্ নিজেই স্বীকৃতি দিয়েছেনঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ (مائدة)

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের জীবন ব্যবস্থা (দ্বীন) কে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়েদাঃ ৫-৬)
আর এ কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব যাকে দেয়া হয়েছে তিনি হলেন সরদারে দোজাহাঁ হযরত মুহাম্মদ (সা)।
আল্লাহ্ বলেনঃ

هُوَالَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ـ

তিনি তাঁর রাসূলকে সঠিক জীবন বিধান (দ্বীন) দিয়ে এজন্যেই পাঠিয়েছেন, যেন তা পৃথিবীর সকল মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। (সূরা তাওবা)
পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের প্রভাব জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগ ব্যাপিয়া। শুধুমাত্র নামায, রোযা বা মসজিদ মাদ্রাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এ দ্বীন আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত নেই এবং প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাদের তৎপরতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ অধিকাংশ লোক আংশিক দ্বীন নিয়েই সন্তুষ্ট। অথচ এর পরিণতি যে কতো ভয়াবহ তা একবারও কেউ চিন্তা করি না।

ইরশাদ হচ্ছেঃ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ - (البقرة)

"তোমরা কি আল্লাহ্‌র কিতাবের কিছু অংশ মানবে এবং কিছু অংশ পরিহার করবে? যারা এরূপ করবে তাদেরকে দুনিয়ায় লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হবে এবং আখিরাতে তাদেরকে আরো ভায়াবহ আজাবের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।" (সূরা বাকারা)

অন্যত্র বলা হয়েছে-

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ (ط) (قصص)

"তার চেয়ে বড়ো পথভ্রষ্ট আর কে আছে যে আল্লাহ্‌র কাছ হতে আগত হেদায়েতের পরিবর্তে আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো।" (সূরা কাসাস)

বস্তুতঃ যেখানে ইসলাম পূর্ণ অবয়বে প্রতিষ্ঠিত নেই বা হতে পারেনি সেখানে ইসলাম নাম সর্বস্ব হিসেবেই আছে।

অক্ষর ব্যতীত কুরআনের আর কিছু থাকবে না, একথা বলতে বুঝানো হয়েছে যে, এমন একটি সময় আসবে যখন মানুষের সাথে কুরআনের তিলাওয়াত ব্যতীত অন্য কোন সম্পর্ক থাকবে না। অথচ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আল কুরআন দিয়েছেন মানুষের জীবনের সকল প্রয়োজন ও সমস্যার সমাধানের জন্য। জীবনে সবকিছুর ফায়সালার ভার দেয়া হয়েছে কুরআনের উপর এবং ফায়সালা গ্রহণ করার দয়িত্ব দেয়া হয়েছে মানুষকে। কাজেই যদি কোন মানুষ কুরআনের ফায়সালা গ্রহণ না করে বা শুধু তিলাওয়াত করলো কিন্তু ফায়সালা গ্রহণ করলো অন্য কোন মানুষের, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেনঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ - (مائدة)

যারা আল্লাহ্র দেয়া বিধান (অর্থাৎ কুরআন) অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করেনা তারা কাফের। (সূরা মায়েদা)।

আরো দু'টো আয়াতে ফাসেক এবং জালেম বলা হয়েছে। মূলতঃ প্রতিটি মানুষের নিকট কুরআনের দাবী হচ্ছে তিনটি। যথাঃ

(১) সহীহ্ শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত (২) ভালোভাবে তার অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝা এবং (৩) জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার যথাযথ প্রয়োগ বা ব্যবহার।

মসজিদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, মসজিদ সমূহ জাঁকজমকপূর্ণ সুরম্য অট্টালিকা এবং বিভিন্ন রকম কারুকাজ খচিত হবে। কিন্তু তা হেদায়াত শূন্য হবে। অর্থাৎ মসজিদে শুধুমাত্র নামায ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। অথচ নবী করীম (সা) এর সময় থেকে খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় পর্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড পরিচালিত হতো মসজিদ কেন্দ্রিক। মসজিদের যে মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুৎবা পড়া হতো সেখানে দাঁড়িয়েই যুদ্ধের ঘোষণা এবং পরামর্শ দেয়া হতো, করা হতো বিচর ফায়সালা। রাষ্ট্রীয় সচিবালয় ছিলো মসজিদ। সেখানে যেমন নামাজ পড়া হতো তেমনিভাবে লেখাপড়াসহ অন্যান্য তালিম তরবিয়তও দেয়া হতো। মজার ব্যাপার হলো এতো বড়ো একটি রাষ্ট্র পরিচালনা করেও অন্য কোথাও তার কোন দপ্তর স্থাপিত হয়নি, তাদের সবকিছুই ছিলো মসজিদ কেন্দ্রিক। আর আজ আমাদের দেশে বা সমাজে মসজিদে নামায ছাড়া অন্য কিছুর কথা মুখেও আনা যায় না। যদিও তা শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিজনক নয়।

ফরয নামায ছাড়াও নিম্মোক্ত কাজগুলো মসজিদে করা যায়। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের অনেকের জ্ঞানই সীমিত।

(১) যে কোন নামায পড়া যাবে (২) জিকির করা যাবে। (৩) ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিশে শুরা বা পার্লামেন্টের বৈঠক করা যাবে। (৪) যুদ্ধ সংক্রান্ত পরামর্শ বা প্রয়োজনীয় কাজ করা যাবে। (৫) সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করার জন্য গঠিত কোন সংঘঠনের প্রোগ্রাম করা যাবে। (৬) মসজিদে বসে বিচার অনুষ্ঠান করা যাবে তবে মসজিদের মধ্যে কোন শাস্তি দেয়া যোবে না। (৭) ইমামের নেতৃত্বে মহল্লাবাসীদের এবং মুসল্লীদের খোঁজ খবর নেয়া এবং তাদের সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করা যাবে। (৮) বাতিল শক্তি বা সরকারকে

উৎখাত করার জন্য এবং ইসলামী শাসন বাস্তবায়নের জন্য যে সংগঠন বা সংস্থা তৎপর তাদের যাবতীয় কার্যাবলী মসজিদ হতে পরিচালনা করা যাবে। (৯) যাকাত বন্টন, সংগ্রহ, দান-ছদকা ইত্যাদির কার্যক্রম মসজিদকেন্দ্রিক পরিচালনা করা যাবে। (১০) ই'তিকাফ এবং কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে। (১১) মানুষের জন্য কল্যাণমূলক শিক্ষাও মসজিদে দেয়া যাবে।

আলেমদের ব্যাপারে যে কথা বলা হয়েছে তার তাৎপর্য হচ্ছে। এই যে, কিছু লোক শুধুমাত্র দুনিয়া অর্জনের জন্য শিক্ষা গহণ করবে এবং হালাল-হারামের পরওয়া না করে স্বেচ্ছাচারিতা শুরু করে দিবে। এমনকি তাদের স্বেচ্ছাচারিতা বৈধ করণের জন্য কুরআন হাদীসের সমর্থন খোঁজার চেষ্টা করবে। পক্ষান্তরে হাক্কানী উলামাগণ দ্বীনের সঠিক বক্তব্য মানুষের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করবেন, কিন্তু দু'দলের দু'রকম বক্তব্যের কারণে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে বিভিন্ন প্রকার ফেতনা ফ্যাসাদের লিপ্ত হয়ে যাবে এবং তাদের এ ভুলের খেসারত দিবে সমাজের নিরীহ জনগণ।

عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيْدٍ قَالَ : ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَقَالَ : ذٰلِكَ عِنْدَ اَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ - قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمِ ؟ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَنَقْرَئُهُ اَبْنَاءَ نَا وَيُقْرِئُهُ اَبْنَاءُ نَا اَبْنَاءَ هُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَا زِيَادُ اِنْ كُنْتُ لَاَرَاكَ مِنْ اَفْقَهِ رَجُلٍ فِى الْمَدِيْنَةِ اَوَلَيْسَ هٰذِهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى يَقْرَؤُوْنَ التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ لَا يَعْمَلُوْنَ بِشَيْئٍ مِمَّا فِيْهِمَا - (احمد - ابن ماجه) —

"হযরত যিয়াদ বিন লবিদ (রা) বর্ণনা করেছেন, একবার নবী করীম (সা) কিছু আলোচনা কললেন এবং বরলেন এটা (ঘটবে) ইলম উঠে যাওয়ার সময়।
আমি জিজ্ঞেস করলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইল্ম কিভাবে উঠে যাবে? অথচ আমরা কুরআন পড়ি এবং আমাদের সন্তানদেরকে পড়াই আর তারা তাদের সন্তানদেরকে পড়াবে। এভাবে তো কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ হে যিয়াদ! তোমার ধ্বংস হোক। আমি তোমাকে মদীনার জ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম মনে করতাম। তুমি কি দেখোনা, ইয়াহুদীগণ তওরাত এবং খৃষ্টানগণ ইঞ্জিল (বাইবেল) কিতাব পড়ে কিন্তু (এর মধ্যে যে বিধিবিধান দেয়া হয়েছে) তারা তার কিছুই মানে না।"
(আহমদ, ইবনে মাজা, তিরমিযিতে অনুরূপ আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং দায়েমী আবু উমামার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।)

শব্দার্থ

ذَكَرَ– স্মরণ করলেন, বর্ণনা করলেন। شَيْئًا – কিছু, বস্তু। ذٰلِكَ –ঐ। عِنْدَ اَوَانِ – সময়। ذَهَابِ الْعِلْمِ –ইলম উঠে যাবে। قُلْتُ –আমি বললাম। كَيْفَ – কি ভাবে। يَذْهَبُ الْعِلْمُ – ইল্‌ম উঠে যাবে। نَحْنُ – আমরা। نَقْرَءُ الْقُرْاٰنَ –আমরা কুরআন পড়ি। نَقْرَئُهُ اَبْنَاءَنَا – আমরা তা আমাদের সন্তানদেরকে পড়াই। يُقْرِئُهُ اَبْنَاءُ نَا اَبْنَاءَ هُمْ – আমাদের সন্তানেরা তাদের সন্তানদেরকে পড়াবে। اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ – কিয়ামত পর্যন্ত। ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ–তোমার ধংস হোক, বোকা কোথাকার, তোমার মার ক্ষতি হোক, হতভাগা, ইত্যাদি। (স্নেহপূর্ণ গালি হিসেবে বাক্যটি ব্যবহৃত হয়)। اِنْ كُنْتُ لَاَرَاكَ – আমি তোমাকে মনে করেছি, আমি তোমার সম্পর্কে ধারণা করেছি। مِنْ – হতে, চেয়ে। اَفْقَهِ رَجُلٍ – বুদ্ধিমান ব্যক্তি। فِى الْمَدِيْنَةِ – মদীনার। اَوَلَيْسَ هٰذِهِ –এটা কি ঠিক নয়, তোমার কি জানা নেই, তুমি কি দেখোনা? ইত্যাদি। اَلْيَهُوْدُ – ইহুদীগণ। اَنْصَارٰى – খৃষ্টানগণ। يَقْرَءُوْنَ –তারা পড়ে। اَلتَّوْرَاةُ – তাওরাত কিতাব। اَلْاِنْجِيْلُ – ইঞ্জিল কিতাব (বাইবেল)। لَايَعْمَلُوْنَ – তারা আমল করেনা, তারা মানে না। بِشَئٍ مِمَّا فِيْهِمَا – তার মধ্যে যা আছে তার কোন কিছুই।

বর্ণনাকারীর পরিচয়

নাম যিয়াদ। কুনিয়াত আবু আবদুল্লাহ্‌। পিতার নাম লবিদ। মদীনার আনসার সাহাবীদের অন্যতম। ইসলাম পূর্ব সময়ে মদীনায় যারা শিক্ষিত ও জ্ঞানী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। যিয়াদ হচ্ছেন তাদের অন্যতম। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সর্বদা রাসূল (সা) এর সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যকুল থাকতেন। রাসূল (সা) ও তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর শাসনামলে প্রথম দিকে ইন্তেকাল করেন। আওফ ইবনে মালেক (রা), আবু দারদা (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির গুরুত্ব

আল কুরআন হচ্ছে সমস্ত ইলম ও হেদায়েতের উৎস। কোন উৎস থেকে উপকৃত হওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে ভালোভাবে সে উৎসের সন্ধান লাভ করা এবং তার থেকে উপকৃত হওয়ার পদ্ধতি জানা। মানুষ যখন হেদায়েতের প্রকৃত উৎস সম্পর্কে গাফেল হয়ে যাবে তখন হেদায়েত থেকে অনেক দূরে সরে যাবে। এ অবস্থাকে রূপকভাবে ইলম উঠিয়ে নেয়া বলা হয়েছে। এখানে আরেকটি কথা বলা হয়েছে যে, যে উদ্দেশ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, শুধু পড়া বা তিলাওয়াতের মাধ্যমে সে হক আদায় হতে পারেনা। বা আদায় হওয়া সম্ভবও নয়। এ হাদীসটিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে সে কথাটিই তুলে ধরা হয়েছে। অতএব প্রতিটি মুসলমানের জন্যই এ হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যাখ্যা

স্রষ্টাও সৃষ্টির যোগসূত্র নির্নয় করে যে বস্তু, কিংবা যার মাধ্যমে স্রষ্টার পরিচয় এবং নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানা যায় তাই ইলম বা জ্ঞান। আর এ জ্ঞানের অভাবেই আবুল হাকাম (মহাবিজ্ঞ) হয়েছে আবু জাহেল (গন্ড মুর্খ)। ইসলাম পূর্বযুগে আবুল হাকাম ছিলো মক্কার প্রধান বিজ্ঞ ব্যক্তি। তার মেধা এবং বিজ্ঞতার কারণেই লোকেরা তাকে আবুল হাকাম বা বিজ্ঞের পিতা (অর্থাৎ মহাবিজ্ঞ) বলে সম্মোধন করতো। কিন্তু যখন নবী করীম (সা) স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেন, এবং বললেনঃ মানুষ সহ প্রতিটি সৃষ্টির একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্। কাজেই মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে শুধু মাত্র তাঁর আনুগত্য ও দাসত্ব করা। তবে শর্ত হচ্ছে, তা হতে হবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দেখানো পদ্ধতীতে। এ সহজ সরল কথাটি স্বীকার না করার কারণে তার উপাধি হলো আবু জাহেল বা গন্ডমুর্খ।

জ্ঞানের উৎস হচ্ছে আল কুরআন। কুরআনের সাথে মানুষের সম্পর্ক যতো বেশী হবে জ্ঞানের গভীরতাও ততো বৃদ্ধি পাবে। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ

ظَاهِرُهُ اَنِيْقٌ وَبَاطِنُهُ عَمِيْقٌ ـ لَهُ نُجُوْمٌ لاَ تُحْصٰى عَجَائِبُهُ
وَلاَ تُبْلٰى غَرَائِبُهُ فِيْهِ مَصَابِيْحُ الْهُدٰى وَمَنَارُ الْحِكْمَةِ ـ —

তার (অর্থাৎ কুরআনের) বাইরের দিক অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং ভিতরের দিক অত্যন্ত গভীর। তার অনেকগুলো তারকা আছে, তারকা সমূহের উপর আরো তারকা আছে কিন্তু তবুও তার বিস্ময়করতা অসীম -অনায়ত্ত। তার অভিনবত্ব কোন দিনই পুরাতন বা জীর্ণ হয়ে যাবে না।
রইসুল মুফাস্সিরিন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেনঃ

اِنَّ الْقُرْاٰنَ يُفَسِّرُهُ الزَّمَانُ —

নিশ্চয়ই কুরআন যুগের চাহিদা অনুযায়ী ব্যাখ্যা প্রদান করে।
হযরত আলী (রা) বলেছেনঃ

كِتَابَ اللّٰهِ تُبْصِرُوْنَ بِهٖ وَتَنْطِقُوْنَ بِهٖ وَتَسْمَعُوْنَ بِهٖ وَيَنْطِقُ بَعْضُهٗ بِبَعْضٍ وَّيَشْهَدُ بَعْضُهَا عَلٰى بَعْضٍ —

আল্লাহর এ কিতাব দিয়েই তোমরা দেখবে এবং এর সাহায্যে তোমরা কথা বলবে। আর এর মাধ্যমেই তোমরা শুনবে। (এটি এমন এক কিতাব, যার) এক অংশ আরেক অংশের সাহায্যে কথা বলে। কিছু অংশ আবার কিছু অংশের সততার সাক্ষ্য দেয়।

অর্থাৎ তোমাদের দেখা কথা বলা ও শুনা তথা সমস্ত ব্যাপারে সঠিক পথ নির্দেশনা দিবে আল্ কুরআন। এবং কুরআন থেকে পথ নির্দেশনা পেতে বেশী কষ্ট ও করতে হয়না। কারণ কোন জায়গা দুর্বোধ্য মনে হলেও অপর জায়গায় তা সহজবোধ্য করে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া এর নির্দেশনা যে সঠিক ও নির্ভুল তা খুদ কুরআনই সাক্ষ্য প্রদান করে। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ

اِنَّ الْقُرْاٰنَ يُفَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا -

নিশ্চয়ই কুরআনের এক অংশ আরেক অংশের ব্যাখ্যা প্রদান করে।[১]

এখন এই কুরআনকে যদি কেউ হেদায়েতের উৎস মনে না করে এবং কুরআনের পথ নির্দেশনা তথা আদেশ নিষেধ না মেনে শুধুমাত্র তিলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে, তবে তা ইলম বিলপ্তির নামান্তর মাত্র। কুরআন তিলাওয়াতে অবশ্যই সওয়াব আছে। তবে শুধুমাত্র তিলাওয়াত করার জন্য আল্ কুরআন অবতীর্ণ করা হয়নি। কিন্তু যখন কুরআনকে তিলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে তখন ইলম উঠে যাবে। ইলম উঠে যাওয়া মনেই হেদায়েতের রাস্তা থেকে দুরে চলে যাওয়া। হেদায়েতের পথ থেকে দুরে চলে যাওয়ার পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম। আলোচ্য হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তওরাত ও ইঞ্জিল আসমানী কিতাব। কিন্তু তা বিকৃত করা হয়েছে। তারপরও সেখানে যে সমস্ত হুকুমে ইলাহী ছড়িয়ে আছে সেগুলো তারা অনুসরণ করার পরিবর্তে শুধুমাত্র তিলাওয়াত করে থাকে। ফলে তারা হেদায়েতের রাস্তা থেকে দুরে চলে গিয়েছে। এবং তাদের পরিণতি জাহান্নাম। এজন্য নবী করীম (সা) আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে প্রতিটি মুসলমানকেই সাবধান করে দিয়েছেন যাতে মুসলমানগণ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে না পড়ে। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ

অচিরেই মানুষের নিকট এমন একটি সময় আসবে যখন নামে মাত্র ইসলাম থাকবে। কুরআনও থাকবে কিন্তু তার শব্দগুলো (তিলাওয়াত) ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। (বাইহাকী)

আমাদেরকে গভীর ভাবে ভেবে দেখতে হবে যে, আমারা এ হাদীসের আওতায় পড়ে যাই কিনা? জবাব যদি ইতিবাচক হয় তবে মনে করতে হবে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে কুরআনকে বুঝে পড়া এবং সেই আলোকে ব্যক্তিজীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিচালনা করা। এর কোন বিকল্প নেই।

---

(১) হাদীসের উদ্ধৃতিগুলো মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের আল কুরআনের আলোকে শিরক ও তাওহীদ নামক গ্রন্থ থেকে হয়েছে।

শিক্ষাবলী

১। কোন চিঠি বা নির্দেশনামার নির্দেশগুলো কার্যকরী না করে বার বার পাঠ করায় যেমন কোন কল্যাণ হতে পারে না তদ্রূপ কুরআনের আলোকে জীবন যাপন না করে শুধু তিলাওয়াত করলেও কোন কল্যাণ পাওয়া সম্ভব নয়।

২। কুরআন হচ্ছে সমস্ত হেদায়েত ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎস।

৩। জ্ঞানী তারা, যারা কুরআনের প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলার জন্য আপ্রান চেষ্টা করেন আর যারা এর বিপরীত জীবন যাপন করে তাদেরকে জাহেল বলা হয়েছে।

৪। ইয়াহুদী নাসারা আলেমদের নিকট আল্লাহ্র হুকুম (কিছু অংশ) বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যেমন তারা বিপথগামী-ভ্রষ্ট। তেমনি ভাবে মুসলিম সমাজে কুরআন বর্তমান থাকলেও তারা বিপথগামী বা ভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে।

তথ্যসূত্র

১। মিশকাত শরীফ।
২। উছুলুল ঈমান।
৩। মুয়াত্তা-ইমাম মুহম্মদ (রহ)।
৪। আল কুরআনের আলোকে শির্ক ও তাওহীদ, মাওঃ আবদুর রহীম।

রাসূল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা ধারণ করো এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো। —আল কুরআন

দারসে হাদীস-২

(পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ)

দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়সূচী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকৃত প্রশান্তি

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا نِيَّتَهُ فَرَّقَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتِ الْاٰخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللّٰهُ اَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهِ وَاَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ - ترغيب وترهيب

"যায়িদ বিন সাবিত (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম (সা) কে বলতে শুনেছিঃ

যে ব্যক্তি দুনিয়াকে নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করবে, আল্লাহ্ তার মনের স্বস্তি ও শান্তি ছিনিয়ে নিবেন। সে সর্বদা অর্থ সংগ্রহের লালসার শিকারে পরিণত হবে। কিন্তু দুনিয়ায় ততোটুকুই সে লাভ করতে পারবে যতোটুকু তার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। আর যাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে আখিরাত; আল্লাহ্ তাদের স্বস্তি ও শান্তি দান করবেন এবং অর্থ লালসা হতে মনকে হিফাজত রাখবেন। দুনিয়ার যতোটুকু তার জন্য নির্দিষ্ট আছে ততোটুকু তো অবশ্যই পাবে।" (তারগীব ও তারহীব, যাদেরাহ, মিশকাত)

শব্দার্থ

نِيَّتَهُ – উদ্দেশ্য বানাবে। فَرَّقَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اَمْرَهُ –আল্লাহ্ তার মনের স্বস্তি ছিনিয়ে নিবেন। (শাব্দিক অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ সকল কাজে তার থেকে পৃথক থাকবেন।) جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ– সে সর্বদা অর্থ সংগ্রহের লালসার শিকারে পরিণত হবে। (শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– তার চোখে তাকে দরিদ্র করে দিবেন।)

إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ। –ঐ সকল ছাড়া যা তার জন্য নির্দিষ্ট আছে। جَمَعَ اللّٰهُ أَمْرَهُ
আল্লাহ্ তার দিলে স্বস্তি ও শান্তি দান করবেন। جَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ –
অর্থ লালসা হতে তার মনকে হিফাজত রাখবেন। أَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ –
যতোটুকু তার জন্য নির্দিষ্ট আছে ততোটুকু তাকে দেয়া হবে।

রাবীর (বর্ণনাকারী) পরিচয়

যায়িদ নাম। কুনিয়াত আবু সাঈদ, আবু খায়েজাহ এবং আবু আবদুর রহমান। পিতার নাম সাবিত বিন জাহ্হাক। মায়ের নাম নাওয়ার বিনতে মালিক। নবী করীম (সা) হিজরতের এক বৎসর পূর্বে হযরত মাসয়াব ইবনে উমাইর (রা) কে মদীনায় প্রশিক্ষক রূপে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর দাওয়াতে আওস ও খাযরাজ গোত্রের যে সকল মহাত্মাগণ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, হযরত যায়িদ ছিলেন তাদের অন্যতম। মাত্র ১১ বৎসর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন ভাষায় সমান পারদর্শী ছিলেন। ইবরানী, সুরইয়ানী, হাবশী, কিবতী, রোমক ও আরবী ইত্যাদি ভাষায় সমান পারদর্শী ছিলেন। চতুর্মুখী মেধা ও যোগ্যতার কারণেই নবী করীম (সা) তাকে কাতেবে ওহী বা ওহী লেখকদের দলে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি শুধু ওহী ই লিখতেন না বরং তিনি ছিলেন নবী করীম (সা) এর ব্যক্তিগত সচিব। বিভিন্ন দেশের রাজা বাদশাহদের নিকট হতে যে সকল পত্রাবলী আসতো, তা তিনি অনুবাদ করে নবী করীম (সা) কে শুনাতেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে উত্তর দিতেন।

হযরত আবু বকর (রা) কুরআন সংকলনের জন্য যে কমিটি গঠণ করেন তার নেতৃত্ব দেন হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত। হযরত উমর (রা)এর খিলাফত কালে কালে তিনি লেখক, মজলিসে শুরা সদস্য এবং মদীনা মুনাওয়ারার প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন।

তিনি হিজরী ৪৫/৪৬ সনে ৫৬ বৎসর বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৯২টি। বুখারী ও মুসলিমের ঐকমত্যের হাদীস ৫টি।

গুরুত্ব

পৃথিবীতে মানুষ যতো চেষ্টাই করুক না কেন তার জন্য যতোটুকু রিজিক বরাদ্দ আছে তার চেয়ে একটি দানাও সে বেশী পাবেনা। তাই আখিরাতকে বাদ দিয়ে দুনিয়ার পিছনে দৌড়ানো কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কেননা আখিরাতের কল্যাণের লক্ষ্যে যদি সে কাজ করে তবে দুনিয়া হতেও সে বঞ্চিত হবেনা। সেজন্যই হাদীসে বলা হয়েছে-প্রতিটি মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিৎ আখিরাত। কারণ আখিরাতের সাথে দুনিয়া জড়িত। কিন্তু দুনিয়া যদি কোন ব্যক্তির লক্ষ্য হয় তবে সে নির্ঘাত আখিরাত হারাবে। কেননা দুনিয়ার সাথে আখিরাত জড়িত নয়।[১] বস্তুত একজন মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত সম্বন্ধে তার চিন্তা ভাবনা কি হওয়া উচিৎ তা হাদীসে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা

প্রতিটি মানুষের ভাগ্যলিপি (তাকদীর) নির্দিষ্ট। মানুষের ভাগ্যলিপিতে যা আছে তা অবশ্যই ঘটবে। তবে মানুষের ইচ্ছে এবং চেষ্টার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ্ শুধুমাত্র ইচ্ছে এবং চেষ্টার স্বাধীনতার বিচারই করবেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- পৃথিবীতে যার জন্য যতোটুকু সম্পদ নির্দিষ্ট রয়েছে তার বেশী কোন অবস্থাতেই অর্জন করা যাবে না। কাজেই যে পৃথিবী নশ্বর এবং যেখানে অবস্থান কাল একজন পথচারী বা মুসাফিরের চেয়ে বেশী নয়, সেখানে আরাম আয়েশ বা ধন-ঐশ্বর্য্যের গুরুত্ব কোথায়? তবু দেখা যাচ্ছে- সে নশ্বর বস্তুর জন্যই প্রতিটি মানুষ জীবনপাত করছে। অথচ আমরা সবাই জানি, যেদিন মৃত্যু আমাদেরকে পৃথিবীর মোহ-মায়া, আরাম-আয়েশ সবকিছু হতে তাড়িয়ে দিবে মহাকালের দিকে, সেদিন সব কিছুই পড়ে থাকবে। ছেলে মেয়ে এবং অন্যান্য

---

(১) অর্থাৎ দুনিয়াকে বাদ দিয়ে আখিরাত অর্জন সম্ভব নয় কেননা নবী করীম (সা) বলেছেন -- اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ "পৃথিবী হচ্ছে আখিরাতের শস্য ক্ষেত্র" পক্ষান্তরে আখিরাতকে বাদ দিয়ে দুনিয়া অর্জনের চেষ্টা করা সম্ভব।

আত্মীয় স্বজন ভোগ করবে সমস্ত সম্পদ।

নবী করীম (সা) বলেনঃ

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ-

مسلم-

"দুনিয়া সবুজ মনোরম চাকচিক্যময় করে তাতে তোমাদের প্রতিনিধিত্ব দিয়েছেন। যেন তিনি দেখতে পারেন তোমরা কিরূপ আমল করো।" (মুসলিম)

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ- ترمذی-

"প্রত্যেক জাতির জন্য একটি ফিতনা (পরীক্ষার বস্তু) আছে। আমার উম্মতের ফিতনা হচ্ছে সম্পদ।" (তিরমিযি)

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا- وَتَمَنَّى عَلَى اللّٰهِ- ترمذی-

"বুদ্ধিমান- জ্ঞানী সেই ব্যক্তি, যে আত্মসমালোচনা করলো এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য আমল করলো। আর দুর্বল কাপুরুষ সে ব্যক্তি, যে তার নফসকে খাহেশ ও কামনা-বাসনার অনুসারী করে দিয়েছে। অথচ আল্লাহ্র অনুগ্রহের আশা করে বসে আছে।" (তিরমিযি)

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

اِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِينَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ط - الحديد-

"জেনে রাখো! দুনিয়ার জীবনটা হচ্ছে একটি খেলা-মন ভুলানোর উপায় এবং বাহ্যিক চাকচিক্য মাত্র, তোমাদের পরস্পরের গৌরব অহংকার আর ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততির দিক দিযে একে অপরের চেয়ে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার চেষ্টা মাত্র।" (সূরা আল-হাদীদ)

সব কিছু জেনে বুঝেও যারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট হতে চায় তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্র ফরমান হচ্ছেঃ

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۝ الشورى.

"যদি কেউ পরকালীন ফসল চায় তার ফসল আমরা বৃদ্ধি করে দেই। আর যে লোক দুনিয়ায়ই তার ফসল পেতে চায় তাকে আমরা দুনিয়া হতেই দান করি। কিন্তু পরকালে তার কোন অংশই থাকবে না।" (সূরা আস-শুরা)

দুনিয়া সন্ধানী এবং আখিরাত সন্ধানীর মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্যের কথা হাদীসে বলা হয়েছে। তা হচ্ছে দুনিয়া সন্ধানী কখনো তৃপ্তি বা মানসিক প্রশান্তি পায় না পক্ষান্তরে আখিরাত সন্ধানী সর্বাবস্থায় তৃপ্তি এবং মানসিক প্রশান্তির সাথে থাকে।

শিক্ষাবলী

(১) দুনিয়া নশ্বর এবং আখিরাত অবিনশ্বর।

(২) দুনিয়ার মোহে আবিষ্ট হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

(৩) নির্দিষ্ট রিজিক আল্লাহ্ অবশ্যই প্রদান করবেন, কিন্তু মানুষের চেষ্টায় তার পরিমাণ বাড়ানো যায়না।

(৪) মানুষ যখন দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে তখন আল্লাহ্ তার স্বস্তি ও মানসিক প্রশান্তি ছিনিয়ে নেন।

(৫) পক্ষান্তরে যারা পরকালকে অগ্রাধিকার দিবে আল্লাহ্ তাদেরকে মানসিক প্রশান্তি দান করবেন। এবং সেই সাথে নির্দিষ্ট রিজিক ও তারা লাভ করবে।

(৬) পরকালের মুক্তি ও সাফল্য নির্ভর করে দুনিয়ার কর্মতৎপরতার উপর।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَنْ يَأْخُذُ عَنِّي هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ قُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا، فَقَالَ اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ - .مشكوة.

"হযরত আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত– একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেনঃ আমার এ কথা কে গ্রহণ করবে ও সেভাবে আমল করবে এবং যারা আমল করতে চায় তাদেরকে শিক্ষা দিবে? আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এজন্যে প্রস্তুত আছি, আমাকে বলুন।

রাসূল (সা) আমার হাত ধরলেন এবং এই পাঁচটি কথা বললেনঃ

(১) আল্লাহ্র নাফরমানী হতে বিরত থাকো সবচেয়ে বড়ো আবেদ হতে পারবে।

(২) আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য যতোটা রিজিক নির্ধারণ করেছেন তাতে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকো, সব থেকে বেশী অভাবমুক্ত হ'তে পারবে।

(৩) নিজ প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো, মু'মিন হতে পারবে।

(৪) নিজের জন্য যা পছন্দ করো অন্যের জন্যও তাই পছন্দ করো, তাহলে তুমি মুসলিম হবে।

(৫) বেশী হেসো না; বেশী হাসলে মানুষের হৃদয় মরে যায়।" (মিশকাত, যাদেরাহ)

শব্দার্থ

مَنْ يَّأْخُذُ -কে গ্রহণ করবে? هٰؤُلَاءِ -এ সমস্ত। اَلْكَلِمَاتُ -কথাগুলো। فَيَعْمَلُ -অতঃপর আমল করবে। اَوْ -অথবা। يُعَلِّمُ -শিক্ষা দিবে। قُلْتُ -আমি বললাম। اَنَا -আমি। فَاَخَذَ بِيَدِىْ -অতঃপর আমার হাত ধরলেন। فَعَدَّ -এবং বর্ণনা করলেন। خَمْسًا -পাঁচটি বিষয়ে। اِتَّقِ اللّٰهَ -আল্লাহ্‌কে ভয় করো। تَكُنْ -তুমি হতে পারবে। اَعْبَدَ النَّاسِ -মানুষের মধ্যে (বেশী) অভাবমুক্ত। اَحْسِنْ -সদ্ব্যবহার করো। جَارَكَ -তোমার প্রতিবেশী। اَحِبَّ لِلنَّاسِ -মানুষের জন্য পছন্দ করো। مَا -যা تُحِبُّ -তুমি পছন্দ করো। بِنَفْسِكَ -তোমার নিজের জন্য। تُكْثِرْ -বেশী। اَلضَّحِكُ -হাসা। تُمِيْتُ الْقَلْبَ -হৃদয়ের মৃত্যু হবে।

বর্ণনাকারীর (রাবীর) পরিচয়

আবু হুরাইরা (রা) মুসলিম জাহানে অতি পরিচিত একটি নাম। হিজরী সপ্তম সনে মুহাররম মাসে তিনি মদীনায় আগমন করেন। ইতোপূর্বে বিখ্যাত সাহাবী তুফাইল ইবনে আমর আদ্ দাওসীর হাতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম পূর্ব নাম ছিলো আবদে শাম্‌স বা অরুণ দাশ। রাসূলে আকরাম (সা) সে নাম পরিবর্তন করে আবদুর রহমান রাখেন।

আবু হুরাইরা তাঁর লকব বা উপাধি। একদিন নবী করীম (সা) দেখেন- তাঁর জামার আস্তিনের মধ্যে একটি বিড়ালের বাচ্চা খেলা করছে। একবার আস্তিনের ভিতর প্রবেশ করে আবার বাইরে বের হয়। এ ঘটনা দেখে তিনি কৌতুক করে ডাকলেনঃ 'হে আবু হুরাইরা'। (অর্থাৎ যে ছোট্ট বিড়ালের পিতা।) ব্যাস সেদিন থেকেই তিনি আবু হুরাইরা নামে পরিচিত হলেন। মাত্র সাড়ে তিন বৎসর তিনি নবী করীম (সা)এর সাহচর্য পান, তবু হযরত আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক সর্বাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে এতো বেশী হাদীস বর্ণনার ব্যাপারটি অনেকে সন্দেহের

চোখে দেখতো। তাই তিনি বলেনঃ 'তোমরা হয়তো মনে করেছো আমি খুব বেশী হাদীস বর্ণনা করি। আমি ছিলাম রিক্ত হস্ত-দরিদ্র। পেটে পাথর বেঁধে সর্বদা রাসুলে আকরাম (সা) এর সাহচর্যে কাটাতাম। আর মুহাজিরগণ ব্যস্ত থাকতো ব্যবসা বানিজ্য নিয়ে এবং আনসারগণ ব্যস্ত থাকতো ধন সম্পদ রক্ষনা বেক্ষনে।'

চরম দারিদ্র ও দুরাবস্থার মধ্যে আবু হুরাইরাকে বেশী দিন থাকতে হয়নি। নবী করীম (সা) এর ওফাতের পর চতুর্দিকে হতে প্রবাহমান গতিতে গণিমতের মাল মুসলমানদের হাতে আসতে থাকে। তখন আবু হুরাইরা (রা) বাড়ি, ভূ-সম্পত্তি, স্ত্রী ও সন্তান সবকিছুরই অধিকারী হন।

হযরত আবু হুরাইরা ছিলেন জ্ঞান সমুদ্রের অথৈ জল। আল্লাহুর রাসূল (সা) নিজেই বলেছেনঃ 'আবুহুরাইরা জ্ঞানের আধার।' (বুখারী)। জ্ঞানের এ চলন্ত বিশ্বকোষ হিজরী ৫৯ সনে ৭৮ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করে মহান স্রষ্টার সান্নিধ্যে চলে যান। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ৫৩৭৪ টি।

গুরুত্ব

উল্লেখিত হাদীসটিতে মাত্র পাঁচটি কথা বলা হয়েছে। কথা কয়টি হয়তোবা ছোট কিন্তু তার তাৎপর্য অনেক। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ চিত্র অংকিত হয়েছে ছোট্ট এ হাদীসটিতে। এ হাদীসটি জীবনে বাস্তবায়ন করাই হচ্ছে ইসলামকে বাস্তবায়ন করা বা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। নবী করীম (সা) যে সমস্ত হাদীস সংক্ষিপ্ত ভাষায় পূর্ণ ইসলামের চিত্র অংকিত করেছেন এ হাদীসটি তার অন্যতম। যদি কেউ মনে করে যে, সে একমাত্র এ হাদীসের উপরই আমল করবে তবে তার নাজাতের জন্য এ হাদীসটিই যথেষ্ট। বস্তুত এ হাদীসের গুরুত্ব লিখে শেষ করা যাবে না।

বর্ণনার সময়কাল

সম্ভবত এ হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ (সা) ৮ম হতে ১০ম হিজরীর মধ্যে কোন এক সময় বর্ণনা করে থাকবেন। কেননা আমরা সবাই জানি হযরত আবু হুরাইরা (রা) সপ্তম হিজরীর শেষ দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাই এর আগে তো এ হাদীসটি বর্ণনা করার প্রশ্নই ওঠেনা। তাছাড়া গভীরভাবে হাদীসমূহ অধ্যয়ন করলে দেখা যায় মক্কা বিজয়ের পর হতে ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত এ সময়ের মধ্যেই

ইসলামের ব্যাখ্যায় সংক্ষিপ্ত ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং মর্মস্পর্শী হাদীসমূহ নবী করীম (সা) বেশী বর্ণনা করেছেন। অত্র হাদীসটি তার মধ্যে একটি। আর এটি তো ঐতিহাসিক সত্য যে, হিজরী ৮ম সনে মক্কা বিজয় হয়েছে।

ব্যাখ্যা

(১) আবেদ (عَابِدٌ) শব্দটি عِبَادَةٌ -(ইবাদতুন) শব্দ হতে গঠিত হয়েছে। عَابِدٌ -কর্তৃকারক। عِبَادَةٌ -শব্দের অর্থ হচ্ছে গোলামী, দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী, আরাধনা ইত্যাদি। আর عَابِدٌ -শব্দের অর্থ হচ্ছে, গোলাম, দাস, অনুগত, আরাধনাকারী, ইবাদাতকারী।

কুরআন ও সুন্নায় বলা হয়েছে- আল্লাহ্ প্রদত্ত সীমার মধ্যে যারা অবস্থান করে তারা মু'মিন এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত সীমা যারা লংঘন করে তারা কাফের। আল্লাহ্র নাফরমানী অর্থ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল প্রদত্ত সীমা অতিক্রম করে চলা[১] আল্লাহ্র ইবাদাত বা আনুগত্যের দু'টি দিক আছে একটি ইতিবাচক অপরটি নেতিবাচক।

ইতিবাচক (Positive) দিকগুলো হচ্ছে আল্লাহ্র আদেশসমূহ যা আল কুরআন ও রাসূল (সা) এর সুন্নায় বিদ্যমান। তার প্রতিটি আদেশকে বিনা দ্বিধায় মানা এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপন করার নামই হচ্ছে ইবাদত বা আনুগত্য। এই কথাগুলোই আল্লাহ্র ভাষায় বলা হয়েছে এভাবে।

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ

وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করে দেয় এবং কার্যত সৎকার্যশীল হয়, সে বাস্তবিকই ভরসার যোগ্য একটি আশ্রয় শক্ত করে ধরলো। আর সব

(১) ইবাদাত সংক্রান্ত বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন- সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (র) এর 'ইসলামের ৪টি মৌলিক পরিভাষা' ও 'নামায রোযার হাকিকত' এর ইবাদাত অংশ।

ব্যাপারেই চূড়ান্ত ফয়সালা আল্লাহ্‌র হাতে নিবদ্ধ। (সূরা লোকমানঃ২২)

আর নেতিবাচক (Negative) দিকগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিষেধসমূহ। যা আল কুরআন ও রাসূল (সা) এর সুন্নায় বিদ্যমান।

প্রতিটি ইতিবাচক দিক বা আদেশসমূহ মানা যেমন অবশ্য কর্তব্য (ফরজ)। ঠিক তেমনিভাবে প্রতিটি নেতিবাচক দিক বা নিষেধসমূহ মানাও অবশ্য কর্তব্য (ফরজ)। নিষেধসমূহকে ইসলামের সীমা বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র একটি আদেশ মানলে যতোটুকু সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায় ঠিক তেমনি একটি নিষেধ হ'তে বিরত থাকার বিনিময়েও ততোটুকু সওয়াব পাওয়া যাবে। আর যদি নিষেধসমূহ না মানা হয় তবে ইতিবাচক (Positive) সমস্ত কাজই নিষ্ফল হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ؗ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

যে ব্যক্তিই ঈমানের নীতি অনুযায়ী চলতে অস্বীকার করবে তার জীবনের সমস্ত (ভালো) কাজ নিস্ফল হয়ে যাবে এবং পরকালে সে দেউলিয়াদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা আল মায়েদাঃ ৫)

কাজেই দেখা যাচ্ছে- আল্লাহ্‌র নাফরমানী থেকে বাঁচা বা ইসলামের সীমা লংঘন না করা, এর চেয়ে বড়ো কোন ইবাদাতই হতে পারে না। কেননা যদি আল্লাহ্‌র নাফরমানী না করে সীমার ভিতরে অবস্থান করা যায় তবে আদেশসমূহ মানাও তার জন্য খুব সহজ হয়ে যায়। এ কথাগুলোই নবী করীম (সা) সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ একটি বাক্যে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন।

(২) পৃথিবীতে যতো প্রাণী আছে তার প্রত্যেকের রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র। আবার প্রত্যেকের রিজিকের নিয়ন্ত্রকও হচ্ছেন আল্লাহ্। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

কতো জন্তু জানোয়ারই এমন আছে যারা নিজেদের রিজিক নিজেরা বহন করেনা। আল্লাহ্ই তাদের রিজিক দান করেন। আর তোমাদের রিজিক দাতাও তিনিই। তিনি সব কিছু জানেন এবং দেখেন। (সূরা আল আনকাবুতঃ ৬০)

অন্যত্র বলা হয়েছে-

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ۝ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ۝ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ۝

আমরা জমিনকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পাহাড় গেড়ে দিয়েছি এবং সব জাতের উদ্ভিদ যথাযথভাবে মাপা ঝোপা পরিমাণে সৃষ্টি করেছি। আর সেখানে জীবিকার উপকরণ সংগ্রহ করে দিয়েছি তোমাদের জন্য এবং সেই সব মাখলুকের জন্যওঃ যাদের রিজিকদাতা তোমরা নও। কোন জিনিসই এমন নেই, যার সম্পদের স্তুপ আমাদের নিকট বর্তমান নেই। (সূরা আল হিজরঃ ১৯-২১)

হাদীসে বলা হয়েছে-

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ-

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেনঃ হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো ও তার নাফরমানি থেকে বিরত থাকো; জীবিকা সন্ধানে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করোনা। কোন ব্যক্তি তার জন্য নির্ধারিত সমগ্র রিজিক না পাওয়া পর্যন্ত মরবে না। যদিও তা পেতে কিছুটা বিলম্ব হয়। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় করো এবং রিজিক সন্ধানে উত্তম পন্থা অবলম্বন করো। হালালভাবে জীবিকা

অর্জন করো এবং হারামের ধারে কাছেও যেও না। (ইবনে মাজা, যাদেরাহ)

কুরআন সুন্নার আলোকে রিজিক বা জীবিকা বলা হয় ঐ বস্তুকে যা আল্লাহ্ তার সৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, সৃষ্টিকুল তা স্বীয় চেষ্টার মাধ্যমে সংগ্রহ করে নেয়। অন্য কথায় বৈধ উপায়ে পরিশ্রমের মাধ্যমে বান্দাহ্ যা উপার্জন করে তাই রিজিক। অবৈধ কোন পন্থায় উপার্জিত সম্পদ রিজিকের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা তার সাথে কারো না কারো হক জড়িত থাকে। কাজেই অপরের হক নষ্ট করে উপার্জিত সম্পদ রিজিক হতে পারে না।

তাছাড়া আল্লাহ্ যার জন্য যতোটুকু রিজিক নির্দিষ্ট করে রেখেছেন ততোটুকু সে অবশ্যই পাবে এবং ভোগ করতে পারবে। তার চেয়ে সামান্য পরিমাণও বেশী ভোগ করার বা পাবার কোন ক্ষমতা তার নেই। যেমন কোন ব্যক্তি অগাধ ধন সম্পদের মালিক কিন্তু সে ব্লাড প্রেশার বা ডায়াবেটিকের মতো জটিল ব্যধির শিকার। দেখা যায় এতো সম্পদের অধিকারী হয়েও তার নিজের জন্য যে খাদ্য বরাদ্দ তা খুবই সামান্য বা নগণ্য। এখানে তার মন চাইলেও বরাদ্দ বাড়ানোর ক্ষমতা তার নেই। অথবা একজন ধনকুবের অপারেশনকৃত রোগী। ডাক্তার বললো, চিকন চালের মন্ড হচ্ছে তার খাদ্য। সে কোন অবস্থাতেই অন্য খাবার খেতে পারে না। এখানেও আমরা দেখতে পাই আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত রিজিকের বেশী সে লাভ করতে পারছে না।

তাই সর্বদা সবকিছু বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করে রিজিক লাভের চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করে তার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে রিজিক লাভের চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এখন যে ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তের উপর অটল থাকবে তার অভাব অনটন ও মানসিক অস্থিরতা থাকতে পারে না।

(৩) কুরআন ও সুন্নায় প্রতিবেশীর হক সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রতিবেশী বলা হয়, যে কাছাকাছি বা পাশাপাশি বসবাস করে কিন্তু নিকটাত্মীয় নয়। সে মুসলিম না হয়ে অমুসলিমও হতে পারে তাতে কিছু যায় আসে না। কুরআনে অথবা হাদীসে প্রতিবেশীর মুসলিম হওয়ার ব্যাপারে কোন শর্তারোপ করা হয়নি। বলতে গেলে মুয়ামেলাতী জেন্দেগী প্রথম প্রতিবেশীকে দিয়েই শুরু হয়। ইসলাম চায় গোটা সমাজ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হোক। তাই প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্কের ব্যাপারে এতো বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কেননা গোটা

সমাজে আমরা প্রত্যেকেই কারো না কারো প্রতিবেশী হিসাবেই অবস্থান করি। আর যদি সবাই ইসলামী নীতিতে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য গড়ে তুলতে পারি তবে সম্পূর্ণ সমাজই একটা বৃহত্তর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর বিপরীতধর্মী কাজ করা কুফরীর শামিল। অন্য কথায় সমাজে শান্তি-শৃংখলা বিনষ্টকারী মুমিন নয়। নবী করীম (সা) বলেনঃ

وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِى لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ـ

আল্লাহ্‌র কসম! সে মু'মিন নয়। আল্লাহ্‌র কসম! সে মু'মিন নয়। আল্লাহ্‌র কসম! সে মু'মিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে সে? হুজুর বললেন, সেই ব্যক্তি যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হ'তে নিরাপদ নয়। (বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) "সে ব্যক্তি মুমিন নয়" শুধু একথা বলেই শেষ করেননি। অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঐ ব্যক্তি জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না।

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ـ

যার প্রতিবেশী তার থেকে নিরাপদ নয় সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম)

প্রতিবেশীর সাথে শুধু ভালো আচরণ করাই যথেষ্ট নয়। সুখে-দুঃখে তার খোঁজখবর নেয়াও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ আমি রাসূল (সা) কে একথা বলতে শুনেছি যে-

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِى يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ ـ

যে ব্যক্তি তৃপ্তি সহকারে পেটপুরে খায় অথচ পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে ঈমানদার নয়। (মিশকাত)

অন্য এক হাদীসে আছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَاَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ ـ

আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেছেনঃ যখন তুমি তরকারী রান্না করবে তখন তাতে কিছু পানি বেশী দিও, যেন তুমি তোমার প্রতিবেশীর খবর নিতে পারো। (মুসলিম)

(৪) অন্য হাদীসে আছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ ـ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ যে মহান সত্ত্বার হাতে আমার প্রাণ, আমি তার কসম করে বলছি- কোন ব্যক্তিই প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না যতোক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা তার অপর ভাইয়ের জন্য পছন্দ করবে। (বুখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তি যেমন চায় তার জান-মাল, ইজ্জৎ- আব্রু অপরের অনিষ্ট হতে নিরাপদ থাকুক। সমাজে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি, মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হোক। সবাই তার সাথে সততাপূর্ণ ব্যবহার করুক। তার সাথে যেন কেউ ধোকাবাজী না করে ইত্যাদি। ঠিক তেমনিভাবে অপর ভাইয়ের ব্যাপারেও যেন তার তরফ হতে ঐ সমস্ত বস্তুর গ্যারান্টি থাকে এটিই ইসলামের দাবী। কেননা নবী করীম (সা) বলেন

بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ ـ

কোন ব্যক্তির গুনাহ্গার হবার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করে। (মুসলিম)

مَلْعُوْنٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا اَوْ مَكَرَ بِهٖ ـ

যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের ক্ষতি সাধন করে অথবা কারো সঙ্গে ধোকাবাজি করে, সে অভিশপ্ত। (তিরমিযি)

কোন মুসলমানকে যদি কোন ভাবে কষ্ট দেয়া হয় অথবা তার ক্ষতি সাধন করা হয় তবে ঐ মুসলমানের পক্ষ হয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ বাদী হয়ে যান।

مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللّٰهُ بِهِ۔

যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ক্ষতি সাধন করে আল্লাহ্ তার ক্ষতি করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলো আল্লাহ্ তাকে কষ্ট দিবেন। (তিরমিযি, ইবনে মাজা)

তাই নবী করীম (সা) বলেছেনঃ

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ۔

(প্রকৃত) মুসলিম হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত থেকে সমস্ত মুসলমান নিরাপদ। (বুখারী, মুসলিম)

মুসলমানের গোটা সমাজকে যদি দেহ হিসেবে কল্পনা করা হয় তবে ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্য হচ্ছে তার প্রাণ। এ জন্যেই পরস্পর সহানুভূতি, সহমর্মিতা ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামে এতো জোর দেয়া হয়েছে।

(৫) প্রাণীকুলের মধ্যে প্রফুল্ল অবস্থায় একমাত্র মানুষই হাসির মাধ্যমে নিজের উৎফুল্লতাকে বাইরে প্রকাশ করে থাকে। এটি মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য। হাসি যদিও একটি ভালো অভ্যাস তবু তার একটি বৈধ সীমা আছে। সর্বদা খিলখিল করে হাসা অথবা অট্টহাসি দেয়া উচিৎ নয়। নবী করীম (সা) সর্বদা মুচকি হাসি হাসতেন।

অত্র হাদীসে হাসি বলতে সর্বদা আমোদ প্রমোদে লিপ্ত থাকা বুঝানো হয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি সর্বদা আমোদে মশগুল থাকে তার অন্তর কঠিন হয়ে যায়, ফলে সে আখিরাতের কথা ভুলে যায়। যেহেতু মানুষকে এক অনিশ্চত যাত্রা পথের পথিক বানানো হয়েছে। ফেলা হয়েছে কঠিন পরীক্ষায়। সে জানে না পরীক্ষার ফলাফল তার অনুকূলে না প্রতিকূলে যাবে। তাই সর্বদা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং সর্বশক্তিমান মেহেরবান আল্লাহ্র

রহমতের জন্য দু'আ করতে হবে। এ দায়িত্বানুভূতি যার মধ্যে প্রবল, তাকে কখনো বেশী উৎফুল্ল দেখা যাবে না। আল্লাহ্ও পরামর্শ দিচ্ছেন- "তাদের কম হাসা এবং বেশী কাঁদা উচিত"। পরকালে মুক্তি প্রাপ্তদের যে বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে নম্র ও বিনয়ী হওয়া এবং নির্জনে চোখের পানি ফেলাও অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তথ্য সূত্র

১। তাফহীমুল কুরআন- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ)
২। হাদীস শরীফ- মাওঃ আবদুর রহীম (রহ)
৩। যাদেরাহ- মাওঃ জলীল আহসান নদভী
৪। সহীহ্ আল বুখারী
৫। সহীহ্ আল মুসলিম
৬। মিশকাত শরীফ

পবিত্রতা, সদকা ও সবর

عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلٰوةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَّكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا۔ -مشكوٰة بحواله مسلم-

'হযরত আবু মালেক আশয়ারী (রা)হ'তে বর্ণিত—নবী করীম (সা) বলেছেনঃ তাহারাত (পবিত্রতা) হচ্ছে ঈমানের অর্ধেক। আলহামদু লিল্লাহ্ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর) মানুষের আমলের পাল্লা পূর্ণ করে এবং সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদু লিল্লাহ (আল্লাহ্ পবিত্রতম সত্তা এবং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁর) আসমান এবং জমিনের মধ্যবর্তী যা আছে তা পরিপূর্ণ করে দেয়। নামায আলোক স্বরূপ। দান—সাদকা হচ্ছে (দাতার ঈমানের) দলিল। সবর হচ্ছে জ্যোতি। কুরআন হচ্ছে তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষ ভোরে উঠে আপন আত্মার সাথে ক্রয়—বিক্রয় করে। আত্মা হয় তাকে মুক্ত করে, না হয় তাকে ধ্বংস করে।' (মুসলিম, মিশকাত)

শব্দার্থ

اَلطُّهُوْرُ—পবিত্রতা। شَطْر—অর্ধেক অংশ। تَمْلَأُ—পূর্ণ করে। مِيْزَان—নিক্তি। بَيْنَ—দুয়ের মধ্যে। سَمٰوٰتُ—আসমানসমূহ। اَلْاَرْضُ—জমিন, পৃথিবী। اَلصَّلٰوةُ—নামায। نُوْر—আলো। اَلصَّدَقَةُ—দান—সদকা। بُرْهَانٌ—দলিল, প্রমাণ। اَلصَّبْرُ—ধৈর্য্য। ضِيَاء—জ্যোতি। حُجَّةٌ—দলিল, প্রমাণ। لَكَ—তোমার। كُلُّ النَّاسِ—সমস্ত মানুষ। يَغْدُوْا—প্রভাত করে। فَبَايِعٌ—অতঃপর

ক্রয়-বিক্রয় করে। نَفْسَهُ -নিজের আত্মার সাথে। مُعْتِقُهَا -তার মুক্তিদানকারী। أَوْ -অথবা। مُوْبِقُهَا - তার ধ্বংসকারী।

হাদীসটির গুরুত্ব

পূর্ববর্তী হাদীসে যেমন বলা হয়েছে- "সমস্ত কাজের বিনিময় তার নিয়ত অনুযায়ী হয়ে থাকে" তেমনিভাবে নিয়তের সাথে সাথে দেহ ও মনের পবিত্রতা ঈমান এবং আমলে সালেহ্‌র প্রধান ও অন্যতম শর্ত। তাছাড়া জিকির, সালাত, সাদাকাত, সবর ও কুরআনের ভূমিকা কতটুকু তা সুন্দরভাবে অত্র হাদীসে বিধৃত হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, ইবাদাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রসঙ্গে এ হাদীসে যেভাবে একাধিক্রমে বর্ণিত হয়েছে তা অন্যান্য হাদীসে পরিলক্ষিত হয় না। এমনকি মিশকাত শরীফের সংকলক তিনিও উক্ত হাদীসটিকে 'কিতাবুত্তাহারাত" অধ্যায়ের সর্ব প্রথম স্থান দিয়েছেন। সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে বুখারী, হুমাইদী ও দারেমী স্ব-স্ব গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা

-- শব্দের অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা। ইসলামে দেহ ও মনের পবিত্রতাকে একত্রে তাহারাত বলা হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি নির্ধাণ করা হয়েছে। যেমন দৈহিক পবিত্রতা অর্জনের জন্য ওযু গোসল এবং আত্মিক পবিত্রতা অর্জনের জন্য জিকির, সবর, সালাত ইত্যাদি। আত্মিক পবিত্রতাকে ইহসান এবং তাযকীয়ায়ে নফস বলা হয়। তাহারাত বা পবিত্রতা প্রধানত দু'প্রকার। (১) তাহারাতে যাহেরী (২) তাহারাতে বাতেনী।

তাহারাতে যাহেরী

শরীর, পোশাক, স্থান ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার নাপাকী হতে পবিত্র রাখা।

---

(১) দারসে হাদীস ১ম খন্ড দ্রষ্টব্য।

তাহারাতে বাতেনীঃ ইসলামের পরিপন্থী আকীদাহ্ বিশ্বাস ও খারাপ চিন্তাধারা হতে আত্মাকে পবিত্র রাখা। যেমন- (ক) জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্কে ইলাহ্ মানা। অর্থাৎ আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে তার সবকিছুর সৃষ্টি কর্তা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্। তিনিই প্রতিপালক, মাবুদ, বিধানদাতা, জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দের মালিক। রিজিকের প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতা দানকারী। মহা পরাক্রমশালী রাজাধিরাজ। প্রাকৃতিক ও বিধিগত সার্বভৌম সত্তা।

وَهُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ اِلٰـهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰـهٌ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۝

"তিনিই মহান সত্তা যিনি আসমানেও ইলাহ্ এবং জমিনেও ইলাহ্। তিনি সর্বজ্ঞ ও মহা বিজ্ঞানী। (আয্ যুখরুফ)

وَمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰـهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰـهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ - مؤمنون-

"আর তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ইলাহ্ তার সাথে শরীক নেই। যদিই বা থাকতো তবে প্রত্যেক ইলাহ্ই তার সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেত। অতঃপর একে অপরের উপর চড়াও হতো। (সূরা আল মু'মিনুন)

(খ) আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকেই নিজের পৃষ্ঠপোষক কার্যসম্পাদনকারী, প্রয়োজন পূরণকারী, বিপদ দূরকারী, ফরিয়াদ শ্রবণকারী এবং সাহায্যদাতা ও রক্ষাকর্তা মনে করা যাবে না। কেননা আল্লাহ্ বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ - الاعراف-

আল্লাহ্কে ছাড়া তোমরা যাদেরকে (বিপদ মুক্তির জন্য) ডাকো, তারা তোমাদের মতোই (অক্ষম) বান্দা মাত্র। যদি তোমরা সত্যি মনে করো যে, তারা তোমাদেরকে বিপদ হতে মুক্তি দিতে পারে, তবে তাদেরকে তোমরা ডেকে

দেখো তো দেখি তারা কোন প্রত্যুত্তর দেয় কিনা? (সূরা আল আ'রাফ)

(গ) আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কোন কিছুরই ক্ষতি অথবা কল্যাণ করার কোন ক্ষমতা নেই। সুতরাং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় ও কারো উপর নির্ভর করা যাবে না।

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - انعام -

"আল্লাহ্ যদি তোমার কোন অপকার বা ক্ষতি করেন তবে তিনি ছাড়া আর কেউ তা দূর করতে পারে না। আবার তিনি যদি তোমার কোন উপকার বা কল্যাণ করতে চান তবে তাও তিনি করতে সক্ষম। কেননা তিনি তো সর্ব শক্তিমান। (সূরা আল আন'আম)

(ঘ) আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো নিকট কোন দু'আ বা প্রার্থনা করা যাবে না। এবং তাদের সুপারিশে আল্লাহ্র ফায়সালা পরিবর্তন হতে পারে এতখানি প্রভাবশালী বা শক্তিশালীও কেউ নেই। কারণ আল্লাহ্র রাজ্যে সকলেই ক্ষমতাহীন প্রজা মাত্র।

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ - يونس ١٠٦ -

"আল্লাহ্কে ছেড়ে এমন কোন সত্ত্বাকে ডেকো না। যারা না পারে তোমার কোন ক্ষতি করতে এবং না পারে কোন কল্যাণ করতে।" (সূরা ইউনুসঃ ১০৬)

"আল্লাহ্ ছাড়া আর এমন কে আছে যে বিপন্ন ব্যক্তির ডাকে সাড়া দিতে পারে এবং তার বিপদ দূর করতে সক্ষম?"

(ঙ) আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করা যাবে না। কারো উদ্দেশ্যে মানত মানা যাবে না। কারণ আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদাত (দাসত্ব-আনুগত্য ও উপাসনা) পাবার অধিকারী আর কেউ নেই। স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ- (البقرة)

"তোমরা যা কিছু খরচ করো অথবা মানত করো তার সব কিছুই আল্লাহ্ জানেন। বস্তুত জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা আল-বাকারা)

নবী করীম (সা) বলেনঃ

لَا تَنْذُرُوْا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا-

"তোমরা মানত মানবে না কেননা মানত মানুষের তাকদীরকে পরিবর্তন করতে পারে না।"

আল্লাহ্ বলেন-

وَقَضٰى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ- (سورة اسرى)

"তোমার প্রভূ এ ব্যাপারে ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদাত করা যাবে না।" (সূরা বনী ইসরাঈল)

(চ) আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে আইন প্রণেতা, বিধানদাতা মানা যাবে না এবং আল্লাহ্র আনুগত্য ও তার দেয়া আইন পালনের ক্ষেত্রে কোনরূপ টালবাহানার আশ্রয় নেয়া যাবে না। তাদের আইন কানুন প্রমাণের (কুরআন হাদীসের) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় এমন কোন আইন-কানুন বা বিধি নিষেধ মেনে নিতে অস্বীকার করতে হবে। আল্লাহ্ বলেনঃ

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ-

"সাবধান! সৃষ্টি যার আইন কানুনও চলবে তার"
অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ- (ال عمران)

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন বা বিধানের সন্ধান করবে, তা কখনো গ্রহণ করা হবে না।" (সূরা আলে-ইমরান)

আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ- (مائدة)

"যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না তারা কাফের"।

(ছ) বিশ্বের একমাত্র বাদশাহর (আল্লাহ্র) পক্ষ হতে বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা) এর মাধ্যমে একমাত্র নির্ভুল হিদায়াত ও আইন বিধান প্রেরিত হয়েছে এবং এ হিদায়াত ও আইন বিধান অনুযায়ী কাজ করে পূর্ণাঙ্গ বাস্তব নমুনা কায়েম করার জন্যই মুহাম্মদ (সা) কে নিযুক্ত করা হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াত ক'টি তার প্রমাণ। ইরশাদ হচ্ছেঃ

هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ (توبة، ٣٣، فتح، ٢٨، صف، ٩)

"তিনিই সেই সত্তা যিনি তার রাসূলকে হিদায়াত ও আনুগত্যের একমাত্র বিধান বা মতাদর্শ সহ পাঠিয়েছেন। যেন (রাসূল) তাকে (ঐ বিধানকে) সমস্ত মতাদর্শের বা বিধানের উপর বিজয়ী করতে পারেন।" (সূরা তওবাঃ৩৩ ফাতাহঃ২৮, ছফঃ ৯)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ- (احزاب)

"নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ হচ্ছে আল্লাহ্র রাসূলের আদর্শ।" (সূরা আল আহযাব)

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ـ (نساء)

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করলো সে যেন আল্লাহ্র আনুগত্য করলো।" (সূরা আন নিসা)

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ـ

"হে নবী লোকদের বলে দিন যে, তোমরা যদি আল্লাহ্র ভালোবাসা পেতে চাও তবে আমাকে অনুসরণ করো। তবেই আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। (সূরা আল বাকারা)

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্তসমূহে উপণীত হতে পারি।

(১) মানুষকে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ও নফসের কামনার অনুসরণ পরিত্যাগ করতে হবে এবং আল্লাহ্কে ইলাহ্ মেনে জীবনের সকল ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য করতে হবে।

(২) পৃথিবীর কোন বস্তুর উপরই নিজের কোন মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। এমনকি নিজের শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মানসিক ও দৈহিক শক্তি সামর্থ ইত্যাদির বেলায়ও না। সবকিছুকে আল্লাহ্র মালিকানাধীন ও তাঁর কাছ হতে প্রাপ্ত আমানত মনে করতে হবে।

(৩) সকল কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ, আকিদাহ্-বিশ্বাস ইত্যাদি সবকিছুর জন্যই আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের নিকট দায়ী থাকতে হবে।

(৪) জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই নিজের পছন্দ অপছন্দের উপর আল্লাহ্র পছন্দ অপছন্দকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(৫) জীবনের যাবতীয় চেষ্টা প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হতে হবে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি।

(৬) আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো বান্দাহ্ বা দাস হওয়া যাবে না এবং নিজের নফসের খাহেশ ও দেশে প্রচলিত প্রথাসমূহ অন্ধভাবে অনুসরণ করা যাবে না।

(৭) আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেও সাহায্যকারী, বিপদ হতে উদ্ধারকারী ও অনিষ্টকারী বলে স্বীকার করা যাবেনা।

(৮) আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নিকট কোন দু'আ অথবা সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে না।

(৯) স্বীয় নৈতিক চরিত্র আচার-ব্যবহার এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড, তথা জীবনের সকল সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র আল্লাহ্র দেয়া বিধান বা শরীয়ত মোতাবেক সমাধান করতে হবে।

(১০) ইসলামী চর্চা ছাড়া যতো রকম বিপরীত চর্চা আছে তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে।

(১১) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট হতে যে হিদায়াত ও আইন বিধান প্রামান্য সূত্রে পাওয়া যাবে তা দ্বিধাহীন ও অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করতে হবে।

(১২) তার উপস্থাপিত আদর্শ ও প্রদত্ত শিক্ষার বিপরীত যা কিছু আছে তা সবই ভুল এবং অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

(১৩) মানুষের জীবনের প্রতিটি কাজ কুরআন ও সুন্নাহ্ মোতাবেক সম্পাদন করতে হবে এবং কুরআন সুন্নাহ্কে নির্ভুল জ্ঞানের উৎস মনে করতে হবে।

(১৪) আল্লাহ্র রাসূল (সা) ছাড়া আর কারো স্বয়ংসম্পূর্ণ নেতৃত্ব মানা যাবে না। কেননা অন্য কারো আনুগত্য হবে আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহ্র অধীন।

(১৫) রাসূল (সা) এর জীবন চরিতকে কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা এবং সকল ব্যাপারে সত্যের একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে মনতে হবে। আর প্রত্যেককেই এ মাপ কাঠিতে যাচাই ও পরখ করে যে যে ধরনের মর্যাদার অধিকারী তাকে সে মর্যাদা দান করতে হবে।

(১৬) হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র সর্বশেষ রাসূল ও নবী।

(১৭) মুহাম্মদ (সা) এর নবুয়্যতের পর কোন ব্যক্তির এমন কোন মর্যাদা মেনে নেয়া যাবে না, যার আনুগত্য করার অথবা না করার সাথে ঈমান ও কুফরের ফায়সালা হতে পারে।

(১৮) তাঁর মাধ্যমে যে বিধান দেয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ নির্ভুল, পরিপূর্ণ ও চিরন্তনী।

(১৯) পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিকে এমনভাবে ভক্তি করা অথবা ভালোবাসা যাবে না, যে রাসূল (সা) এর সাথে ভক্তি বা ভালোবাসার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে।

(২০) এমন একটি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করতে হবে যাতে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আইন-বিধান রচনার মৌলিক অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্যই স্বীকৃত ও ঘোষিত হয়।

উপরোক্ত আলোচনা হতে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, ইসলামে শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতার গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্যই হাদীসে পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধেক বলা হয়েছে।

হাদীসে বলা হয়েছে-আলহামদু লিল্লাহ্ বললে আমলের পাল্লা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এখানে প্রশ্ন আসে সওয়াবের আকার আকৃতি নিয়ে। কেননা কোথাও কোথাও সওয়াবের সংখ্যার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আবার এখানে পরিমাণের কথা বলা হয়েছে। আরবী শব্দ হচ্ছে مِيزَانٌ আরবী ভাষায় مِيزَانٌ (মিযান) বলতে সকল প্রকার পরিমাপন যন্ত্রকেই বুঝায়। আমরা পৃথিবীতে বিভিন্ন পরিমাপের ক্ষেত্রে বিভিন্ন যন্ত্র এবং ভিন্ন ভিন্ন একক ব্যবহার করি। যেমন বিদ্যুৎ পরিমাপের জন্য এম্পিয়ার মিটার বা ভোল্ট মিটার, বায়ুচাপ মাপার জন্য ব্যারোমিটার, আর্দ্রতা - উষ্ণতা পরিমাপের জন্য হাইড্রোমিটার, দেহের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য থার্মোমিটার ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহার করে থাকি। সৃষ্ট জীবের পক্ষেই যদি অদৃশ্য বস্তুর পরিমাপ সম্ভব হয় তবে বিশ্ব স্রষ্টা সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ কেন পারবেন না অদৃশ্য বস্তুর পরিমাপ করতে? আল্লাহ্ সেদিন কোন ধরনের একক বা কোন ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করে বান্দার আমল পরিমাপ করবেন তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। তবে একথা নিশ্চিত বলা যায় যে, সে দিনের পরিমাপন যন্ত্র এবং পরিমাপাংক প্রতিটি মানুষই বুঝতে সক্ষম হবে।

আলোচ্য হাদীসে নামাযকে নূর বা আলো হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারেঃ

(১) অন্ধকার কবরে নামায মু'মিনের জন্য আলোক বর্তিকারূপে কাজ করবে। সেদিকে ইঙ্গিত করে নামাযকে নূর বা আলো বলা হয়েছে।

(২) কিয়ামতের ময়দানে মানুষ যখন চতুর্দিকে অন্ধকারে পথ খুঁজতে থাকবে তখন মু'মিনের নামায তাকে আলোর সন্ধান দিবে। যেমন কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেনঃ

يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ - (الحديد)

"মু'মিনগণের নূর তাদের সম্মুখে ও ডানে আন্দোলিত হতে থাকবে"। (সূরা আল-হাদীদ)

(৩) জাগতিক ক্ষেত্রে যেমন অন্ধকারে পথ চলার সম্বল আলো। আলো সঙ্গে থাকা অবস্থায় অন্ধকার রাস্তায় পথহারা হওয়ার আশংকা থাকে না, তেমনি নামাযের দ্বারাও মানুষ আধ্যাত্মিক পথ চলার ক্ষেত্রে বিপথগামী হওয়ার আশংকা থাকে না। অন্যায় ও পাপাচার হতে বেঁচে থাকা তার জন্য সহজ হয়। যেমন আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ -

"নিশ্চয়ই নামায অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে বিরত রাখে।" এ জন্যই নামাযকে রূপক অর্থে নূর বা আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

(৪) অদ্রুপ এ নূর বলতে কিয়ামতের ময়দানে নামাযীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দৃশ্যমান নূর ও ঔজ্জ্বল্যও অর্থ হতে পারে। যা নামাযী ব্যক্তির অঙ্গসমূহে দেখা যাবে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছেঃ-

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ -

"তাদের মুখমন্ডলে সিজদার আলামত সমূহ তাদের পরিচয় বহন করবে।"[১] (সূরা আল ফাতহ্)

সাদকাকে দলীল রূপে আখ্যায়িত করার তাৎপর্য এই যে,

(১) ব্যক্তি তার কষ্টার্জিত সম্পদ আল্লাহ্র পথে খরচ করার দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, সে একজন মু'মিন ব্যক্তি। যদি তার ঈমান না থাকতো তবে সে আল্লাহ্র পথে সম্পদ ব্যয় করতো না বরং সম্পদের মোহে পড়ে কৃপণতা প্রদর্শন করতো। সুতরাং ঈমানের পক্ষে দলিল বা প্রমাণ স্বরূপ বলেই সাদকাকে দলিল বলা হয়েছে।

---

(১) তানবীরুল মেশকাত পৃ-৩০৩

(২) কিংবা এর অর্থ সাদকা দান করা আল্লাহ্‌র প্রতি তার ভালোবাসার দলিল। কারণ যদি তার অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রেম ভালোবাসা না থাকতো তবে সে নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ আল্লাহ্‌র আদেশে তার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে ব্যয় করতো না।

(৩) অথবা এর অর্থ এটিও হতে পারে যে, বান্দাহ্ কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্‌র প্রশ্নের উত্তরে তার সম্পদ সে যে সৎপথে ব্যয় করেছে এ দাবীর সমর্থনে সাদকাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে এবং বলবে আমি আমার সম্পদকে সৎপথে ব্যয় করেছি।[২]

সবর বা ধৈর্য্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইমাম নববী (রহ) বলেন- "সবরের অর্থ হলো আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগীতে ধৈর্য্যধারণ করা। তাঁর অবাধ্যাচরণ হতে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে নফস ও শয়তানের কুমন্ত্রনার মোকাবেলায় ধৈর্য্যের পরিচয় দেয়া। জাগতিক দুঃখ-কষ্ট, আপদ-বিপদ ও যাবতীয় প্রতিকূলতায় ধৈর্য্য ধারণ করা"[৩]

নামাযের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে نُوْرٌ বা আলো। এবং সবর বা ধৈর্য্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে ضِيَاءٌ বা জ্যোতি। আল্লামা জামাখশারী (রহ) এর মতে نُوْرٌ ও ضِيَاءٌ এর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। যেমন সাধারণ আলোকেই نُوْرٌ বলা হয়। পক্ষান্তরে অধিকতর প্রখর আলোকে বলা হয় ضِيَاءٌ । এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, নামায সমস্ত ইবাদাতের মুল হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য نُوْرٌ এবং সবরের জন্য প্রখর ঔজ্জ্বল্যের অর্থদানকারী ضِيَاءٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর হেতু কি? তার উত্তর হচ্ছে এই যে, এখানে সবর শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শরীয়তের যাবতীয় বিধি-নিষেধ পালনে ধৈর্য্যধারণ এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই সমস্ত বিধিনিষেধ মেনে চলার দ্বারা অর্জিত জ্যোতি একটি মাত্র বিধান নামায পালন করার তুলনায় অধিক হওয়া অযৌক্তিক কিছুই নয়।

মতান্তরে কেউ কেউ সবর দ্বারা সাওম বা রোযা অর্থ করেছেন। আর যদি সবর صَبْرٌ দ্বারা রোযা অর্থ হয় তবে সে ক্ষেত্রে নামাযের তুলনায় রোযার জ্যোতি অধিক হওয়ার তাৎপর্য হচ্ছে, রোযাদার ব্যক্তি দীর্ঘ সময় ধরে পানাহার ও

---

(২) তানবীরুল মেশকাত পৃঃ ৩০৩
(৩) তানবীরুল মেশকাত পৃঃ ৩০৩

জৈবিক চাহিদা পুরণ হতে বিরত থেকে, তাকে যে পরিমাণ কষ্ট সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হয় নামাযের কষ্ট সেই তুলনায় কম বিধায় রোযার ক্ষেত্রে অধিক জ্যোতি হওয়া সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।

কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে দলিল বলতে বুঝানো হয়েছে যে, যদি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কুরআনের অনুশাসন মেনে চলা হয় তবে কুরআন তার জন্য পরকালিন মুক্তির ব্যাপারে দলিল হবে। আর যদি এর বিপরীত কাজ করা হয় অর্থাৎ কুরআনী আইন মেনে না চলা হয় তবে বিপক্ষে দলিল হবে। এতটুকুই জাহান্নামী হওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। এ অর্থেই لَكَ তোমার পক্ষে এবং عَلَيْكَ তোমার বিপক্ষে শব্দ দু'টি ব্যবহার করা হয়েছে।

আপন আত্মার ক্রয়-বিক্রয় রূপকার্থে বর্ণিত হয়েছে। তাৎপর্য হচ্ছে-সকালে উঠে মানুষ কি সিদ্ধান্ত নিবে? কুরআন ও সুন্নাহ্ মোতাবেক দিনটি অতিবাহিত করবে না নিজের খেয়াল খুশী মতো? সে সিদ্ধান্ত মানুষের উপর। যেহেতু অনেকগুলো দিনের সমষ্টি তার জীবন, তাই প্রতি দিনের কর্মফলের সমষ্টির ভিত্তিতেই হবে তার পরকালের ফায়সালা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي وَإِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَالِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ - (مسلم، زاد راه)

"হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) বর্ণনা করেন– নবী করীম (সা) বলেছেনঃ বান্দাহ্ বলে এ আমার সম্পদ, এ আমার সম্পদ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্পদে তার মাত্র তিনটি অংশ আছে। যা সে খেয়েছে তা শেষ হয়ে গেছে। যা সে পরেছে তাও লুপ্ত হয়ে গেছে। যা আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করেছে শুধুমাত্র সেটুকুই আল্লাহ্র নিকট জমা রয়েছে। এছাড়া আর যা কিছু আছে তা তার নয়। তা সে নিজের উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যাবে এবং নিজে খালি হাতে চলে যাবে।" (মুসলিম)

•

শব্দার্থ

اَلْعَبْدُ –বান্দাহ্। مَالِي –আমার সম্পদ। اِنَّمَا لَه –নিশ্চয়ই তার জন্য। مِنْ –হ'তে। مَالِه –তার মালের। ثَلَاثٌ –তিনটি অংশ। مَا اَكَلَ –যা খেয়েছে। فَاَفْنٰى –তা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। اَوْ –অথবা। لَبِسَ –সে পরেছে। فَاَبْلٰى –তা শেষ হয়ে গিয়েছে। اَعْطٰى –সে দান করেছে। فَاَقْتَنٰى –তা সঞ্চয় করেছে। سِوٰى –ছাড়া, ব্যতীত। ذٰلِكَ –ঐ। فَ –অতঃপর। هُوَ –সে। ذَاهِبٌ –যাত্রী। تَارِكُه –সে ত্যাগকারী। لِلنَّاسِ –মানুষের জন্য।

রাবীর পরিচয়

(অত্র পুস্তকের ২নং হাদীস দ্রষ্টব্য)

গুরুত্ব

অন্যান্য ইবাদাতের মতো আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয়ও একটি ইবাদাত।

কিন্তু মানুষ অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারেই বেশী কৃপণতা করে। তাই নবী করীম (সা) স্পষ্টত দেখিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষ নিজ হাতে কল্যাণমূলক কাজে যা কিছু ব্যয় করে তা ছাড়া বাকী সমস্তই নষ্ট হয়ে যায় অথবা পরিত্যক্ত হয়ে অপরের ভোগের সামগ্রী হয়ে যায়। পরকালের পাথেয় শুধু ঐটুকু যা সে স্বহস্তে আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে। তাই প্রতিটি মানুষের ব্যবহারিক জীবনেই এ হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্যাখ্যা

ইসলামে সঞ্চয় করতে যতোটুকু উৎসাহ না দেয়া হয়েছে, অর্থ ব্যয় করতে তার চেয়ে বেশী উৎসাহ দেয়া হয়েছে। বিলাসিতা বা আরাম আয়েশের জীবন যাপন করে দু'হাতে অর্থ লুটানোকে ইসলাম অপছন্দ করে। ইসলাম চায় তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যেন সমাজের কল্যাণমূলক কাজে অথবা দারিদ্র মোচনে সুষ্ঠুভাবে ব্যয় হয়। আর এই ব্যয়ই হবে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়। কেননা আল্লাহ্‌তো কোন বান্দাহ্‌র নিকট হতে নিজে স্বশরীরে এসে কোন দান গ্রহণ করেন না। তাই অভাবী, পথিক-মুসাফির, ইকামাতে দ্বীনের মুজাহিদদেরকে দিলে কিংবা অন্যান্য সমাজ কল্যাণমূলক কাজে অর্থ সম্পদ ব্যয় করলে তা প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌ই গ্রহণ করেন এবং তার বিনিময় দিয়ে থাকেন। বান্দার নামায, রোযা, হজ্জ্ব ইত্যাদি যেমন ইবাদাত, সৎকাজে অর্থ ব্যয়ও তেমনি ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ-

وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

ব্যয় করতে থাকো। এটি তোমাদের জন্যই কল্যাণ। যারা স্বীয় আত্মাকে কৃপণতা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত রেখেছে তারাই প্রকৃত সফলকাম। (সূরা আত তাগাবুনঃ ১৬)

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ○

এবং যা তোমরা কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় কর আল্লাহ্ পুরাপুরিভাবে তার বিনিময় দিয়ে দিবেন। এ ব্যাপারে (কারো প্রতি) কোন জুলুম করা হবে না। (সূরা আল বাকারাঃ ২৭১)

অন্যত্র বলা হয়েছে

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ○

তোমরা যা কিছু খরচ করে ফেলো তার জায়গায় তিনি আরও বৃদ্ধি করে দেন। কেননা তিনিই হচ্ছেন উত্তম রিজিকদাতা। (সূরা আস্‌সাবাঃ৩৯)

পৃথিবীতে মানুষের বড়ো দুশমন হচ্ছে শয়তান। সেই শয়তান সর্বদা মানুষকে দরিদ্রতার ভয় দেখায় এবং ধণ-সম্পদকে আকর্ষণীয় করে মানুষের সামনে তুলে ধরে। আল্লাহ্ বলেনঃ

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۚ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ط

শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যের ন্যায় লজ্জাস্কর কাজের আদেশ দেয়। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের নিকট মাগফিরাত ও অতিরিক্ত দানের ওয়াদা করেন। (আল বাকারাঃ ২৬৮)

সূরা আল হুমাযায় বলা হয়েছেঃ

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ - يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ - كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ - نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ - الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ -

যে লোক ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে এবং তা গুনে গুনে (হিসেবে) রাখে। সে মনে করে তার ধন- সম্পদ চিরদিন তার নিকট থাকবে। কক্ষনো নয়। সে ব্যক্তি তো চূর্ণ- বিচূর্ণকারী স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে। তুমি কি জান, সেই চূর্ণ- বিচূর্ণকারী স্থানটি কি? আল্লাহ্‌র আগুণ। প্রচন্ডভাবে উত্তপ্ত উৎক্ষিপ্ত যা অন্তর পর্যন্ত স্পর্শ

করবে। (সূরা আল হুমাযাঃ ২-৭)

আল্লাহ্‌র পথে দান করাকে আল্লাহ্ ব্যবসায়ে বিনিয়োগের সাথে তুলনা করেছেন এবং সাথে সাথে এ কথাও বলে দিয়েছেন যে, ব্যবসায়ে বিনিয়োগে লাভ- ক্ষতি উভয়টাই হতে পারে কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে বিনিয়োগে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা তো নেই ই বরং কয়েকগুণ বেশী লাভের নিশ্চয়তা আছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ۝ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ط

যারা আমার প্রদত্ত রিজিক থেকে গোপনে প্রকাশ্যে ব্যয় করে - তারা এমন একটি ব্যবসায়ের আশা রাখে, যা কোনক্রমেই ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। আল্লাহ্ তাদেরকে এর বিনিময়ে পুরোপুরি ফল প্রদান করবেন এবং মেহেরবানী করে তাদেরকে কিছু বেশী দান করবেন। (সূরা আল ফাতিরঃ ২৯-৩০)

কিভাবে দানের বিনিময় জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়, সূরা বাকারায় তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, এমন একটি বীজ যা থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়। আবার প্রতিটি শীষে একশ' করে দানা হয়। তবে আল্লাহ্ যাকে চান (এর চেয়েও) বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ্ তো প্রাচুর্য দানকারী, সর্বজ্ঞ। (সূরা আল বাকারাঃ২৬১)

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط

তোমাদের কি হলো, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করছো না; অথচ আল্লাহ্ হচ্ছেন আকাশ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকারী। (সূরা আল হাদীদঃ ১০)

আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকারী এ কথাটির দু'টি অর্থ হ'তে পারেঃ

প্রথমতঃ এ ধন-সম্পদ তোমার নিকট চিরস্থায়ী নয়। একদিন অবশ্যই এ সম্পদ তোমার হস্তচ্যুত হবে।

দ্বিতীয়তঃ তুমি নির্দ্ধিধায় খরচ করতে থাকো কারণ সব কিছুর মালিক আল্লাহ্। ইচ্ছে করলে তিনি অনেক অনেক গুণ বেশী ফেরত দিবেন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষ কৃপণতা করে। দান করতে চায়না কিন্তু হাশরের দিন যখন মানুষ জাহান্নামের ভয়াবহ অবস্থা দেখবে তখন এ পৃথিবীর দ্বিগুণ পরিমাণ সম্পদও যদি তাকে দেয়া হয় তবে তার বিনিময়ে হলেও জাহান্নামের ভয়াবহ আজাব হতে মুক্তি পেতে চাইবে। এ অবস্থার কথা স্বয়ং আল্লাহ্ই বলে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ-

لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

সে দিন যদি সমগ্র পৃথিবীর ধন-দৌলতও তাদের করায়ত্ব হয় এবং তার সাথে আরো অতগুলো একত্র করে দেয়া হয় এবং সমস্তই যদি ফেদিয়া (জরিমানা) হিসেবে দিয়ে কিয়ামতের দিন আজাব হতে রক্ষা পেতে চায়। তবু তাদের নিকট হতে তা কবুল করা হবে না। তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।

(সূরা আল মায়েদাঃ ৩৬)

মানুষ মৃত্যুর মুহূর্তেই দান-সদকার ব্যাপারে উপলব্ধি করতে পারবে এবং তখন আল্লাহ্‌র নিকট অবকাশও চাইবে। কিন্তু তা মঞ্জুর করা হবে না। তাই মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنِىْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ -

আমরা তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো-ঐ অবস্থার পূর্বে, যখন তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় এসে উপস্থিত হয়। তখন সে বলতে থাকে- "হে আমার রব! তুমি আমাকে আরও একটু অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি দান-সদকা করে নেক চরিত্রবান লোকদের মধ্যে গণ্য হয়ে যেতাম।" (সূরা আল মুনাফিকুনঃ ১০)

পূর্বোল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্র পথে দানকে ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু যার হাতে মূলধন প্রদান করা হবে তার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধেও ধারণা থাকা উচিত। এ ব্যাপারেও মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন হাদীসে কুদসীর[১] মাধ্যমে তার বিশ্বস্ততার গ্যারান্টি দিয়েছেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنْ رَبِّهٖ عَزَّ وَجَلَّ اَنَّهٗ يَقُوْلُ يَا ابْنَ اٰدَمَ اَفْرِغْ مِنْ كَنْزِكَ عِنْدِىْ وَلَا حَرَقَ وَلَا غَرَقَ وَلَا سَرَقَ اُوْفِيْكَهُ اَحْوَجَ مَا تَكُوْنُ اِلَيْهِ۔

নবী করীম (সা) প্রবল পরাক্রান্ত প্রভূর কথা উল্লোখ করে বলেছেন যে, আল্লাহ্ বলেনঃ হে আদম সন্তান! তুমি নিজের সঞ্চয়কে আমার কাছে জমা রেখে নিশ্চিত হয়ে যাও। (আমার কাছে জমা রাখলে) আগুনে পোড়বেনা, বন্যায় ভাসিয়ে নিবে না

এবং চোরেও চুরি করবে না। যেদিন তুমি সবচেয়ে বেশী এর মুখাপেক্ষী হবে সেদিন আমার কাছে রক্ষিত এ সম্পদ পুরাপুরি তোমাকে দিয়ে দেবো। (তাবারানী, যাদেরাহ্)

অপর একটি হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে-

اَنْفِقْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ۔

---

(১) হাদীসে কুদসী বলা হয় ঐ হাদীসকে যা নবী করীম (সা) সরাসরি আল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন- এ কথা বলে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসে কুদসীকে 'ওহীয়ে গায়রে মাতুলু' ও বলা হয়।

হে আদম সন্তান! তুমি দান করতে থাকো, আমিও তোমাকে দান করবো। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন যে, নবী করীম (সা) আমাকে বলেছেন, হে আসমা!

أَنْفِقِيْ وَلَا تُحْصِيْ فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوْعِيْ فَيُوْعِيَ اللهُ عَلَيْكِ اِرْضَخِيْ مَا اسْتَطَعْتِ ـ

তুমি দান করতে থাকবে হিসেবে করবে না। অন্যথায় আল্লাহ্ও তোমাকে দেয়ার ব্যাপারে হিসেবে করবেন। আর সম্পদ ধরে রাখবেনা তাহলে আল্লাহ্ও তোমার ব্যাপারে ধরে রাখবেন। তোমার শক্তি অনুসারে সামান্য হলেও দান করো। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেনঃ

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ وَّمَا مَدَّ عَبْدٌ يَدَهٗ بِصَدَقَةٍ اِلَّا اُلْقِيَتْ فِيْ يَدِ اللهِ قَبْلَ اَنْ تَقَعَ فِيْ يَدِ السَّائِلِ ـ

দান করলে সম্পদ কমে না। যখন কোন বান্দাহ্ কোন প্রার্থীকে দান করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয় তখন প্রার্থীর হাতে দান পৌছানোর পূর্বেই তা আল্লাহ্র হাতে পৌছে যায়। (তাবারানী)

দান-সদকা শুধু আখিরাতেই কল্যাণ দিবে না। এর বিনিময়ে দুনিয়ার মান মর্যাদাও আল্লাহ্ বৃদ্ধি করে দেন। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ وَّمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللهُ ـ

দান-খয়রাতে সম্পদ কমে না এবং ক্ষমার মাধ্যমে আল্লাহ্ মানুষের ইজ্জত-সম্মান বাড়িয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয় আল্লাহ্ তাকে

উন্নত করেন। (মুসলিম)

"একবার নবী করীম (সা) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেনঃ তোমাদের মধ্যে কি কেউ নিজের সম্পদের চেয়ে অপরের সম্পদকে বেশী মহব্বত করে? সাহাবীগণ বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা কি করে সম্ভব? নবী করীম (সা) বললেনঃ তোমাদের নিজের সম্পদ হচ্ছে তাই, যা তোমরা আল্লাহ্র পথে দান কর। আর অপরের সম্পদ হচ্ছে, তোমাদের মৃত্যুর পর যা ওয়ারিশগণ বন্টন করে নিবে।"

শিক্ষাবলী

(১) অপচয় করা যাবে না।
(২) কৃপণতাও করা যাবে না।
(৩) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের সহজতর পথ হচ্ছে দৈহিক ইবাদতের সথে সাথে আর্থিক কুরবানী।
(৪) যতো প্রকার ইবাদাত আছে তার মধ্যে মাত্র দু'টো ইবাদাতেই সরাসরি আল্লাহ্ জিম্মাদারী নেন। একটি হচ্ছে সওম এবং অপরটি হচ্ছে আল্লাহ্র পথে দান।
(৫) আল্লাহ্র পথে দান করলে আত্মার সংকীর্ণতা ও কৃপণতা দূর হয়।
(৬) আল্লাহ্র পথে দানকারী ব্যক্তির মর্যাদা আল্লাহ্ বাড়িয়ে দেন- দুনিয়ায় এবং আখিরাতে।

তথ্যসূত্র

(১) তাফহীমুল কুরআন-সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ)।
(২) যাদেরাহ-আল্লামা জলিল আহ্সান নাদভী
(৩) ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ্-মাওঃ মতিউর রহমান নিজামী
(৪) তাফসীরে ইবনে কাসীর
(৫) সহীহ্ আল-বুখারী
(৬) সহীহ্ মুসলিম।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ
اسْتُخْلِفَ اَبُوْبَكْرٍ رض بَعْدَهٗ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ
لِاَبِىْ بَكْرٍ رض كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهٗ وَنَفْسَهٗ اِلَّا بِحَقِّهٖ وَحِسَابُهٗ عَلَى اللّٰهِ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ رض وَاللّٰهِ
لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ فَاِنَّ الزَّكٰوةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ
مَنَعُوْنِىْ عِقَالًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهٗ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ
عَلٰى مَنْعِهٖ فَقَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ رض فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلَّا اَنْ رَاَيْتُ اللّٰهَ قَدْ شَرَحَ
صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ رض لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ -

"হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেনঃ নবী করীম (সা) যখন ইন্তেকাল করলেন এবং হযরত আবু বকর (রা) খলিফা নির্বাচিত হলো, আর আরবের কিছু লোক কাফির হয়ে গেলো। তখন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হযরত আবু বকর (রা) কে বললেনঃ আপনি এ লোকদের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করবেন? অথচ নবী করীম (সা) বলছেনঃ লোকেরা যতোক্ষণ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই) মেনে না নিবে ততোক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। যদি কেউ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ স্বীকার করে, তবে তার ধন-সম্পদ ও জান-মাল আমার নিকট পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে। অবশ্য ইসলামের হক কখনো ধার্য্য হলে অন্য কথা। তাদের হিসেব গ্রহণের দায়িত্ব আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। তখন হযরত আবু বকর (রা) বললেনঃ আল্লাহ্র কসম! যে

লোকই নামায যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে তার বিরুদ্ধেই আমি যুদ্ধ করবো। কেননা যাকাত হচ্ছে মালের হক। আল্লাহ্‌র কসম! তারা যদি রাসূলের (সা) সময় যাকাত বাবদ দিতো এমন একগাছি রশিও দেয়া বন্ধ করে, তবে অবশ্যই আমি তা না দেয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে লাড়াই করবো। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেনঃ আল্লাহ্‌র শপথ! এটা আর কিছু নয়। আমার মনে হলো আল্লাহ্ যেন আবু বকরের অন্তর যুদ্ধের জন্য উম্মুক্ত করে দিয়েছেন। আরও বুঝতে পারলাম যে, এটাই ঠিক। (অর্থাৎ আবু বকরের (রা) সিদ্ধান্তই সঠিক)।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, নাসায়ী, আবুদাউদ, মুসনাদে আহমদ)

শব্দার্থ

لَمَّا -যখন تُوُفِّيَ -ইন্তেকাল করলেন। اِسْتُخْلِفَ খলিফা নির্বাচিত হলেন। بَعْدَهُ -তারপর। كَفَرَ -কাফের হয়ে গেলো। مِنَ الْعَرَبِ -আরবের (কিছু) লোক। كَيْفَ -কিভাবে। تُقَاتِلُ -যুদ্ধ করবেন। اُمِرْتُ -আমি আদিষ্ট হয়েছি। حَتّٰى -যতোক্ষণ। عَصَمَ -নিরাপত্তা লাভ করবে। مِنِّي -আমা হ'তে। وَاللّٰهِ -আল্লাহ্‌র কসম। لَاُقَاتِلَنَّ -অবশ্য আমি যুদ্ধ করবো। مَنْ -যে। فَرَّقَ -পৃথক করবে। بَيْنَ -দু'য়ের মধ্যে। حَقُّ الْمَالِ -মালের হক। لَوْ -যদি। مَنَعُوْنِي -আমাকে (দিতে) নিষেধ করে। عِقَالًا -রশি। يُؤَدُّوْنَ -তারা দিতো। رَأَيْتُ

ঐতিহাসিক পটভূমি

রাসূলে আকরাম (সা) এর ইন্তেকালের পর আরবের কয়েকটি গোত্র মুরতাদ হয়ে যায়। তবে এর ধরণ ছিলো ভিন্ন ভিন্ন। যেমন- (১) কিছু ছিলো যারা ইসলামকে পুরোপুরি বিসর্জন দিয়ে কুফুরী অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেছিলো এবং কাফেরদের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলো।

(২) একদল আবার মুসায়লামাতুল কাজ্জাব ও আসওয়াদুল আনাসীর মিথ্যা নবুওয়ত দাবীকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলো।

(৩) একদল ছিলো যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করতো। তারা নামাযকে ফরয মনে করতো কিন্তু যাকাত আদায় করা ফরয মনে করতো না। তারা মনে করতো যাকাত আদায় করার অধিকার একমাত্র নবী করীম (সা) এর। কাজেই তাঁর তিরোধানের পর এ অধিকার আর কারো নেই। তাদের ভুল বুঝাবুঝির মূলে হচ্ছে নিম্নোক্ত আয়াতটি-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا-

হে নবী! তাদের ধন-মাল হতে যাকাত গ্রহণ করো যেন এর সাহায্যে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পারো। (সূরা আত তাওবাঃ ১০৩)

এটি ছিলো তাদের একটি মারাত্মক ভুল। কেননা আয়াতে নবী করীম (সা) কে উল্লেখ করে বলা হলেও তা ছিলো একটি সাধারণ হুকুম। যা হোক যাকাত না দেয়ার পরিণতি কি হতে পারে হযরত উমর (রা) এর মতো বিচক্ষণ ও ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিও প্রথম বুঝে উঠতে পারেননি। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি তার ভুল বুঝতে পারলেন এবং হযরত আবু বকর (রা) এর প্রশংসা করলেন।

যাকাত ফরয হওয়ার সময় কাল

যাকাত কখন ফরয করা হয়েছে, সে সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান। অধিকাংশের মতে যাকাত হিজরী দ্বিতীয় সনে ফরয করা হয়েছে রোযা ফরয করার পূর্বে। আবার কেউ বলেন হিজরী দ্বিতীয় সনে ফরয করা হলেও তা রোযা ফরয করার পরে যাকাত ফরয হয়েছে। ঐতিহাসিক ইবনুল আসীর বলেছেন, যাকাত ফরয হয়েছে নবম হিজরীতে। কিন্তু বেশ কিছু হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, যাকাত নবম হিজরীর বহু পূর্বেই ফরয করা হয়েছে। তবে আল্লামা ইবনে আসীর তার তাফসীরে লিখেছেনঃ

"যাকাত ফরয হওয়ার হুকুম মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে। তবে কোন জিনিসে কি পরিমাণ যাকাত দিতে হবে তা বিস্তারিত বিধান অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়।"

উপরোক্ত কথার সমর্থনে আল্লামা ইবনুল আরাবীরও সমর্থন পাওয়া যায়, তার বিখ্যাত তাফসীর 'আহ্কামুল কুরআন" এ। সেখানে বলা হয়েছেঃ

আল্লাহ্ তা'আলা যাকাত ফরয করেছেন মুলতঃ মক্কা শরীফেই কিন্তু তা ছিলো

মোটামুটি ফরয করার কাজ। এতে যাকাত যে ফরয এ বিশ্বাসটা দৃঢ় হলো। তবে তার কার্যকারিতা স্থগিত রাখা হয়। এর ধরণ, পরিমাণ ও সময় সম্পর্কে তখন মক্কী জীবনে কিছুই বলা হলো না। পরে মদীনায় ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হলে যাকাত সংক্রান্ত যাবতীয় বিধান জারী করা হলো এবং তা বাস্তাবায়নও করা হলো। এটি এমন একটি মীমাংসার কথা যা কুরআনী বিধানের মূলনীতি জানা লোক ছাড়া অন্য ব্যক্তিরা বুঝতে পারে না। (আহ্কামুল কুরআন, দ্বিতীয় খন্ড ৭৫২ পৃঃ)

ব্যাখ্যা

যাকাত زَكٰوة: শব্দের আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা। যেমন আল্-কুরআনে বলা হয়েছেঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى -

যে লোক পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা লাভ করেছে। সেই সম্পূর্ণ কল্যাণ লাভ করতে পেরেছে। (সূরা আল আ'লা-১৪)

ইসলামী পরিভাষায় যাকাত বলা হয়- প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যদি নিসাব[১] পরিমাণ হয় এবং তা এক বৎসর কাল অতিক্রম করে তবে ঐ সম্পদ হতে শতকরা ২½ ভাগ হারে আদায় করে ইসলামী রাষ্ট্রের যাকাত তহ্বীলে[২] জমা দান অথবা নির্দিষ্ট খাত সমূহে বন্টন করা।

যাকাত নামকরণের কারণ

যেহেতু যাকাতের দ্বারা আত্মার ও মালের পরিশুদ্ধি ঘটে এবং মূলতঃ সম্পদের বৃদ্ধি (বরকত) ঘটে এ জন্য যাকাত নামকরণ করা হয়েছে।

---

(১) স্বর্ণ ৭½ ভরি, রৌপ্য ৫২½ ভরি অথবা স্বর্ণ রৌপ্য মিলিয়ে ৫২½ ভরি রৌপ্যের মূল্য পরিমাণ হলে (অর্থাৎ বর্তমান বাজার মূল্যে-সাড়ে দশ হাজার টাকা) তাকে নেসাব বলা হয়।

(২) যেখানে ইসলামী রাষ্ট্র নেই সেখানে যদি এমন কোন ইসলামী সংগঠন থাকে যারা যাকাত উঠিয়ে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করে তবে তাদের মাধ্যমে যাকাত আদায় করা উচিত। অবশ্য নিজে বন্টন করলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

যাকাতের সম্পর্ক ঈমানের সাথে

যে পাঁচটি বস্তুকে ইসলামের মূল স্তম্ভ বলে ঘোষণা করা হয়েছে যাকাত তার অন্যতম। কাজেই যাকাত অস্বীকার করা মানেই হচ্ছে ইসলামের একটি স্তম্ভ (রুকন) কে অস্বীকার করা। আর ইসলামের

কোন ভিত্তিকে অস্বীকার করা ইসলামকে অস্বীকার করারই শামিল। এমনকি আল্-কুরআনে মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়েও যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ ـ

ঈমানদার নারী ও পুরুষ একে অপরের বন্ধু ও সাহায্যকারী। তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঃ তারা সৎকাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজের প্রতিরোধ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে। (সূরা আত তওবাঃ৭১)
এমন কি ইসলামে প্রবেশ করে মুমিন হতে হলে এবং মুমিনদের কাতারে প্রবেশ করতে হলেও যাকাত আদায়কারী হতে হবে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ط

তারা যদি (কুফুর ও শিরক থেকে) তওবা করে ও সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই (সূরা আত তওবাঃ ১১)

যাকাত অন্যান্য নবীর উম্মতের উপরও ফরজ ছিলো

নামায এবং রোযার মতো যাকাতও পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতের উপর ফরয ছিলো। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ হতে তার প্রমান পাওয়া যায়।
হযরত ইব্রাহিম (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ

الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءَ الزَّكٰوةِ ج

আমরা তাদের ঈমাম বানিয়ে দিলাম। তারা আমার নির্দেশ অনুযায়ী হেদায়েত দান করছিলো, আর ওহীর মাধ্যমে আমরা তাদেরকে সৎকাজের, সালাত কায়েমের এবং যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলাম। (সূরা আল আম্বিয়াঃ ৭৩)
ঈসা(আ) এর একটি কথা কুরআনে উদ্বৃত হয়েছে এ ভাষায়ঃ

وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝

আমি যতোদিন বেঁচে থাকবো, আল্লাহ্ আমাকে সালাত কায়েম ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরা মারিয়ামঃ ৩১)
হযরত ঈসমাইল (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص

আর সে তার আহ্লকে সালাত কায়েম ও যাকাত দেয়ার নির্দেশ দিত। (সূরা মারিয়ামঃ ৫৫)

যাকাত দান নয়,অধিকার

যাকাত ধনীদের পক্ষ থেকে দান নয় বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত গরীবের অধিকার। কাজেই যাকাত দাতার যেমন একথা মনে করার অবকাশ নেই যে, আমি অমুককে মেহেরবানী করেছি। ঠিক তেমনিভাবে যাকাত গ্রহিতাও যেন নিজের মনকে ছোট না করে যে, আমাকে অমুকে মেহেরবানী করেছে। বরং মনোবল এরূপ হওয়া উচিত যে, আমার অধিকার আমাকে দিয়েছে মাত্র। আমার প্রতি করুনা করেনি। কারো কাছ হতে নিজের পাওনা নিতে যেমন কেউ কুণ্ঠিত হয়না। ঠিক তেমনি ভাবে যাকাত গ্রহিতা যাকাত নিতেও কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্ নিজেই বলছেনঃ

وَفِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝

আর তাদের ধন-সম্পদে অভাবী ও প্রার্থনাকারীদের অধিকার আছে। (সূরা আয্ যারিয়াত ১৯)

যাকাত আল্লাহ্ প্রেমের বাস্তব রূপায়ণ

সমাজে অনেক লোক আছে যারা মৌখিক ভাবে অপরের জন্য জীবন দিয়ে ফেলে কিন্তু প্রয়োজনে সামান্য কটি টাকা দিয়েও উপকার করতে রাজী নয় । ঠিক এমনিভাবে কিছু মেকী আল্লাহ্ প্রেমিক আছে যারা তাসবীহ্ তাহ্লীল নামায জিকির আজকার ইত্যাদি দৈহিক ইবাদাতের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে কিন্তু সাহেবে নেসাব হলেও যাকাত দিতে টালবাহানা করে । যেমন সঠিকভাবে হিসাব করলে যাকাত হবে কয়েক হাজার বা লক্ষ টাকা কিন্তু সে অনুমান করে সামান্য কিছু দিয়েই দায় মুক্ত হ'তে চায়। আবার কিছু লোক আছে যারা দৈহিক ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ্কে পেতে চায় কিন্তু তার নির্দেশ মোতাবেক খরচ করতে চায়না। তাই আল্লাহ্ দেখতে চান তাঁর ভলোবাসার দাবী মৌখিক না বাস্তবিক । এজন্যেই দৈহিক ইবাদাতের সাথে সাথে আর্থিক ইবাদাতের কথা বলা হয়েছে । পৃথিবীতে যদি একজন মানুষ একজন মানুষের প্রেমে সবকিছু বিসর্জন দিতে পারে তবে সত্যিকারের একজন আল্লাহ্ প্রেমিক কেন তার সম্পদের কিছু অংশ আল্লাহ্কে দিতে পারবে না?

যাকাত সম্পদ ও আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে

যাকাত আদায়ের মাধ্যমে অন্তর ও সম্পদ যে পরিশুদ্ধি লাভ করে তা স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজেই বলেছেনঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا-

তাদের নিকট হতে তুমি যাকাত গ্রহণ করো। এর ফলে তাদের আত্মা ও সম্পদ পরিশুদ্ধ হবে। (সূরা আত্তওবাঃ১০৩)

নবী করীম (সা) বলেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكٰوةَ اِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنَ الْاَمْوَالِ-

আল্লাহ্ যাকাত ফরয করেছেন কেবলমাত্র এ জন্যে যে, যাকাত প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পদ তার মালিকের জন্য পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে দিবেন। (আবু দাউদ)

যাকাত না দেয়া মুশরিকদের কাজ

যাকাত না দেয়া যে বড়ো অপরাধ তা নিম্নোক্ত আয়াত হতে স্পষ্ট বুঝা যায়। কেননা যাকাত প্রদান না করাকে কাফির মুশরিকদের আমলের অনুরূপ বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ٥ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ ـ

মুশরিকদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য, কারণ তারা যাকাত দেয় না। (সূরা হা মীম আস্ সাজদাঃ৫-৬)

যাকাত না দেয়ার পরিণতি

যাকাত না দেয়ার পরিণতি কতো ভয়াবহ তা নিম্নোক্ত আয়াত হতে জানা যায়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْ
هُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ٥ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ٥

যারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে কিন্তু আল্লাহ্র পথে খরচ করে না। হে নবী! তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আজাবের সুসংবাদ দাও। এমন একদিন আসবে যেদিন এ সোনা রূপার উপর জাহান্নামের আগুন উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে লোকদের কপাল, পাজর ও পিঠে ছ্যাকা দেয়া হবে। আর বলা হবে, এগুলো হচ্ছে সেই সম্পদ যা তোমরা পৃথিবীতে জমা করে রেখেছিলে। এখন তোমাদের জমা করা সম্পদের স্বাদ গ্রহণ করো। (সূরা আত্‌তওবাঃ৩৪-৩৫)

নবী করীম (সা) বলেছেনঃ

مَا مِنْ اَحَدٍ لَا يُؤَدِّىْ زَكٰوةَ مَالِهٖ اِلَّا مُثِّلَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ اَقْرَعُ
حَتّٰى يُطَوَّقَ بِهٖ فِىْ عُنُقِهٖ ـ

যে লোক তার ধন-সম্পদের যাকাত আদায় না করবে তার ধন-সম্পদ কিয়ামতের দিন সাপের আকৃতি নিবে। অতঃপর সাপটি তার গলায় পেচিয়ে দেয়া হবে। (ইবনে মাজাহ্)

মুসনাদে আহ্মাদের এক হাদীসে আছেঃ

فَإِذَا رَآهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ فَأَنَا عَنْهُ أَغْنَى مِنْكَ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَابُدَّ لَهُ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضِمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ -

যখন সে সাপটি দেখতে পাবে তখন পালানোর চেষ্টা করবে। এ সময় রাব্বুল আলামীন ডেকে বলবেনঃ তুমি পৃথিবীতে যে সম্পদ জমা করে রেখেছিলে আজ তা গ্রহণ করো। আমি দায়মুক্ত। শেষ পর্যন্ত যখন সে দেখবে তা থেকে তার মুক্তি নেই, তখন সে তার হাত ঐ সাপের মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিবে। নিমিষে সে হাতখানা সাপে খেয়ে ফেলবে বলদ যেমন ঘাস চিবিয়ে খেয়ে ফেলে।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসে যদিও দু'ধরনের আজাবের কথা বলা হয়েছে, মূলত দু'ধরনের আজাবই তাকে দেয়া হবে। অথবা পালাক্রমে সে আজাব দেয়া হবে।

যাকাত ট্যাক্স নয়

অনেকে যুক্তি দেখান যাকাত এক প্রকার ট্যাক্স কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, যাকাত ট্যাক্স নয়। কেননা ট্যাক্স আদায় করা হয় দেশের প্রতিটি নাগরিকের নিকট হতে। চাই সে ধনী হোক বা গরীব হোক পক্ষান্তরে যাকাত আদায় করা হয় ধনী সাহেবে নেসাবদের নিকট হতে। আবার ট্যাক্স সরকার যে কোন কাজে ব্যয় করতে পারেন কিন্তু যাকাতের অর্থ নির্দিষ্ট আটটি খাত[৩] ছাড়া অন্য কোথাও ব্যয় করা যায় না। তাছাড়া ট্যাক্স ইবাদাত নয় কিন্তু যাকাত প্রদান করা ইবাদাত।

ইসলামে যাকাতের মর্যাদা এতো বেশী যে তা আদায় করা না করার উপর ঈমানের প্রশ্ন জড়িত। এ জন্যেই হযরত আবু বকর (রা) যাকাত

(৩) আটটি খাতের বর্ণনা দেখুন দারসে হাদীস-১

অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেছিলেন। যাকাত অস্বীকারকারীগণ যে আল্লাহ্র নিকট মুসলিম হিসাবে গন্য হয় না তার প্রমান হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) এর নিম্নোক্ত হাদীসটিঃ

أُمِرْنَا بِإِقَامَةِ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَمَنْ لَّمْ يُزَكِّ فَلَا صَلٰوةَ لَهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ يَّنْفَعُهُ عَمَلُهُ -

আমাদেরকে নামায কায়েম করার এবং যাকাত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি নামায পড়ে কিন্তু যাকাত দেয় না তার নামায আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হবে না।

অন্য এক বর্ণনায় আছে-ঐ ব্যক্তি মুসলমান নয় তাই কিয়ামতের দিন তার কোন আমলই কোন ফল দিবে না। (তাবারানী)

শিক্ষাবলী

(১) নামায -রোযা ইত্যাদি যেমন দৈহিক ইবাদাত ঠিক তেমনিভাবে যাকাত হচ্ছে মালের ইবাদাত।

(২) কোন গোষ্ঠী বা দল যাকাত দিতে অস্বীকার করলে ইসলামী রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে।

(৩) বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলামী হদ কার্যকরী করা হয় আভ্যন্তরীণ অবস্থা আল্লাহ্র উপর সোপর্দ।

(৪) মোর্তাদকে হত্যা করা বৈধ।

(৫) ইজতিহাদের মাধ্যমে কর্মনীতি ও আইন প্রণয়ন ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের নৈতিক দায়িত্ব।

(৬) ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধানগণ তাদের অনুসৃত কর্মনীতির জন্য জনসাধারণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য।

তথ্য সূত্র

(১) হাদীস শরীফ (২য় খন্ড)- মাওঃ আব্দু রহীম (রহ)

(২) যাকাত- সাওম ই'তেকাফ- মাওঃ আঃশহীদ নাসিম

(৩) সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং-সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ)

(৪) মিশকাত শরীফ

(৫) তাফহীমুল কুরআন- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ـ (بخارى، مسلم)

হযরত নুমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত,রাসুলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ তোমরা মু'মিনদেরকে পারস্পরিক দয়া, ভালোবাসা এবং হৃদ্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। দেহের কোন অঙ্গ যদি অসুস্থ্ হয়ে পড়ে তবে অপর অঙ্গগুলোও জ্বর এবং নিদ্রাহীনতা দ্বারা তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে।
(বুখারী, মুসলিম)

শব্দার্থ

تَرَى –তোমরা দেখবে। تَرَاحُمِهِمْ – পারস্পরিক দয়া। تَوَادِّهِمْ –পরস্পর বন্ধুত্ব হওয়া। تَعَاطُفِهِمْ –অণুগ্রহ পরায়ণ হওয়া। كَمَثَلِ الْجَسَدِ – দেহের ন্যায়। إِذَا –যখন। اِشْتَكَى –দুঃখ পাওয়া। عُضْوٌ –অঙ্গ। تَدَاعَى –প্রতিক্রিয়া হওয়া। لَهُ –তার জন্য। سَائِرُ الْجَسَدِ –শরীরের অবশিষ্টাংশ। بِالسَّهَرِ –জাগ্রত/হুশিয়ার। اَلْحُمَّى –জ্বর।

রাবীর পরিচয়

হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা) মদীনার খাজরাজ বংশের লোক। তাঁর পিতা বশীর (রা) ইবনে সা'দ ছিলেন আনসার সাহাবী। হযরত নু'মান (রা) হুজুরে পাক (সা) এর ইন্তেকালের ছয় বৎসর মতান্তরে আট বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতাসহ অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবীগণ ছিলেন তাঁর উস্তাদ।
তিনি হযরত আলী (রা) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর মতানৈক্যের সময় মুয়াবিয়া (রা) এর পক্ষ অবলম্বন করেন। হযরত মুয়াবিযা (রা) তাকে প্রথমে

কুফা ও পরে হিমসের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। হযরত মুয়াবিয়ার (রা) ইন্তেকালের পর তিনি ইয়াজিদের আনুগত্য স্বীকার করেন। ইয়াজিদের মৃত্যুর পর সিরিয়াবাসীদেরকে আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রা) এর খিলাফত স্বীকার করে নিতে আহ্বান জানালে হিমস্বাসীরা তাঁকে হিজরী ৬৪ সনে শহীদ করেন।
তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১২৪টি।

ইমাম বুখারী এবং মুসলিম সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা) এর বর্ণিত হাদীস স্ব-স্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

হাদীসটির গুরুত্ব

আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ -

নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মু'মিন একে অপরের ভাই।
আল্ কুরআনের ছোট্ট ও সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করেছেন যে, একজন মু'মিনের সাথে অপর একজন মু'মিনের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিৎ বা আল্লাহ্ তাদের সম্পর্ক কেমন দেখতে চান। উল্লেখিত হাদীসটি যেন এ আয়াতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা। বুখারী এবং মুসলিম ছাড়া অন্যান্য হাদীস গ্রন্থেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা

একটি সুখী সমাজ গড়তে হলে সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহানুভূতি সৃষ্টি করা একান্ত অপরিহার্য। যেহেতু ইসলাম একটি আদর্শ সমাজের ভিত রচনা করতে চায় তাই প্রথমেই সমাজের প্রতিটি মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে একে অপরের সাথে শরীক হয়ে হৃদ্যতা সৃষ্টির উৎসাহ দেয়। যে সমস্ত কাজ এ সম্পর্কের ফাটল ধরায় ইসলাম সেগুলোকে হারাম ঘোষণা করেছে। সাধারণত নিম্ন লিখিত কার্যাবলী একে অপরের সাথে বিচ্ছেদ, হিংসা -দ্বেষ ইত্যাদি সৃষ্টি করে সম্পর্কে ফাটল ধরায়ঃ
(১) কারো অধিকারে হস্তক্ষেপঃ নবী করীম (সা) বলেছেনঃ
আয়াত-

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهٖ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ -

যে ব্যক্তি কসম খেয়ে কোন মুসলমানের অধিকার (হক) নষ্ট করেছে আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে রেখেছেন এবং জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন। মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার নবী করীম (সা) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জানো দরিদ্র কে ? (অন্য হাদীসে আছে দেউলিয়া) সাহাবীগণ বললেনঃ যে ব্যক্তির ধন-সম্পদ নেই সে- ই দরিদ্র। তখন হুজুরে পাক (সা) বললেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে আসল দরিদ্র হচ্ছে সে ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাতের ন্যায় আমল নিয়ে আসবে এবং সেই সঙ্গে কাউকে গালি দেয়া, কারো উপর অপবাদ দেয়া, অন্যায়ভাবে কারো মাল খাওয়া , কারো রক্তপাত করা এবং কাউকে মারধোর করার আমলও নিয়ে আসবে। অতঃপর একজন মজলুমকে (ডেকে এনে) তার নেকী দিয়ে দেয়া হবে। তারপর দ্বিতীয় মজলুমকে নেকী দিয়ে দেওয়া হবে । এভাবে চূড়ান্ত ফায়সালার পূর্বে তার নেকী যদি শেষ হয়ে যায় তবে হকদারদের পাপ এনে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

(২) অন্যকে তুচ্ছ মনে করাঃ একজন মুমিন কখনো তার অপর ভাইকে তুচ্ছ মনে করতে পারে না । কারণ অপরকে তুচ্ছ মনে করার অর্থ হচ্ছে নিজেকে নিয়ে অহংকার করা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

হাদিস---

وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهٖ وَهِيَ اَشَدُّهُنَّ - (بيهقى)

একটি ধ্বংসকারী বস্তু হচ্ছে নিজেকে নিজে বড়ো মনে করা। আর এটি হচ্ছে নিকৃষ্টতম অভ্যাস।(বাইহাকী)

অপর হাদীসে সরাসরি বলা হয়েছে-

হাদীস--

بِحَسْبِ امْرِءٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ - (مسلم)

"কোন ব্যক্তির গুণাহ্গার হবার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার (কোন) মুসলিম ভাইকে নীচ জ্ঞান করে।(মুসলিম)

(৩) কাউকে অযথা লজ্জা দেয়াঃ মানুষ পৃথিবীতে সবকিছু নীরবে হজম করলেও আত্ম সম্মানে আঘাত লাগে এমন কিছু সে বরদাশত করতে রাজী নয়। তাই এক মুসলমান অপর মুসলমানকে তার সাক্ষাতে অথবা অন্য লোকের মাধ্যমে কোন কৃত কর্মের ব্যাপারে তিরস্কার করা অথবা লজ্জা দেয়া কোনক্রমেই উচিৎ নয়। এমনকি অনেকে নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত সামান্য খুটিনাটি ব্যাপারে তিরস্কার করে এবং লজ্জা দেয়। একথা আমরা কখনো ভেবে দেখিনা যে, কোন লোক অজ্ঞতা বশত কোন খারাপ কাজ করলে, অতঃপর তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে এমনিই সে লজ্জিত হয়। তার উপর তাকে তিরস্কার করা সম্পূর্ন অমানবিক এবং অযৌক্তিক।

(৪) কটুকথা বা গালাগালঃ কোন ভাইকে তার সাক্ষাতে অথবা অজ্ঞাতে গালাগালি করা কিংবা কটু কথা বলা সম্পূর্ণ হারাম। নবী করীম (সা) বলেনঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ الْجَعْظَرِيُّ - (ابوداؤد، بيهقى)

কোন কটুভাষী ও বদ-স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (আবু দাউদ, বাইহাকী)

অপর হাদীসে আছে-

হাদীস----

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيِّ - (ترمذى)

কোন মুমিন বিদ্রূপকারী, লানৎকারী, অশ্লীল ভাষী এবং বাচাল হতে পারে না। (তিরমিযি)

(৫) জান-মালের নিরাপত্তাঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের সবচেয়ে বড়ো হক বা অধিকার হচ্ছে তার জান- মালের নিরাপত্তা। আল্লাহ বলেনঃ-

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۝ (النساء: ٩٣)

তারপর যে ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তিকে জেনে বুঝে হত্যা করবে, তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে সে অনন্তকাল অবস্থান করবে। তার উপর আল্লাহ্‌র গজব ও অভিসম্পাত। এবং তার জন্য কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। (সূরা আন্‌ নিসাঃ৯৩)

(৬) গীবতঃ গীবত বলা হয় কোন ব্যক্তির কোন দোষ তার অগোচরে অন্যের নিকট বলা। গীবতের মাধ্যমে অপর ভাইয়ের ইজ্জত -সম্মানের উপর সরাসরি আঘাত হানা হয়। তাই ইসলাম এটাকে হারাম ঘোষণা করেছে। আল্‌-কুরআনের সূরা হুজুরাতে আল্লাহ্‌ গীবতকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন।

(৭) চোগলখুরীঃ এটি হচ্ছে গীবতের অন্য রূপ। চোগলখুরী বলা হয় কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সত্য -মিথ্যা বলে তার কোন বন্ধু বা ভাইয়ের কান ভারী করা। এটা সমাজে ভ্রাতৃত্বের ফাটল ধরানোর সব চেয়ে বড়ো হাতিয়ার। হযরত হুজাইফা (রা) বলেন- আমি নবী করীম (সা) কে বলতে শুনেছি যে, চোগলখোর বেহেশ্‌তে যাবে না।

(৮) অপরের দোষ খুঁজে বেড়ানোঃ এ সম্পর্কে রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেনঃ

وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّهُ مَنْ يَّتَّبِعْ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعُ
اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَّتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِىْ جَوْفِ رَحْلِهِ ـ (ترمذى)

"মুসলমানদের দোষ খুঁজে বেড়িও না;কারণ যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ ও গুনাহ্‌ খুঁজতে থাকে , আল্লাহ্‌ তার গোপন দোষ ফাঁস করতে লেগে যান। আর আল্লাহ্‌ যার দোষ প্রকাশ করতে লেগে যান, তাকে তিনি অপমান করেই ছাড়েন- সে তার ঘরের মধ্যেই লুকিয়ে থাকুক না কেন।" (তিরমিযি)

(৯) উপহাস করাঃ কোন ব্যক্তির অপর কোন ব্যক্তির সাথে উপহাস বা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা ঠিক নয়। কারণ এতে অনেক সময় মনোমালিন্যের সুত্রপাত হয় এবং তিক্ততা বৃদ্ধিপায়। রাসুলে খোদা (সা) বলেনঃ

لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ اَنْ يُّرَوِّعَ مُسْلِمًا ـ (احمد، ابوداؤد، طبرانى)

কোন মুসলমানকে হাসি তামাশার মাধ্যমে উত্যক্ত করা মুসলমানের পক্ষে হালাল নয়। (আহ্মদ, আবুদাউদ, তিরমিযি)

(১০) নিছক অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে কিছু বলাঃ নবী করীম (সা) বলেছেনঃ-

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ۔ (بخاری، مسلم)

তোমরা অনুমান পরিহার করো। কেননা অনুমান হচ্ছে নিকৃষ্টতম মিথ্যা কথা। (বুখারী, মুসলিম)

(১১) অপবাদ দেয়াঃ কোন মুসলমানকে জেনে-শুনে অপবাদ দেয়া সম্পূর্ণ হারাম। আল্লাহ্ বলেনঃ-

কোরান---

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ (النساء)

যে ব্যক্তি কোন গুনাহ্ বা নাফরমানী করলো এবং তারপর এক নিরপরাধ ব্যক্তির উপর তার অপবাদ আরোপ করলো, সে এক মহাক্ষতি এবং স্পষ্ট গুনাহ্কেই নিজের মাথায় চাপিয়ে নিলো। (সূরা আন-নিসা)

(১২) ক্ষতি সাধন করাঃ নবী করীম (সা) বলেছেনঃ

হাদীস---

مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ۔ (ترمذی)

যে ব্যক্তি কোন মুমিনের ক্ষতি সাধন করে অথবা কারো সংগে ধাপ্পাবাজী করে, সে অভিশপ্ত। (তিরমিযি)

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে--

হাদীস ---

مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللّٰهُ بِهِ۔ (ترمذی، ابن ماجه)

যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ক্ষতি করলো, আল্লাহ্ তার ক্ষতি করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলো আল্লাহ্ তাকে কষ্ট দিবেন। (তিরমিযি)

(১৩) মনোকষ্ট দেয়াঃ কোন মানুষের সাথে এরকম কোন আচরণ না করা যাতে সে মনে কষ্ট পায়। কোন বান্দাহ্কে কষ্ট দিলে স্বয়ং আল্লাহ্কেই কষ্ট দেয়া হয়।

আর আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেয়ার পরিণাম জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ-

مَنْ اٰذٰى مُسْلِمًا فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ ۔ (طبرانى)

যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলো, সে আল্লাহ্‌কেই কষ্ট দিলো। (তাবারানী)

(১৪ কাউকে বিকৃত নামে ডাকাঃ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেনঃ-

আয়াত---

وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۔ (حجرات)

আর কাউকে বিকৃত নামে ডেকো না কেননা ঈমানের পর বিকৃত নাম ধরে ডাকা হচ্ছে ফাসেকী। (সূরা আল হুজুরাত)

(১৫) ধোকা দেয়াঃ কথাবার্তা অথবা লেনদেনের মাধ্যমে কোন মুসলমানের অপর কাউকে ধোকা দেয়া হারাম। এটি এক ধরনের খেয়ানত। আর খেয়ানত হচ্ছে মোনাফেকীর বৈশিষ্ট্য । হাদীসে আছে-সব চাইতে বড়ো খেয়ানত হচ্ছে এই যে, তুমি তোমার ভাইকে কোন কথা বললে সে তোমাকে সত্যবাদী মনে করলো। অথচ তুমি তাকে মিথ্যে কথা বললে। (তিরমিযি)

(১৬) হিংসাঃ মানুষ নিজের চেয়ে অপর কাউকে একটু ভালো দেখলে, মনে হিংসা বা পরশ্রীকাতরতার এক ঘৃণ্য ব্যাধি বাসা বাধে। এটিকে ইসলাম সম্পুর্ন রূপে হারাম করে দিয়েছে। কেননা ধন -দৌলত, টাকা-পয়সা, ইজ্জত-সম্মান, প্রভাব -প্রতিপত্তি এগুলো হচ্ছে আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানী । কাউকে কম দেন কাউকে আবার বাড়িয়ে দেন। এটিও আল্লাহ্‌র তরফ হতে একটি পরীক্ষা বিশেষ। কাজেই এ ব্যাপারে হিংসা পোষণ করা মানেই তাকদীরের উপর অবিশ্বাস করা। আর আকীদাহ্ হতে বিচ্যুত হওয়ার পরিণতি হচ্ছে সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাওয়া। নবী করীম (সা) বলেন --

اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ۔

(ابو داؤد)

তোমরা হিংসা থেকে বেচে থাকো। কারণ আগুন যেমন লাকড়ীকে খেয়ে ফেলে তদ্রূপ হিংসা নেকীকে খেয়ে ফেলে। (আবু দাউদ)

উপরোক্ত কু অভ্যাসগুলো মানুষের মধ্যে দুর করে এর বিপরীত অভ্যাসগুলো রপ্ত করার পরই আমরা হাদীসে উল্লেখিত একটি সমাজের কথা চিন্তা করতে পারি। যা কোন দেশ বা জাতি অথবা ভৌগলিক সীমারেখার দ্বারা আবদ্ধ নয়। একজন মুমিন পৃথিবীর যে প্রান্তেই বাস করুক না কেন পৃথিবীর অপর প্রান্ত হতে আগত একজন মুমিনের পরিচয় হওয়া মাত্রই সে অন্তরের গভীরে তার ভালোবাসা অনুভব করবে। আবার শত শত মাইলের ব্যবধান হলেও কোন এক মুমিনের দুঃখ-কষ্টের খবর পাওয়া মাত্রই অপর মু'মিন তার সে ভাইয়ের দুঃখ কষ্টের বেদনা তার মনের মধ্যে অনুভব করবে। যেমন নাকি আমরা শরীরের যে কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আঘাত পাওয়া মাত্র তার প্রতিক্রিয়া সমস্ত দেহে পেয়ে থাকি।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ رض قَالَ اَتَانَا اَبُوْ مُوْسٰى قَالَ اِنَّ عُمَرَ اَرْسَلَ اِلَىَّ اَنْ اٰتِيَهٗ فَاَتَيْتُ بَابَهٗ فَسَلَّمْتُ ثَلٰثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَاْتِيَنَا فَقُلْتُ اِنِّىْ اَتَيْتُ فَسَلَّمْتُ عَلٰى بَابِكَ ثَلٰثًا فَلَمْ تَرُدُّوْا عَلَىَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَاْذَنَ اَحَدُكُمْ ثَلٰثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهٗ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ عُمَرُ اَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَقُمْتُ مَعَهٗ فَذَهَبْتُ اِلٰى عُمَرَ فَشَهِدْتُّ ـ (بخارى، مسلم)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেছেনঃ একবার আমার কাছে আবু মুসা আশয়ারী (রা) আসলেন এবং বললেন, হযরত উমর (রা) এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে আমাকে ডেকেছিলেন। আমি (তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে) তাঁর দরজায় পৌছলাম এবং (অনুমতির জন্য) তিনবার সালাম দিলাম । কিন্তু আমার সালামের কোন জবাব এলো না। তখন আমি ফিরে এলাম। অতঃপর (অন্য সময়) উমর (রা) আমাকে বললেন, আমাদের কাছে আসতে তোমাকে কিসে বাধা প্রদান করলো? জবাবে আমি বললাম , আমি এসেছিলাম এবং আপনার দরজায় দাঁড়িয়ে তিনবার সালামও করেছিলাম । কিন্তু কেউ আমার সালামের জবাব দেয়নি। তাই আমি ফিরে এসেছি। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (স) আমাকে বলেছেন যে, যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করেও অনুমতি না পায়, তবে সে যেন ফিরে আসে। হযরত উমর (রা) একথা শুনে এ হাদীসের অনুকুলে সাক্ষ্য চাইলেন। তখন আমি (রাবী আবু সাঈদ খুদরী) হযরত আবু মুসা আশয়ারী সহ হযরত উমর (রা) এর নিকট গেলাম এবং সাক্ষ্য দিলাম যে হাদীটি সঠিক। (বুখারী ,মুসলিম)

শব্দার্থ

اَتَانَا –আমার কাছে আসলো। اَرْسَلَ –পাঠিয়েছিলো। اِلَىَّ –আমাকে।

اَنْ اٰتِيَهُ -যেন তার নিকট আসি। فَاَتَيْتُ -অতঃপর আমি আসলাম। بَابَه -তাঁর দরজায়। فَسَلَّمْتُ -অতঃপর আমি সালাম দিলাম। ثَلٰثًا -তিন বার। فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ -অতঃপর আমাকে কোন জবাব দেয়া হলো না। فَرَجَعْتُ -তখন আমি ফিরে আসি। مَا مَنَعَكَ -কোন জিনিস তোমাকে বারণ করলো? فَقُلْتُ -তখন আমি বললাম। اِنِّىْ -নিশ্চয়ই আমি। لِىْ -আমাকে। اِذَا -যখন। اِسْتَاْذَنَ -অনুমতি প্রার্থনা করা। اَحَدُكُمْ -তোমাদের মধ্যে কেউ। فَلَمْ يُؤْذَنْ -যদি অনুমতি না পায়। لَه -তার জন্য। فَلْيَرْجِعْ -তবে সে যেন ফিরে যায়। اَقِمْ -প্রতিষ্ঠিত কর। عَلَيْهِ -তার উপর। اَلْبَيِّنَةَ -প্রমাণ। فَذَهَبْتُ -অতঃপর আমি গেলাম। فَشَهِدْتُ -অতঃপর আমি সাক্ষ্য দিলাম।

রাবীর পরিচয়

আসল নাম সা'দ ইবনে মালেক । কুনিয়াত আবু সাঈদ। মদীনার খাযরাজ গোত্রের বনু খুদরা শাখার সন্তান বলে নামের শেষে খুদরী যোগ করা হয়। তাঁর পিতা ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী বয়সের স্বল্পতার কারণে বদর ও ওহুদ যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। কিন্তু পরবর্তীকালে সকল যুদ্ধেই তিনি নবী করীম (সা) এর সাথে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি হাফিযে হাদীস এবং শীর্ষস্থানীয় একজন আলেম ছিলেন। বহু সাহাবী এবং তাবেয়ীগণ তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ৮৪ বৎসর বয়সে তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ১১৭০টি।

হাদীসটির গুরুত্ব

আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন বলেনঃ--

আয়াত --

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ـ

(النور: ٢٧)

হে ঈমানদারগণ! নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য লোকদের ঘরে প্রবেশ করো না, যতোক্ষণ পর্যন্ত ঘরের লোকদের নিকট হতে অনুমতি না পাবে এবং ঘরের লোকদের প্রতি সালাম না পাঠাবে। (সূরা আন নূরঃ৭)

আলোচ্য হাদীস দ্বারা উপরোক্ত আয়াতে কারীমার মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। সামাজিক জীবনে এ হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্যাখ্যা

কোন ব্যক্তিই চায় না যে তার ঘরের মধ্যে অথবা বাড়ীর মধ্যে অপর কোন লোক কোন অনুমতি ব্যতিরেকে সরাসরি প্রবেশ করুক। সে মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিমই হোক না কেন। সমাজে এমন লোকেরও অভাব নেই, যে নিজে এবং পরিবারের প্রতিটি সদস্যই অর্ধনগ্ন হয়ে চলাফেরা করতে পছন্দ করে। তবু বিনা অনুমতিতে কোন আগন্তুক তার গৃহে প্রবেশ করুক এটা সে কোন মতেই বরদাশত করতে পারে না।

তাছাড়া প্রতিটি বিবেকবান মানুষই সাক্ষ্য দিবে যে, অপরের গৃহে প্রবেশ করার পুর্বে গৃহকর্তার অনুমতি নেয়া প্রয়োজন। তবে প্রশ্ন হলো অনুমতি কিভাবে নিতে হবে? সমাজে বিভিন্নভাবে এ রেওয়াজ চালু আছে। কোথাও গলা খাঁকড়ানো বা কাশির মতো শব্দ করে নিজের অস্তিত্বের ঘোষণা দিয়েই অপর গৃহে প্রবেশ করে। আবার কোথাও গৃহকর্তাকে নাম ধরে ডেকে বা অন্য কোন ভাবে সম্বোধন করে তারপর প্রবেশ করে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও আসল সমস্যা থেকেই যায়। কারণ নিজের অস্তিত্বের ঘোষণা দিয়ে সাথে সাথে প্রবেশ করার কারণে গৃহের অন্যান্য সদস্য সদস্যাগণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকে এবং লজ্জার সম্মুখীন হয়। তাই ইসলাম একটি সুন্দর ও সার্বজনীন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। তা হচ্ছে কোন আগন্তুক অপরের গৃহে প্রবেশের পূর্বে তিনবার সালাম দিবে অর্থাৎ আস্ সালামু আলাইকুম বলবে। যদি গৃহকর্তার অথবা গৃহের অন্য কোন সদস্যের সাড়া পাওয়া যায়, তবে তার অনুমতি সাপেক্ষে ঐ গৃহে প্রবেশ করা যাবে। অন্যথায় ফিরে আসতে হবে। তিনবার সালাম দেয়ার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, প্রথমতঃ একবার অথবা দু'বার সালাম গৃহের অভ্যন্তরে কোন সদস্যের কর্ণগোচর নাও হতে পারে কিন্তু তিনবার সালাম দিলে একবার না একবার অবশ্যই গৃহকর্তার কর্ণগোচর হবে। দ্বিতীয়তঃ একবার সালাম দিলে যদিও বা গৃহের সদস্যদের দৃষ্টি

আকর্ষণ হয় তবুও অনেকে সামলে নিতে একটু সময় নেয়। তারপর সে আগন্তুকের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করে। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সালামের অবকাশে সে এ ব্যবস্থাগুলো সম্পূর্ণ করতে পারে। ইসলাম শুধুমাত্র অপরিচিত ব্যক্তির জন্যই এ আইন করেনি বরং পরিবারের সাবালক প্রতিটি পুরুষের জন্যই এ আইন প্রযোজ্য। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ-

আয়াতঃ---

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط (النور:٥٩)

আর তোমাদের ছেলেরা যখন বুদ্ধির পরিপক্কতা পর্যন্ত পৌঁছবে তখন অবশ্যই যেন তারা অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করে। যেমন তাদের বড়োরা অনুমতি নিয়ে আসে। (সূরা আন-নূরঃ৫৯)

মুয়াত্তা ইমাম মালেকের সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে-একবার এক ব্যক্তি নবী করীম (সা) কে জিজ্ঞেস করলোঃ আমি নিজের মায়ের কাছে যেতেও অনুমতি চাইবো? হুজুর (সা) বললেনঃ হ্যাঁ। লোকটি বললোঃ আমি এবং আমার মা একই ঘরে একই সাথে বাস করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ যখন তার কাছে যাবে অনুমতি নিয়ে যাবে। তখন লোকটি বললোঃ আমি আমার মায়ের পরিচর্যাকারী, তাই বার বার য।তায়াত করতে হয়। হুজুর (সা) বললেনঃ তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ দেখতে পছন্দ করো? লোকটি বললোঃ না। তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ তবে অনুমতি নিয়ে তার কাছে যাবে।"

যারা সর্বদা একই গৃহে এক সাথে বসবাস করে এবং সর্বদা এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাতায়াত করে তাদের জন্যও তিন সময়ের নিষেধাজ্ঞা আছে।
আল্লাহ্ রাববুল আলামীন বলেনঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ط مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ

ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ط

(النور ٥٨)

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মালিকানাধীন স্ত্রী - পুরুষ আর তোমাদের সেই সব বালক যারা এখনো বুদ্ধির পরিপক্কতা পর্যন্ত পৌছেনি , (তারা) তিনটি সময় যেন অবশ্যই অনুমতি নিয়ে তোমাদের নিকট আসে । ফজরের নামাযের পূর্বে । দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা কাপড় খুলে রাখো (এবং বিশ্রাম কর) আর ই'শার নামাযের পর । এই তিনটি সময় তোমাদের পর্দা করার সময় । (সূরা আন–নুরঃ ৫৮)

হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। তার বর্ণিত হাদীসও হযরত উমর (রা) সাক্ষ্য ছাড়া গ্রহণ করেননি। কারণ তিনি দু'টো জিনিস প্রমাণ করতে চেয়েছেন। প্রথমতঃ বেদায়াতী ও মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীদের বাধা প্রদান। অর্থাৎ হযরত উমর (রা) এর একথা শুনলে তারা এই ভেবে শংকিত হয়ে পড়বে যে, হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) এর ন্যায় বিশিষ্ট সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসই যখন উমর (রা) সাক্ষ্য ব্যতীত গ্রহণ করেননি। তখন আমাদের মিথ্যা ও বানানো হাদীস কিরূপে গ্রহণীয় হবে? দ্বিতীয়তঃ তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, একমাত্র কুরআন ছাড়া আর কোন কিছুই বিনা যাচাই বাছাইয়ে মানা যাবে না। সাক্ষ্য চেয়ে আবু মুসা আশয়ারী (রা) কে সন্দেহ পোষণ করেননি। কারণ কোন কথার সাক্ষ্য চাওয়া ঐ কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেনা। তাছাড়া হাদীসে রাসূল একজনের চেয়ে একাধিক জন বর্ণনা করা অতি উত্তম।

শিক্ষাবলী

১। অপরের বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে সালামের মাধ্যমে অনুমতি নিতে হবে।

২। নিকটাত্মীয় যে কেউ হোক না কেন অনুমতি ছাড়া কোন ঘরে প্রবেশ করা উচিত নয়।

৩। ছেলে-মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হ'লে অনুমতি নিয়ে গৃহে প্রবেশ করতে হবে।

৪। ফজরের পূর্বে, দুপুরের সময় এবং এশার নামাজের পর কারো ঘরে প্রবেশ করা ঠিক নয়। একান্ত যদি প্রবেশ করতেই হয় তবে অনুমতি নিতে হবে।

৫। কুরআন ছাড়া আর সবকিছুই যাচাই করে গ্রহণ করতে হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ-

হযরত আবু হুরাইরা (রা) হ'তে বর্ণিত –তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেনঃ তোমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে যেতে পারবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মু'মিন না হও। আর তোমরা ততোক্ষণ পুরোপুরি মু'মিন হতে পারবে না যতোক্ষণ না তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলবো না যা করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসার সৃষ্টি হবে? তোমরা সালামের প্রচলন করবে। অর্থাৎ পরিচিতি কি অপরিচিতি সকলেই পরস্পর সালাম করবে। (মুসলিম)

শব্দার্থ

لَاتَدْخُلُوْنَ –তোমরা প্রবেশ করবে না। حَتّٰى –যে পর্যন্ত। تَحَابُّوا –পরস্পরকে ভালবাসবে। اَوَلَا –আমি কি বলবো না? اَدُلُّكُمْ –তোমাদেরকে সুসংবাদ। شَيْءٍ –বস্তু। اِذَا –যখন। فَعَلْتُمُوْا –তোমরা করবে। ه –উহা (এখানে সালাম)। تَحَبَبْتُمْ –তোমরা একে অপরকে ভালবাসবে। اَفْشُوْا –প্রচলন কর/বৃদ্ধি কর। بَيْنَكُمْ –তোমাদের মধ্যে।

হাদীসটির গুরুত্ব

মানব সভ্যতার প্রারম্ভ হতেই একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাতের সময় পরস্পর বিভিন্ন সম্ভাষণের মধ্য দিয়ে ভাব বিনিময় করতো। বিভিন্ন জাতি নিজেদের আদর্শ ও রুচি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন সম্ভাষণ ব্যবহার করে। হিন্দু সম্প্রদায়

নমস্কার, আদাব ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে। আবার ইংরেজ সম্প্রদায় Good morning (শুভ সকাল), Good evening (শুভ সন্ধ্যা), Good night (শুভ রাত্রি), Good bye (শুভ বিদায়) ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে নিজেদের ভাব বিনিময় করে। একমাত্র ইসলামই এমন একটি বাক্য শিক্ষা দিয়েছে যার তাৎপর্য অনেক। আর এ সালামের মধ্য দিয়ে পরস্পর সম্প্রীতির ভিত রচিত হয় এবং এটি একটি উত্তম ইবাদাতও বটে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, ব্যবহারিক জীবনে হাদীসটির গুরুত্ব কতো বেশী।

পটভূমি

প্রাক ইসলামী যুগে আরবদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্ভাষণের প্রচলন ছিলো। কেউ কেউ বলতো اَنْعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَيْنًا (আল্লাহ্ আপনার চক্ষু ঠান্ডা করুন) আবার কেউ বলতো اَنْعَمَ صَبَاحًا (সু প্রভাত) ইত্যাদি। ইসলামের আবির্ভাবের পর নবী করীম (সা) প্রাক ইসলামী যুগে ব্যবহৃত শব্দগুলো বাদ দিয়ে পরস্পরকে অভিবাদন করতে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বাক্যটি ব্যবহার করতে নির্দেশ দেন। এটাকেই বলে সালাম (سَلَامٌ) আধুনিক কালেও পরস্পরের ভাব বিনিময়ে এবং একে অপরের শান্তি কামনায় এর চেয়ে উত্তম কোন সম্প্রীতিমূলক শব্দ আবিষ্কৃতি হয়নি এবং সম্ভবও নয়। ইসলাম যেমন সার্বজনীন ধর্ম তাই এর প্রতিটি কাজই সার্বজনীন।

পবিত্র কুরআনে اَلسَّلَامُ (আস্ সালামু) শব্দটি নবী রাসূলদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ হতে সম্মান ও সুসংবাদ হিসেবে একাধিক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ বলে রাসূলে করীম (সা) এর প্রতি সালাম করতে মুমিনদেরকে (নামাজের মধ্যে) নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আখিরাতে জান্নাতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশের সময় "আস্ সালামু আলাইকুম" বলে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে। বস্তুতঃ পারস্পরিক সম্ভাষণে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বাক্যের চেয়ে উত্তম কোন বাক্য হতে পারে না।

ব্যাখ্যা

سَلَام শব্দটি سِلْمٌ ধাতু হ'তে নির্গত। মূল অক্ষর س - ل - م । تَسْلِيْمٌ এর এসমে মাসদার। অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, আনুগত্য ইত্যাদি। এক মুসলমান অপর মুসলমানকে সালাম প্রদানের মাধ্যমে দু'টি কাজ সম্পাদন করে।

একঃ দু'পক্ষের প্রত্যেকেই একে অপরের জন্য পরম করুণাময়ের দরবারে মঙ্গল কামনা করে। অর্থাৎ প্রত্যেককেই যেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর রহমতের চাদরের নীচে আশ্রয় দেন এবং যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তাঁর কুদরতী হাতে তুলে নেন। সালামের মাধ্যমে প্রকারান্তরে যেন এ কথাগুলোই বলা হয়।

দুইঃ সালামের মধ্যেমে এক মুসলমান অপর মুসলমানকে পরস্পরের পক্ষ হ'তে জান, মাল, ইজ্জত, আব্রু ইত্যাদির গ্যারান্টি দেয় অর্থাৎ প্রত্যেকেই যেন এ ঘোষণা দেয় যে, "আমার নিকট হ'তে তুমি সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ।" কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে সমাজে প্রতিটি মুসলমান একে অপরকে নিরাপত্তা দানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, সে সমাজে অন্যায়, জুলুম, হত্যা, লুণ্ঠন, পরস্বাপহরণ ইত্যাদি কিছুই থাকতে পারে না।

পরিচিত ও অপরিচিত প্রত্যেককেই সালাম দেয়া কর্তব্য। সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে পরিচিত ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক আরো গভীর হয়। এতে পারস্পরিক শত্রুতা ও মনোমালিন্য দূর হয় এবং বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়। পরস্পরের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলতে সাহায্য করে। সালাম আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভের একটি উত্তম উপকরণ। নবী করীম (সা) দেখা সাক্ষাতে সর্বাগ্রে সালাম দিতেন। সুতরাং সালাম আদান-প্রদান রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সুন্নাত। কেউ সালাম দিলে প্রতি উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ (ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম) বলতে হয়। এক ব্যক্তি নবী করীম (সা) কে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইসলামে কোন অভ্যাসটি উত্তম ? রাসুলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ

تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَئُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ -

অপরকে খানা খাওয়ানো এবং পরিচিত-অপরিচিত প্রত্যেককে সালাম দেয়া।

(বুখারী, মুসলিম)

অপর হাদীসে আছে আগে সালাম প্রদানকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট বেশী প্রিয়। নিজের ছেলে-মেয়ে স্ত্রী সবাইকে সালাম দেয়া সুন্নাত। নবী করীম (সা) বলেনঃ

اِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوا عَلٰى اَهْلِهٖ وَاِذَا خَرَجْتُمْ فَاوْدِعُوا اَهْلَهٗ بِسَلَامٍ ـ

যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন গৃহবাসীকে সালাম করবে। আর যখন গৃহ ত্যাগ করবে তখনও গৃহবাসীকে সালাম দিয়ে বের হবে। (বায়হাকী)

অন্য হাদীসে আছেঃ

قَالَ يَا بُنَيَّ اِذَا دَخَلْتَ عَلٰى اَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلٰى اَهْلِ بَيْتِكَ ـ

[(হযরত আনাস (রা) কে উপদেশ দান কল্লে)] নবী করীম (সা) বলেছেনঃ হে বৎস! যখন তুমি তোমার ঘরে প্রবেশ করবে তখন গৃহবাসীকে সালাম করবে। তোমার সালাম তোমার ও তোমার ঘরের বাসিন্দাদের জন্য বরকতের কারণ হবে। (তিরমিযি)

সালাম সংক্রান্ত মাসায়েলঃ

(১) কোন মু'মিন যদি নামায, কুরান পাঠ, পানাহার ইত্যাদি কাজে লিপ্ত না থাকে তবে অপর মু'মিনকে সালাম করা সুন্নাত। সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব।

(২) পায়খানা প্রস্রাবরত অবস্থায় সালাম দেয়া অথবা তার উত্তর দেয়া উভয়ই মাকরুহ (অপছন্দনীয়), যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত ঐ অবস্থায় সালাম দেয় তবে পায়খানা প্রস্রাব হতে অবসর হয়ে সালামের জবাব দিতে হবে। আর ঐ অজ্ঞ ব্যক্তিকে সালামের পদ্ধতি শিখিয়ে দিতে হবে।

(৩) সাথে সাথে সালামের জবাব দেয়া ঠিক নয় বরং সালাম দাতার সালাম প্রদান শেষ হলে তার জবাব দিতে হবে। সালাম দেয়া শেষ না হতেই জাবাব দিলে পুণরায় সালাম শেষে জবাব দিতে হবে।

(৪) اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ এর জবাবে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলা ঠিক নয়। প্রতি উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ বলতে হবে।

(৫) কাফের মুশরিকদেরকে সালাম দেয়া জায়েয নয়। যদি কোথাও মুসলমান

ও কাফের একত্রে থাকে তবে اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى (আস্‌ সালামু আলা মানিত্তাবা আল হুদা) বলে সালাম প্রদান করতে হবে এবং মনে মনে মুসলমানদের জন্য সালামের নিয়্যত করতে হবে।

(৬) সালাম বলার সময় হাত উঠানো অথবা না উঠানো উভয়ই জায়েয। তবে অথবা আঙ্গুলের দ্বারা ইঙ্গিত করা জায়েয নয়। কারণ এটি ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের রীতিনীতি।

(৭) এক দলের মধ্যে একজন সালাম দেয়া অথবা নেয়াই যথেষ্ট। সালাম দেয়া সুন্নাতে কেফায়া এবং উত্তর দেয়া ওয়াজিবে কেফায়া।

(৮) কোন অমুসলিম মুসলমানকে সালাম দিলে শুধু وَعَلَيْكُمْ (ওয়া আলাইকুম) বলে উত্তর দিতে হবে।

(৯) অপরিচিত যুবতী মহিলাকে সালাম দেয়া মাকরূহ্। বৃদ্ধা মহিলাকে সালাম দেয়া জায়েয। যদি কোন বাড়ীতে প্রবেশের সময় সালাম দেয় তবে ঐ বাড়ীতে যারা আছে প্রত্যেককেই সালাম দেয়া হলো। এটি জায়েয।

(১০)। মুহরিম সমস্ত স্ত্রীলোককেই সালাম দেয়া এবং মুহরিম স্ত্রীগণও মুহরিম পুরুষকে সালাম দেয়া জায়েয।

(১১) আরোহী ব্যক্তি পায়ে হাঁটা ব্যক্তিকে সালাম দিবে। চালাচলকারী বসা ব্যক্তিকে সালাম দিবে এবং কম সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে সালাম দিবে।

(১২) ছোট বড়োকে এবং বড়ো ছোটকে সালাম দেয়া জায়েয।

(১৩) একই ব্যক্তির সাথে যদি বার বার দেখা হয় তবে তাকে প্রত্যেক বারই সালাম দেয়া উচিত।

তথ্য সূত্র

(১) মিশকাতুল মাসাবীহ্ আরাফাত পাবলিকেশন্স, ঢাকা
(২) রিয়াদুস সালেহীন-ইমাম নবুবী (রহ)
(৩) তিরমিযি
(৪) আসান ফেকাহ্
(৫) বেহেশ্তী জেওর।

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ - قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ - (مسلم، مشكوة)

"হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) হ'তে বর্ণিত, একবার নবী করীম (সা) সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমারা কি জানো, গীবত কাকে বলে? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। হুজুর (সা) বললেন–তোমার মুসলমান ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে অপছন্দ করে। জিজ্ঞেস করা হলো, যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সে ত্রুটি বর্তমান থাকে, যা আমি বলবো। হুজুর (সা) বললেন, তুমি যা বলবে তা যদি তার ভিতর পাওয়া যায় তবে সেটি হবে গীবত। আর যদি না পাওয়া যায় তবে তা হবে বুহতান (মিথ্যা অপবাদ।)" (মুসলিম, মিশকাত)

শব্দার্থ

اَ –কি? تَدْرُوْنَ –তোমরা জান। مَا –কি? اَلْغِيْبَةُ –গীবত, পরনিন্দা। اَعْلَمُ –অধিক জানে। ذِكْرُكَ اَخَاكَ –তোমার ভাইয়ের কথা। بِمَا –যা। يَكْرَهُ –সে অপছন্দ করে। قِيْلَ –বলা হলো (Passive Voice)। اَفَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِيْهِ –যদি তার মধ্যে সে ত্রুটি দেখা যায়? اَخِىْ –আমার ভাই। مَا تَقُوْلُ –যা বলবে। فَقَدِ اغْتَبْتَهُ –তবে গীবত করলে। وَ –এবং। اِنْ –যদি। لَمْ يَكُنْ –না থাকে। فِيْهِ –তার মধ্যে। فَقَدْ بَهَتَّهُ –তখন বুহ্তান বা মিথ্যা অপবাদ দিলে।

রাবীর পরিচয়

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) এর ইসলাম পূর্ব নাম ছিলো 'আবদে শামস' অর্থ- 'অরুন দাস'। মুসলমান হবার পর রাসূলে করীম (সা) তাঁর নাম রাখেন আব্দুর রহমান অর্থ- রহমানের দাস। আবু হুরাইরাহ তার কুনিয়াত বা উপনাম। আবু হুরাইরাহ (রা) ৭ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন হতে মসজিদে নববীতেই অবস্থান করেছেন। তিনি ছিলেন 'আহলে ছুফ্‌ফাদের' একজন। ঘর-সংসার, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু বিসর্জন দিয়ে সর্বক্ষণ মহানবী (সা) এর খেদমতে পড়ে থাকতেন। শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোথাও পাঠালে বা কোন দায়িত্ব দিলে তিনি তৎক্ষনাৎ তা পালন করতেন। তিনি মাত্র সাড়ে তিন (৩$\frac{১}{২}$) বৎসরের মতো নবী করীম (সা) এর সান্নিধ্য পান। এ সময়ের মধ্যেই তিনি যে হাদীস মুখস্ত করেছিলেন তা আর কোন সাহাবীই পারেননি। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) নিজেই বলেছেন, "আবু হুরাইরাহ জ্ঞানের আধার"।

তিনি হিজরী ৫৯ সনে ৭৮ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ৫,৩৭৪টি। তাঁর ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ৮০০।

হাদীসটির গুরুত্ব

গীবত ইসলামের দৃষ্টিতে মহাপাপ। এর মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ববোধ বিনষ্ট হয় এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। কেননা যতো বড়ো অপরাধীই হোক না কেন সে চায় না যে তার অনুপস্থিতিতে তার কোন ত্রুটি নিয়ে অপর কোন ব্যক্তি আলোচনা করুক।

তাছাড়া একটি সুন্দর ও আদর্শ সমাজ গঠনের অন্যতম শর্ত হচ্ছে ভ্রাতৃত্ববোধ ও পরস্পর সহানুভূতি। কিন্তু গীবত একে অপরের সম্পর্ককে বিষাক্ত করে তোলে এবং সমাজের ঐক্য ও শান্তির ভিত্তি ভেঙ্গে দেয়। তাই সমাজের ঐক্য ও শান্তি বজায় রাখতে হলে এ হাদীসের অনুসরণ করা একান্ত অপরিহার্য

ব্যাখ্যা

গীবত একটি জঘন্য পাপ। আল কুরআন একে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার

তুল্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে এবং হাদীসে যেনা বা ব্যভিচারের চেয়েও খারাপ কাজ বলা হয়েছে। মহান আলাহ্ বলেনঃ

لَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ - (الحجرات)

"কেউ কারো গীবত করো না। তোমরা কি কেউ আপন মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খাওয়া পছন্দ করবে? একে তো তোমরা অবশ্যই ঘৃণা করবে।" (সূরা আল হুজুরাত)

নবী করীম (সা) বলেনঃ

اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا - قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِىْ فَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَا يُغْفَرُ حَتّٰى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ - (بيهقى، مشكوٰة)

"গীবত যেনার চেয়েও মারাত্মক। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! গীবত কি করে যেনার চেয়ে মারাত্মক? তখন নবী করীম (সা) বললেন, কোন ব্যক্তি যেনা করার পর যখন তওবা করে আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন। কিন্তু গীবতকারীকে যার গীবত করা হয়েছে সে যদি মা'ফ না করে আল্লাহ্ মা'ফ করবেন না।" (বায়হাকী, মিশকাত)

এই গীবতের কারণে পরকালে কতো ভয়াবহ আজাবের সম্মুখীন হতে হবে তার কিঞ্চিত আভাস নবী করীম (সা) কে মি'রাজের রজনীতে দেখানো হয়েছে। হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُرِجَ بِىْ رَبِّىْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ اَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ

هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرَئِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِىْ اَعْرَاضِهِمْ ـ (ابو داؤد)

—"নবী করীম (সা) বলেছেন, যখন আল্লাহ্ পরওয়ারদিগার আমাকে মি'রাজে নিয়ে গেলেন। আমি সেখানে এমন লোকদের নিকট দিয়ে গেলাম যাদের নখ তামার তৈরী। ঐ সব নখ দিয়ে তারা তাদের মুখমন্ডল ও বক্ষদেশ খামচিয়ে ঘা করছিলো আমি জিব্রাইল (আ) কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? জিব্রাইল বললেন' এরা ঐ সকল লোক যারা মানুষের মাংস খায় অর্থাৎ গীবত করে এবং মানুষের পিছনে (ইজ্জত নষ্ট করার জন্য) লেগে থাকে। (আবু দাউদ)

গীবতের আরেক রূপ হচ্ছে কুটনামী বা চোগলখোরী। চোগলখোরী বলা হয় একের কথা অপরকে বলে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ও ঝগড়া সৃষ্টি করা। ইসলামের দৃষ্টিতে এটিও একটি জঘন্য অপরাধ। নবী করীম (সা) বলেনঃ

مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانٌ مِّنْ نَارٍ ـ (دارمى)

"যে ব্যক্তি পৃথিবীতে দ্বিমুখী হবে (অর্থাৎ এখানে এক কথা ওখানে অন্য কথা বলে), কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের জিহ্বা হবে।" (দারেমী)

অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ (بخارى، مسلم)

"চোগলখোর কখনো বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলেনঃ

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّمِيْمَةِ وَنَهٰى عَنِ الْغِيْبَةِ وَالْاِسْتِمَاعِ اِلَى الْغِيْبَةِ ـ (راه عمل: ٢ج)

"নবী করীম (সা) চোগলখোরী থেকে বারণ করেছেন। অনুরূপভাবে গীবত করা এবং গীবত শোনা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। (রাহে আমল, ২য় খন্ড)

ব্যতিক্রম

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে গীবত বলে গণ্য হয় নাঃ

(১) কারো সাক্ষাতে তাকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করায় পাপ হবে না।

(২) কারো অগোচরে তাকে সংশোধনের নিমিত্তে কয়েকজন মিলে পরামর্শকালে তার কোন দোষ আলোচনা হ'লে তাতে কোন অপরাধ হবে না। তবে লোক সমাজে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে হলে সম্পূর্ণ হারাম।

(৩) খোদাদ্রোহী, ধোকাবাজ, বেদয়াতী অথবা দীনের ক্ষতিকারী কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার দোষ-ত্রুটি আলোচনা করে লোকদের সতর্ক করা কোন দোষের ব্যাপার নয়।

(৪) বিচারকের নিকট আসামীর দোষ-ত্রুটি তুলে ধরা অবৈধ নয়।

(৫) বিচারক, শাসক ও নেতা যদি অবিচার, অত্যাচার, স্বজনপ্রীতি, উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদি দোষে দোষী হয়। তবে জন সমাবেশে তার নিন্দা করা বৈধ।

(৬) বকধার্মিক, ভন্ডপীর-দরবেশের ভন্ডামী সম্বন্ধে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা জায়েয।

(৭) বিয়ে শাদীর ব্যাপারে যদি কেউ পরামর্শ চায় তবে ছেলে-মেয়ের দোষ-ত্রুটি জানা থাকলে তাকে বলতে হবে এ ক্ষেত্রেও কোন পাপ হবে না। বরং ছেলে-মেয়ের কোন দোষ-ত্রুটি গোপন করা পাপ।

(৮) কোন মুনাফিক, ফাসিক অথবা মুরতাদের নিন্দা করা জায়েয।

কৃত গীবতের হুকুম

যার গীবত করা হয়েছে যদি সেই ব্যক্তি জীবিত থাকে এবং সম্ভব হয় তবে তার নিকট মাফ চেয়ে নিতে হবে। আর যদি সে জীবিত না থাকে কিংবা সে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে তবে তার গুনাহ্ মাপের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করতে হবে এবং নিজের জন্যও দু'আ করতে হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَفِىْ رِوَايَةٍ وَلَا تَنَافَسُوْا ـ

আবু হুরাইরা (রা) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন–নবী করীম (সা) বলেছেনঃ তোমরা (কোন ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে) কুচিন্তা হ'তে বেঁচে থাকো। কেননা কুচিন্তা সব চেয়ে বড়ো মিথ্যা কথা। কারো দোষ অনুসন্ধান করে বেড়িও না। এমন কি ভালো বিষয়েও গোয়েন্দাগিরি করো না। (কোন জিনিস ক্রয় কালে) এক জনের দরের উপর দিয়ে দর করো না। পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা রেখো না। আর অপর ভাইয়ের গীবত করো না। তোমরা প্রত্যেকেই 'ইবাদুল্লাহ' (আল্লাহ্‌র দাস) এবং পরস্পর ভাই হয়ে যাও। অপর বর্ণনায় আছে– তোমরা কেউ কারো জিনিসের উপর লোভ করো না। (বুখারী, মুসলিম)

শব্দার্থ

ظَنّ –খারাপ ধারণা করা, কুচিন্তা। اَكْذَبُ –বড়ো মিথ্যা اسم تفضيل বা (Supperlative Degree)। اَلْحَدِيْثُ –কথাবার্তা, রাসূলের বাণী। تَحَسَّسُوْا –ভালো খবরের অনুসন্ধান করা। تَجَسَّسُوْا –দোষ অনুসন্ধান করে বেড়ানো। تَنَاجَشُوْا –একজনের দরের উপর অপর জনের দর করা। تَحَاسَدُوْا –পরস্পর হিংসা করা تَبَاغَضُوْا –পরস্পর গীবত করা। تَدَابَرُوْا –একে অপরের পিছনে লেগে থাকা। كُوْنُوْا –হয়ে যাও। عِبَادَ اللّٰهِ –আল্লাহ্‌র ইবাদাতকারী, আল্লাহ্‌র দাস। اِخْوَانًا –ভাই-ভাই (এক বচনে اَخٌ –ভাই)। تَنَافَسُوْا –পরস্পর লোভ করা।

রাবীর পরিচয়

দারসে হাদীস ২য় খন্ডের ২ ও ৯নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

হাদীসটির গুরুত্ব

উক্ত হাদীসের লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামী সমাজকেঐক্য, সংহতি, সমবেদনা, সংবেদনশীলতা, প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের একটি সুন্দর অট্টালিকা রূপে প্রতিষ্ঠিত করা। যে সব কারণে ইসলামী সমাজের ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয়ে খন্ড-বিখন্ড হয় এবং একে অপরের উপর খড়গহস্ত হয় অত্র হাদীসে সেই কারণ গুলোকে চিহ্নিত করে তার প্রতিকার বিধান করা হয়েছে। ব্যক্তির প্রতি খারাপ ধারণা রাখা, কারো গোপন বিষয় অনুসন্ধান করা, পরস্পর হিংসা-দ্বেষ, একে অন্যের পিছনে তার দোষ-ত্রুটি গেয়ে বেড়ানো, এগুলো ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সম্প্রীতিকে নস্যাত করে দেয়। ফলে মুসলিম সমাজে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। ঝগড়া কলহ আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তোলে। পরিণামে সমাজ আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থবাদিতায় ভরে ওঠে। সমাজের এসব ছোট-খাট ছিদ্রপথ বন্ধ করতে এ হাদীসটি অদ্বিতীয়।

ব্যাখ্যা

আল্-কুরআনে সূরা হুজুরাতে বলা হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا-

হে ঈমানদারগণ! খুব বেশী খারাপ ধারণা পোষণ হতে বিরত থাকো। কেননা কোন কোন ধারণা পাপ। আর তোমরা কারো বিষয়ে অনুসন্ধান করে বেড়িও না।

(সূরা আল হুজুরাতঃ১৫)

উপরোক্ত আয়াতের দৃষ্টিতে চিন্তা করলে বুঝা যায়, ধারণা অনুমান একেবারে নিষিদ্ধ নয়। তবে প্রতিটি ব্যাপারে নিছক ধারণা অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলা নিষিদ্ধ। ধারণা অনুমান কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। সবগুলো পাপ নয়। যেমন-

একঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা এবং যে সমস্ত মু'মিনের সাথে সার্বক্ষণিক দেখা-সাক্ষাৎ, লেন-দেন, মেলামেশা, তাদের প্রতি ভালো ধারণা রাখা অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ।

দুইঃ এক ধরনের ধারণা-অনুমান আছে যা প্রয়োগ ছাড়া উপায় নেই। যেমন আদালতে বিচারাচারের সময়। তাছাড়া আরও বহু ব্যাপার আছে, চিন্তা-ভাবনা, পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ধারণা অনুমান ছাড়া চলতে পারে না। চিন্তা জগতের প্রসারতা, উন্নতি ও উৎকর্ষতা এ ধারণা অনুমানের ভিত্তিতে সম্ভব হয়েছে।

তিনঃ এক প্রকারের ধারণা-অনুমান এমন যা খারাপ হলেও জায়েয। যেমন কোন ব্যক্তি বা দলের চরিত্রে, কাজ-কর্মে, লেন-দেনে, সম্পর্ক-সম্বন্ধ রক্ষায় এবং বাহ্যিক অন্যান্য আচার-আচরণে এমন নিদর্শন পাওয়া যায় যে, তার প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করার আর কোন উপায় থাকে না, এমন অবস্থায়ও তার প্রতি শুধু ভালো ধারণাই পোষণ করতে হবে একথা ইসলাম বলেনা।

চারঃ আরেক প্রকারের ধারণা-অনুমান হচ্ছে কারো সম্পর্কে অকারণে খারাপ ধারণা পোষন করা। এমন কোন কথা বা কাজ যার দ্বারা ভালো অথবা খারাপ উভয়েই মনে করা যায়। এক্ষেত্রে ভালোর দিকটি উপেক্ষা করে শুধু খারাপের দৃষ্টি কোণ থেকে চিন্তা করা ঠিক নয়। এটাই পাপ। যেমন কোন ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার সময় নিজের জুতার পরিবর্তে অপরের জুতা হাতে নেয়া। এ অবস্থায় সে জুতা চুরি করার জন্য হাতে নিয়েছে এ কথা বলা যায় না কেননা ভুলেও এরূপ ঘটা স্বাভাবিক।

বস্তুত নিজের ধারণা-অনুমানকে নিরংকুশ, নিঃসন্দেহ বা শর্তহীন বানিয়ে নেয়া কেবলমাত্র সেই লোকদেরই কাজ হতে পারে যারা আল্লাহ্কে ভয় করে না এবং পরকালের শাস্তি সম্বন্ধে কোন খবরই রাখে না। অত্র হাদীসে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে- একে অপরের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়িও না। অর্থাৎ লোকদের গোপন তত্ত্ব ও তথ্য তালাশ করো না। অন্য হাদীসে বলা হয়েছে-

وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ -

মুসলমানদের দোষ খুঁজে বেড়িও না; কারণ যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ ও গুনাহ্ খুঁজতে থাকে তখন আল্লাহ্ও তার গোপন দোষ ফাঁস করতে লেগে যান। আর আল্লাহ্ যার পিছে লেগে যান তাকে তিনি অপমান করেই ছাড়েন। সে তার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকুক না কেন। (তিরমিযি)

আবু বকর আল্ জাসসাস তাঁর আহকামুল কুরআনে এ ব্যাপারে যে সমস্ত হাদীস সংকলন করেছেন, সেখানে বলা হয়েছেঃ নবী করীম (সা) বলেন-

إِذَا ظَنَنْتُمْ فَلَا تُحَقِّقُوا -

কোন লোক সম্পর্কে তোমার মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হলে তা যাচাই করতে চেষ্টা করো না।

অপর হাদীসে বলা হয়েছে-

مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْءُدَةً -

যে ব্যক্তি অপর ভাইয়ের গোপন ক্রটি দেখতে পেয়েও তা গোপন রাখলো, সে যেন একটি জীবন্ত প্রোথিত মেয়েকে মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করলো।

এক জনের দরের উপর দর করাঃ হাদীসে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ কোন মাল ক্রয় বিক্রয়ের সময় বিক্রেতার সাথে ক্রেতার কথাবার্তা। কোন একটি মাল কেনার উদ্দেশ্যে কোন ক্রেতা দর কষাকষি করছে এমতাবস্থায় অপর কোন ব্যক্তি একই সময়ে উক্ত মালের দর-দাম করা বৈধ নয়। হ্যাঁ, যদি পূর্ব ব্যক্তির সাথে দর-দামে বনিবনা না হয় এবং সে স্থান ত্যাগ করে চলে যায় তবে ঐ মালের দাম করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (রাহ) এর মুয়াত্তায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এর বর্ণনায় নবী করীম (সা) হতে একটি হাদীস বর্নিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ

لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ -

তোমাদের মধ্যে যেন কেউ কোন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা চলাকালীন সময়ে (একই বস্তুর) দর-দাম না করে। [মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ (রা) পৃঃ ৪৯৬ হাদীস ৭৮৬]

হিংসা-বিদ্বেষঃ হিংসার অপর নাম পরশ্রীকাতরতা। এটি একটি ঘৃণ্য ব্যাধি। একবার কারো ভিতরে প্রবেশ করলে সহজে এ ব্যাধিটি সারার নয়। এই ব্যাধির কবলে পড়ে শুধুমাত্র আন্তরিক সম্পর্কই নষ্ট হয় না ঈমানও বিপন্ন হয়ে পড়ে। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ -

পূর্বেকার উম্মতদের ব্যাধি তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আর এ ব্যাধি হচ্ছে হিংসা ও শত্রুতা যা মুন্ডন করে দেয়। অবশ্য চুল মুন্ডল করে দেয় একথা আমি বলছিনা বরং দীনকে মুন্ডন করে দেয়। (তিরমিযি, আহমদ)

হিংসার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জনাব খুররম জাহ্ মুরাদ 'ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক' নামক বইতে বলেন-

"কোন মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া কোন নেয়ামত, যেমন- ধন-দৌলত, জ্ঞান-বুদ্ধি বা সৌন্দর্য- সুষমাকে পছন্দ না করা এবং তার থেকে এ নেয়ামতগুলো ছিনিয়ে নেয়া হোক, মনে মনে এটা কামনা করা। হিংসার ভিতর নিজের জন্যে নিয়ামতের আকাংখার চেয়ে অন্যের থেকে ছিনিয়ে নেবার আকাংখাটিই প্রবল থাকে।"

কারো উপর হিংসার পরিণতি কখনো কল্যাণকর হয় না, বরং ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

নবী করীম (সা) বলেনঃ

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ -

তোমরা হিংসা হতে বেঁচে থাকো। কারণ আগুন যেমন লাকড়ীকে খেয়ে ফেলে, হিংসা ঠিক তেমনি নেকী ও পুণ্যকে খেয়ে ফেলে । (আবু দাউদ)

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনও হিংসা এবং হিংসুক থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় কামনার পরামর্শ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ-

(আমি আশ্রয় চাচ্ছি) হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে।

(সূরা আল ফালাকঃ ৬)

গীবত ঃ (বিস্তারিত জানার জন্য ৯নং হাদীস দ্রষ্টব্য)

আল্লাহ্র বান্দা বা ইবাদুল্লাহ্ঃ ইবাদাল্লাহ্ শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র দাস বা আল্লাহ্র ইবাদাতকারী। অন্য কথায় আল্লাহ্র নির্দিষ্টসীমা লংঘন না করে জীবন যাপনকারী । একজন ইবাদুল্লাহ্র প্রকৃতিই হচ্ছে সে প্রতিটি দুনিয়াদারী কাজকে দীনদারীতে রূপান্তরিত করে তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেমন বিয়ে- শাদী, ব্যবসা- বানিজ্য, গৃহকর্ম, প্রস্রাব- পায়খানা ইত্যাদি দুনিয়াদারী কাজ। কিন্তু যখনই এ সমস্ত কাজকে আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক সম্পাদন করা হয় তখন আর তা দুনিয়াদারী কাজ থাকে না; দীনদারীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে জীবন-যাপন করাঃ এটিও মু'মিন জীবনের মূলনীতি। আল্লাহ্ স্বয়ং প্রত্যেক মুমিনের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন। সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছেঃ--

فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا-

তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহে পরস্পর ভাই হয়েছো। (সূরা আলে ইমরানঃ ১০৩)

অন্যত্র বলা হয়েছে-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ-

"অবশ্যই মুমিনগণ একে অপরের ভাই ।"

এ রকম ভাইয়ের সম্পর্ক যখন মুসলমানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন কেউ কারো সম্পদের উপর লোভ তো করবেই না বরং আরেক ভাইয়ের কল্যাণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিবে। যেমন ঘটেছিলো আনসার ও মুহাজির সাহাবাদের মধ্যে এবং ইয়ারমুকের যুদ্ধের ময়দানে।

উক্ত হাদীসের তাৎপর্য তখনই পরিস্ফুটিত হয়ে উঠবে যখন এমন একটি সমাজ বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে প্রতিটি মানুষই উপরোক্ত হাদীসের আলোকে তাদের জীবন প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করবে।

তথ্য সূত্র

১। মিশকাতুল মাসাবীহ-আরাফাত পাবলিকেশন্স
২। তাফহীমুল কুরআন- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ)
৩। মুয়াত্তা-ইমাম মুহাম্মদ (রহ)
৪। তিরমিযি
৫। আবু দাউদ
৬। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক- খুররম জাহ্ মুরাদ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلٰى صَاحِبِهٖ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ-

(موطا امام محمد)

" আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ ক্রেতা এবং বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের উভয়ের জন্য ক্রয় – বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ থাকে। কিন্তু ক্রয়—বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার অবকাশের শর্তারোপ করলে ভিন্ন কথা। " (মুয়াত্তা' ইমাম মুহাম্মদ)

শব্দার্থ

اَلْمُتَبَايِعَانِ – ক্রেতা–বিক্রেতা। كُلُّ وَاحِدٍ –প্রত্যেক। مِنْهُمَا –তাদের দু জনের মধ্য হতে। بِالْخِيَارِ –অবকাশ। عَلٰى –উপর। صَاحِبِهٖ –তার সঙ্গী। لَمْ يَتَفَرَّقَا –উভয়ে পৃথক হয় না। بَيْعٌ –বিক্রি।

রাবীর পরিচয়

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) ছিলেন দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমার (রা) এর পুত্র এবং হুজুরে পাক (সা) এর সাহাবী। তিনিও পিতার মতো উঁচু স্তরের একজন আলেম এবং বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন ফকীহ্ মুফাচ্ছির ও মুহাদ্দিস। তিনি মর্যাদা ও পূর্ণতার উচ্চ আসনে সমাসীন ছিলেন। তাঁর এ মর্যাদায় অনেকে ঈর্ষা করতেন। ইলমে ফিকাহ্র বিভিন্ন মাসয়ালা -মাসায়েল সংক্রান্ত ব্যাপারে অত্যন্ত দুরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। এমনকি বিশিষ্ট সাহাবা কেরামগণও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) এর ইজতিহাদকৃত মাসয়ালার উপর আমল করতেন। সত্যি কথা বলতে কি, ইমাম মালেক (রা) এর মালেকী মাযহাব

মূলত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এর উদ্ভাবিত মাসয়ালা এবং ফতোয়ার উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইমাম মালেক (রাহ) এর মুয়াত্তায় বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) শুধু সূরা বাকারা নিয়েই ১৪ বৎসর গবেষণা করেছেন।

হিজরী ৭০ সনে ৮০ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ১০৩৬টি মতান্তরে ১৬৩০টি। বুখারী, মুসলিমের ঐক্যমতের হাদীস ১৭০টি। তাছাড়া বুখারী ৮১টি এবং মুসলিম ৩১টিতে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। (আরও জানতে হ'লে দেখুন দারসে হাদীস ১ম খন্ড)

হাদীসটির গুরুত্ব

মানুষ সমাজে বসবাস করতে হলে লেন-দেন, আদান-প্রদান এবং বেচা-কেনা এগুলো ছাড়া কোন মতেই চলতে পারে না । তাই বলে কোন নিয়মনীতির পরওয়া না করে স্বেচ্ছাচারিতাও করতে দেয়া যায় না। এজন্যই মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন মানুষকে কিছু নিয়মনীতি বেঁধে দিয়েছেন মানুষ এগুলোকে মেনে চললে প্রভূত কল্যাণ লাভ করবে। অত্র হাদীসে কোন জিনিস কেনা-বেচা করলে ঐ জিনিস সম্বন্ধে ক্রেতা এবং বিক্রেতা কতোক্ষণ পর্যন্ত অভিযোগ করতে পারে তার সময় সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা

ক্রয়- বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে ক্রেতা- বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ রয়েছে। মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী সাহেব অনূদিত মিশকাত শরীফ ৬ষ্ঠ খন্ডে নিম্নলিখিত কারণগুলো উল্লেখ করেছেন। যেমন-

(১) ক্রেতা পণ্য না দেখে শুধুমাত্র মৌখিক বর্ণনার উপর ভিত্তি করে তা ক্রয় করেছে। এক্ষেত্রে পণ্যের কোন দোষত্রুটি না থাকলেও শুধু পূর্বে না দেখার অজুহাতে সে ক্রয়চুক্তি প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এক্ষেত্রে বিক্রেতা, ক্রেতার সাথে কোন অভদ্র আচরণ করতে পারবে না। করলে গুনাহ্গার হবে। ইসলামে বানিজ্য আইনের পরিভাষায় এটিকে 'খয়ারুর রুইয়াত' (خيار الرؤيات) বলা হয়।

(২) ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর এমনকি মূল্য পরিশোধ করার পর পণ্যের মধ্যে কোনরূপ ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে (যে সম্পর্কে পূর্বে কোন মীমাংসা হয়নি) ক্রেতার জন্য এ চুক্তি প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ থাকে। এতে বিক্রেতা কোন আপত্তি করতে পারবেনা। ইসলামী পরিভাষায় এটিকে 'খিয়ারুল আয়েব' (خيارالعيب) বলা হয়।

(৩) ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েই অথবা যে কোন একপক্ষ যদি চুক্তি সম্পাদনের সময় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা ভঙ্গ করার শর্ত রাখে তবে সেক্ষেত্রেও শর্তারোপকারী ক্রয় বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এটিকে বলা হয় 'খিয়ারুশ শর্ত' (خيارالشرط)।

(৪) বিক্রেতা কোন পণ্য নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ক্রেতা ঐ পণ্য নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করার জন্য বিক্রেতাকে বাধ্য করতে পারে। যদি তারা ক্রয়-বিক্রয় চুড়ান্ত হওয়ার পূর্বে পরস্পর পৃথক হয়ে না যায়।

(৫) অনুরূপভাবে ক্রেতা কোন পণ্য নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় করার প্রতিশ্রুতি দিলো। তবে বিক্রেতা ঐ পণ্য নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করার জন্য ক্রেতাকে বাধ্য করতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে যদি তারা ক্রয় বিক্রয় চুড়ান্ত হওয়ার পূর্বে পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়।

উল্লেখিত ক্ষেত্রদ্বয়ে যদি ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর পৃথক হয়ে যায় তবে একে অপরকে প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না। ইসলামী পরিভাষায় এটিকে বলা হয় 'খিয়ারুল আকদ' (خيارالعقد) ।

(৬) ক্রয় বিক্রয়ের কথাবার্তা চুড়ান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু ক্রেতা-বিক্রেতা এখনো পরস্পর থেকে পৃথক হয়নি, স্ব স্ব স্থানে আছে। এমতাবস্থায়ও ক্রেতা অথবা বিক্রেতা কোন কারণ ব্যতিরেকে এই ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাহার করতে পারে। এ অবকাশকে বলা হয় খিয়ারুল মজলিস (خيارالمجلس)।

কিন্তু শর্ত হচ্ছে যদি একজন অপর জনকে বলে, আমার মাল গ্রহণ করলেন তো? অথবা আপনার মাল আমাকে দিলেন তো? উত্তরে অপরজন বললো, দিলাম অথবা নিলাম। তবে এক্ষেত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হলেও ক্রয় বিক্রয় প্রত্যাহার করার অবকাশ থাকে না।

এছাড়াও বিক্রি বৈধ অবৈধ হওয়ার অনেক গুলো কারণ হাদীসে উল্লেখ করা

হয়েছে। নিম্নে কিছু আলোচনা করা হলোঃ

(ক) বাকীতে ক্রয় বিক্রয়ের পর নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে যদি ক্রেতা প্রস্তাব দেয় যে, ধার্য্যকৃত টাকার চেয়ে কম নিলে নগদ পরিশোধ করে দিবো। তবে বিক্রেতা এবং ক্রেতার কারো জন্যই এ প্রস্তাব মেনে নেয়া বৈধ নয়। ইমাম মুহাম্মদের মুয়াত্তায় আবু সালেহ্ ইবনে উবায়েদ থেকে এর সমর্থনে এক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ أَبِي صَالِحٍ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْلَى السَّفَّاحِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاعَ بَزًّا مِنْ أَهْلِ دَارِ النَّخْلَةِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ أَرَادُوا الْخُرُوجَ إِلَى كُوفَةِ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَنْقُدُوهُ وَيَضَعَ عَنْهُمْ فَسَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ لَا آمُرُكَ وَأَنْ تَأْكُلَ ذَالِكَ وَلَا تُوكِلَهُ -

আবু সালেহ বিন উবায়েদ (রা) (সাফাহের আজাদকৃত গোলাম) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি দারুণ নাখলার লোকদের নিকট নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধারে (বাকী) কাপড় বিক্রি করলেন। এর কিছুদিন পর তারা কূফায় স্থানান্তর হবার প্রস্তুতি নিলো এবং তাঁকে বললো, কিছু কম নিলে নগদ মূল্য পরিশোধ করে দিবো। আবু সালেহ (রা) এ সম্পর্কে হযরত যায়েদ বিন সাবিতের নিকট পরামর্শ চাইলেন। তিনি (যায়েদ বিন সাবিত) বললেন, আমি তোমাকে তা ভোগ করার জন্য বা করানোর জন্য অনুমতি দিতে পারি না।

(খ) গাছের ফল খাওয়ার বা কাজে লাগার উপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রি করা ঠিক নয়। নবী করীম (সা) এটি নিষেধ করেছেন।

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ -

গাছের ফল (খাওয়ার বা কাজে লাগার) উপযোগী হওয়ার পূর্বে ক্রয় বিক্রয় করতে নবী করীম (সা) নিষেধ করেছেন।

অবশ্য হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ফুল থেকে ফল বের হয়ে যাওয়ার পর যে কোন অবস্থায়ই তা বিক্রি করা যেতে পারে। তবে ক্রয় বিক্রয়ের সময় ফল পাকা

পর্যন্ত গাছে রাখার শর্তারোপ করা অবৈধ। কিন্তু যদি এরূপ কোন শর্তারোপ না করে এবং ঝগড়া বিবাদের আশংকা না থাকে তবে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তা পাকা পর্যন্ত গাছে রেখে দেয়ায় কোন দোষ নেই। [মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ (রহ) বাংলা সংস্কারণের পাদটীকা হাওয়ালা ফাইদুল বারী]

ইমাম মুহাম্মদ (রহ) বলেনঃ ফল পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত গাছে থাকার শর্ত সহ বিক্রি করা অবৈধ। তবে তা পাকার কাছাকাছি গেলে অথবা দু'একটি পাকলে এরূপ শর্তারোপে কোন দোষ নেই। কাজেই ফল যদি সবুজ থাকে তাতে হলুদ কিংবা লাল রং না এসে থাকে তবে তা শর্ত দিয়ে ক্রয় বিক্রয় ঠিক নয়। বরং গাছে রেখে কেটে কেটে অথবা কিছু কিছু ছিড়ে নিয়ে বিক্রি করার শর্তারোপ করা যেতে পারে। হাসান বসরী (রহ) হতেও অনুরূপ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

(গ) অনেকে গাছের অথবা বাগানের ফল বিক্রি করে। কিছু অংশ নিজেদের জন্য রেখে দেয়। এতে কোন দোষ নেই। "আবদুর রহমান কন্যা আমরাহ নিজের বাগান বিক্রি করতেন এবং তা থেকে কিছু ফল বাদ রাখতেন" (মুয়াত্তা, মুহাম্মদ)

(ঘ) অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয় বিক্রয় করা অবৈধ। যেমন মাছ ধরার পূর্বে, পাখী শিকারের পূর্বে বিক্রি করা ইত্যাদি। কোন কোন এলাকায় অগ্রিম টিকেট কিনে ছিপ ফেলে মাছ ধরার জন্য যে প্রথা চালু আছে তা সম্পূর্ণ অবৈধ। হাদীসে বর্ণিত আছে نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয় বিক্রয় করতে নবী করীম (সা) নিষেধ করেছেন।

আবুদাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্, মুসনাদে আহমদ ইত্যাদি গ্রন্থে নবী করীম (সা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন- "এমন কোন বস্তু বিক্রি করবে না যা (প্রকৃত পক্ষে) তোমার নিকট নেই।"

এছাড়াও এতদসংক্রান্ত হাদীস হযরত আবু হুরাইরাহ্, ইবনে আব্বাস, সাহ্ল ইবনে সা'দ, আনাস ইবনে মালেক, আলী ইবনে আবি তালিব, ইমরান ইবনে হুসাইন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাদি আল্লাহু তা'আলা আনহুম) প্রমুখ সাহাবাগণ কর্তৃক মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, ইবনে হিব্বান, ইবনে মাজাহ্, দারাকুতনী, তাবারানী, আবু দাউদ, বায়হাকী ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

(ঙ) কোন খাদ্য দ্রব্য ক্রেতার হস্তগত হবার পূর্বে তা বিক্রি করা যাবে না। কেননা নবী করীম (সা) বলেন-

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ -

"যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করেছে সে যেন তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি না করে।" হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন- "সব জিনিস ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এ নীতি প্রযোজ্য বলে আমি মনে করি।"

(চ) তৈলবীজের বিনিময়ে তৈল এবং গোশ্‌তের বিনিময়ে গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হারাম-

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ - (شرح سنة)

"নবী করীম (সা) গোশ্‌তের বিনিময়ে পশু ক্রয়- বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন"। (শরহে সুন্নাহ্)

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর সুযোগ্য ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ (রহ) বলেন- আমরা (হানাফীগণ) এ হাদীসের উপর আমল করি।

কারণ কোন ব্যক্তি জীবিত ছাগলের বিনিময়ে গোশ্‌ত বিক্রি করলো। তার জানা নেই যে, বিক্রিত গোশ্‌তের পরিমাণ বেশী হবে, না ক্রয়কৃত ছাগলের গোশ্‌তের পরিমাণ বেশী হবে। এ ধরণের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল এবং নাজায়েয। এটি মুযারানা[১] ও মুহার্হলারই[২] অনুরূপ।

(ছ) কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দুই পক্ষের কথাবার্তা হচ্ছে এমতাবস্থায় কোন তৃতীয় পক্ষ সেখানে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত আলোচনা করা ঠিক নয়। আর যদি দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে অথবা দালালীর উদ্দেশ্যে হয় তবে তা সম্পূর্ণরূপে হারাম। তবে প্রথম ক্রেতা খরিদ করার পর অথবা চলে যাওয়ার পর দর কষাকষি করা যেতে পারে। নবী করীম (সা) বলেন-

لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ -

---

(১) মুযারানা হচ্ছে গাছের মাথায় ঝুলন্ত ফল শুকনা ফলের বিনিময়ে বিক্রি করা।
(২) ক্ষেতের গম সংগৃহীত গমের বিনিময়ে বিক্রয় করা অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্যের বিনিময়ে জমি চাষাবাদ করতে দেয়া।
একইভাবে তৈলবীজের পরিবর্তে তৈল বিক্রি করাও এই নির্দেশের আওতাভুক্ত অর্থাৎ না জায়েয।

"তোমাদের কেউ যেন অপর কারো ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তার সময় একই বস্তুর দরদাম না করে।"

(জ) কোন ব্যক্তি বাকী বিক্রয় করার পর ক্রেতা দেউলিয়া হয়ে গেলো অথবা মারা গেলো। এ অবস্থায় বিক্রেতা সন্ধান করে দেখবে যে, ক্রেতার নিকট তার পণ্য অবিকৃত অবস্থায় আছে কিনা? যদি থাকে তবে ঐ পণ্য ফেরৎ পাবার ব্যাপারে তার দাবী অগ্রগণ্য। আর যদি অবিকৃত না থাকে তবে অন্যান্য পাওনাদারের মতই সে একজন পাওনাদার হিসাবে গণ্য হবে। নবী করীম (সা) বলেন-

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ - (موطا امام محمد)

"কোন ব্যক্তি বাকীতে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করলো। অতঃপর ক্রেতা দেউলিয়া হয়ে গেলো এবং বিক্রেতা তার পণ্যের কোন মূল্য আদায় করতে পারলো না। কিন্তু বিক্রেতার পণ্য তার কাছে অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেলো। এক্ষেত্রে সে তার পণ্য ফেরৎ পাওয়ার ব্যাপারে (অন্যান্য পাওনাদারের তুলনায়) অগ্রাধিকার পাবে। আর মূল্য পরিশোধের পূর্বেই যদি ক্রেতা মারা যায়, তবে সে (বিক্রেতা) অন্যান্য পাওনাদারের সমতুল্য গণ্য হবে। (মুয়াত্তা, ইমাম মুহাম্মদ)

(ঝ) অনেক সময় দেখা যায়, কোন দ্রব্য বিক্রি হলো, কিন্তু ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলো তাহলে সিদ্ধান্ত কার পক্ষে যাবে?

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رض أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَرَادَّانِ - (موطا للامام محمد)

"আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলে বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে অথবা উভয়ে ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাহার করবে। (মুয়াত্তায়, ইমাম মুহাম্মদ)

উক্ত হাদীসের প্রেক্ষিতে হানাফী মাযহাবের মত হচ্ছে-পণ্যের মূল্য নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে মনোমালিন্য হলে উভয়কেই শপথ করতে হবে এবং উভয়ই ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাহার করবে। তবে শর্ত হচ্ছে বিক্রিত দ্রব্য অবিকৃত থাকতে হবে। অন্যথায় উভয়ের কসমের পর ক্রেতাকে মূল্য ফেরৎ দিবে এবং ক্রেতা পণ্য ফেরৎ দিবে।

(ঞ) একজন অপর জনের নিকট যদি কিছু বিক্রি করে এবং এই শর্ত দেয় যে, "আপনার ক্রয়কৃত বস্তু পূণঃ বিক্রি করলে আমার নিকট বিক্রি করতে হবে। যে পরিমাণ মূল্যই চান দিব।" এ ধরণের শর্তযুক্ত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য হবে। একবার আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) তাঁর স্ত্রীর নিকট হ'তে একটি বাঁদী ক্রয় করলেন। স্ত্রী শর্ত দিল আপনি যদি একে পুণরায় বিক্রি করেন তবে যে পরিমাণ মূল্যই চান আমার নিকট বিক্রি করবেন। এ ব্যাপারে তিনি [আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)] হযরত উমর (রা) এর নিকট ফতোয়া চাইলেন। প্রতিউত্তরে হযরত উমর (রা) বললেন-

لَا تَقْرِبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ-

"এই বাঁদীর সাথে সহবাস করো না। কেননা এর সাথে অন্যের শর্ত যুক্ত রয়েছে।"

(ট) কোন ব্যক্তি জমিতে বীজ বপন করলো কিন্তু ফসল উঠার পূর্বেই ঐ জমি বিক্রি করার মনস্থ করলো। তখন যে ক্রেতা ঐ জমি খরিদ করবে সে তার ফসল পাবে না। হ্যাঁ, যদি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এ ধরণের শর্তারোপ করা হয়ে থাকে তবে ভিন্ন কথা। এর সমর্থনে নবী করীম (সা) এর বাণী-

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ-

(موطا امام محمدؒ)

"তাবীর[১] করা খেজুর গাছ বিক্রি করলে তার ফল বিক্রেতা পাবে। তবে ক্রেতা যদি (নিজের জন্য) ফলের শর্তারোপ করে তবে স্বতন্ত্র কথা।" (মুয়াত্তা)

(১) কোন কিছুর সাহায্যে পুরুষ খেজুর গাছের ফুলের পরাগ স্ত্রী খেজুর গাছের ফুলের মধ্যে প্রবেশ করানোকে তাবীর বলা হয়। হুজুরে পাক (সা) প্রথমত নিষেধ করলেও পরে তা করার অনুমতি দেন। এ পদ্ধতিতে খেজুরের ফলন বেশী হতো।

উপরোক্ত আলোচনা হতে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ইসলাম ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারেও ইনসাফ ভিত্তিক সমাধান পেশ করেছে। যাতে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েরই কল্যাণ হয়। কেউ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّهُ قَالَ مَا ظَهَرَ الْغُلُوْلُ فِىْ قَوْمٍ قَطُّ اِلَّا اُلْقِىَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبُ وَلَا فَشَا الزِّنٰى فِىْ قَوْمٍ قَطُّ اِلَّا كَثُرَ فِيْهِمُ الْمَوْتُ وَلَانَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِلَّا قُطِعَ عَلَيْهِمُ الرِّزْقُ وَلَاحَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ اِلَّا فَشَا فِيْهِمُ الدَّمُ وَلَاخَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ اِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ۔

(موطا۔ امام محمد)

"আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেনঃ (১) যে জাতির মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনীমাত) চুরি করার প্রবণতা দেখা দেয় সে জাতির অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা ভয়–ভীতি ও কাপুরুষতা সৃষ্টি করে দেন। (২) যে জাতির মধ্যে যেনা– ব্যাভিচারের বিস্তৃতি ঘটে তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার বেড়ে যায়। (৩) যে জাতি ওজন পরিমাপে কম দেয় তাদের রিজিক কমতে থাকে। (৪) আর যে জাতি ন্যায্য বিচার ফায়সালা করে না, তাদের মধ্যে বিবাদ বিশৃংখলা, অরাজকতা, রক্তপাত ও খুন–খারাবী বৃদ্ধি পায়। (৫) যে জাতি চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তাদের উপর শত্রুদের বিজয়ী করে দেয়া হয়।

মুয়াত্তা, ইমাম মুহাম্মদ)

শব্দার্থ

عَنْ –হ'তে। اَنَّهُ –নিশ্চিয়ই সে। قَالَ –বলেছেন مَا –যে, যা। ظَهَرَ –প্রকাশ পায়। اَلْغُلُوْلُ –আত্মসাৎ। فِى –মধ্যে। قَوْلٌ –জাতি, সম্প্রদায়। قَطُّ –কখনো। اِلَّا –ব্যতীত। اُلْقِىَ –ঢালা হয। فِى قُلُوْبِهِمْ –তাদের অন্তরে। اَلرُّعْبُ –ভয়-ভীতি, কাপুরুষতা। وَلَا فَشَا الزِّنٰى –এবং যেনা–ব্যাভিচারের বৃস্তৃতি ঘটে। كَثُرَ –অধিকাংশ। فِيْهِمْ –তাদের মধ্যে اَلْمَوْتُ – মৃত্যু। نَقَصَ

-নষ্ট করা, কম দেয়া। اَلْكَيَالُ -পরিমাপ।দ্ব اَلْمِيْزَانُ -নিক্তি, পরিমাপক। قُطِعَ -কর্তন করা হয়। اَلرِّزْقُ -রিজিক। حَكَمَ -বিচার-ফায়সালা করা। بِغَيْرِ الْحَقِّ -অন্যায়ভাবে। فَشَا -বিস্তৃতি লাভ করে। اَلدَّمُ - রক্ত, রক্তপাত। خَتَرَ -বিশ্বাসঘাতকতা। بِالْعَهْدِ -চুক্তিপত্র, প্রতিশ্রুতি। سَلَّطَ -আধিপত্য বিস্তার করে। عَلَيْهِمْ -তাদের উপর। اَلْعَدُوُّ -শত্রুপক্ষ।

রাবীর পরীচয়

হরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) নবী করীম (সা) এর মদীনায় হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নবী করীম (সা) এর চাচাতো ভাই। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। মাত্র তের বৎসর তিনি হুজরে আকরাম (সা) এর সাহচর্য লাভ করেছেন। যদিও তিনি সর্ব কনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন বিধায় নবী করীম (সা) এর সাহচর্য বেশীদিন লাভ করতে পারেননি তবু অত্যন্ত মেধা ও প্রচেষ্টার বলে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ আলেম হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন। মাত্র দশ বৎসর বয়সেই পবিত্র কুরআন কণ্ঠস্থ করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বিভিন্ন সাহাবা কেরামের নিকট দীনের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তাঁর কুরআনী জ্ঞানের সাক্ষ্য স্বরূপ হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন- "কুরআনের শানে নুযূল সম্বন্ধে ইবনে আব্বাস ছিলেন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।" এজন্যই তাফসীর সংক্রান্ত এত হাদীস আর কোন সাহাবী বর্ণনা করতে পারেননি। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন- "আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস হলেন আল্ কুরআনের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার (মুফাচ্ছের)"। তিনি যেমন ছিলেন মুফাচ্ছিরে কুরআন তেমনি ছিলেন শাইখুল হাদীস। এমনকি বড়ো বড়ো সাহাবী পর্যন্ত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

হিজরী ৬৮ সনে ৭১ বৎসর বয়সে তায়েফ নগরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ১৬৬০টি। তবে অধিকাংশ হাদীস হচ্ছে আল কুরআনের তাফসীর সংক্রান্ত।

হাদীসটির গুরুত্ব

অত্র হাদীসটি একটি 'মওকুফ'[১] হাদীস। কারণ এটি সরাসরি আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন তবু এ ধরণের হাদীস 'মারফু'[২] হাদীসের মতোই গুরুত্বের দাবীদার। কেননা সাহাবা কেরামগণের শিক্ষাই ছিলো ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা। তাছাড়া নবী করীম (সা) এর সাহচর্যের কারণে সাহাবা কিরামগণ ছিলেন ইসলামের মুর্ত প্রতীক। তাই তাদের কথা ও কাজ ছিলো আল্লাহ্র রাসূল (সা) এর ব্যাখ্যার অনুরূপ। অত্র হাদীসে যে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করেছেন তা কুরআন ও অন্যান্য সহীহ্ হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। সমাজ দেহে পচন ধরনের জন্য যে ক্রটিগুলো ভাইরাসের মতো কাজ করে সেই মৌলিক ক্রটিগুলোর কথা অত্র হাদীসে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। তাই সুন্দর সমাজ গঠনে হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্যাখ্যা

হাদীসে আল্লাহ্ প্রদত্ত বালা মুছিবতের কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীর যে সমাজেই হোক না কেন ঐ ক্রটিগুলো বিস্তৃত হ'লে তার অনুরূপ শাস্তি ভোগ করতে হবে। একথা অবশ্য ঠিক যে, পৃথিবীতে যতো বিপর্যয় সৃষ্টি হয় তা মানুষের নিজেদের কৃতকর্মের ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। মহান আল্লাহ্ বলেন-

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ - (الروم)

পৃথিবীতে যতো রকম বিপর্যয় সৃষ্টি হয়-জলে বা স্থলে-সমস্তই মানুষের নিজ হাতে উপার্জিত কর্মফল। (সূরা রূম)

তবে একথাও ঠিক যে, কোন রকম মুছিবতই আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া পৃথিবীতে আসে না। আল্লাহ্ বলেনঃ

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ - (التغابن)

(১) মওকুফঃ যে হাদীসের বর্ণনা পরম্পরা (সনদ) উর্ধতন পর্যায়ে কোন সাহাবা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে।

(২) যে হাদীসের বর্ণনা পরম্পরা (সনদ) হুজুরে আকরাম (সা) পর্যন্ত পৌছেছে এবং নবী করীম (সা) এর রেফারেন্সে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

পৃথিবীতে কোন মুছিবতই আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া আসে না।

(সূরা আত্‌ তাগাবুন)

শুধুমাত্র চারটি কারণে মুছিবত পৃথিবীতে আসে। যথা-

(ক) **আল্লাহ্‌র গজব হিসাবেঃ** কোন মানুষ বা কোন জাতি যখন আল্লাহ্‌র আইনের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে বেপরওয়া হয়ে স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হয়, বার বার তাদেরকে তাকিদ দেয়া সত্ত্বেও যখন নিজেদের কর্ম পদ্ধতি পরিবর্তন না করে, তখন আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত ফায়সালা হিসেবে তাদের উপর নেমে আসে বিচিত্র ধরণের আজাব বা গজব। ইতিহাস স্যাক্ষী, আল্লাহ্‌র আজাব শুরু হবার পর নিস্কৃতি পাওয়া অসম্ভব।

পৃথিবীতে আল্লাহ্‌ অনেক জাতি বা কওমকে গজব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন। যেমন কওমে নূহ, কওমে লুত, কওমে হুদ, কওমে আ'দ, কওমে সামুদ ইত্যাদি।

সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো আল্লাহ্‌ বিভিন্ন জাতির উপর বিভিণ্ন ধরণের আজাব অবতীর্ণ করেছেন। সব জাতির জন্য আজাবের ধরণ এক ছিলো না।

(খ) **সতর্কতার জন্যঃ** অনেক সময় মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হয়। তখন আল্লাহ্‌ তাদেরকে সতর্কতার জন্য মাঝে মধ্যে ছোট ছোট বিপদাপদ দিয়ে সতর্ক করে দেন। কিন্তু এ সতর্কতার সৌভাগ্য একমাত্র ঈমানদারগণই লাভ করেন।

(গ) **ঈমানদারদের গুনাহের কাফ্‌ফারা স্বরূপঃ** আল্লাহ্‌ তাঁর প্রিয় বান্দা ঈমানদারগণের ছোট-খাট ভুল-ত্রুটি মার্জনার নিমিত্তে কিছু কষ্ট দেন। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে- "কোন ঈমানদারের পায়ে একটি কাঁটাও ফুটে না তার গুনাহ্‌ মাফের কারণ ছাড়া।" এজন্যে কিছু বালা মুছিবত অবতীর্ণ হতে পারে।

(ঘ) **ঈমানদারদের পরীক্ষার নিমিত্তেঃ** মুমিনদেরকে নানা রকম পরীক্ষার নিমিত্তে বিপদ-আপদ অবতীর্ণ করেন। যেমন আল্লাহ্‌ বলেছেনঃ-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ - (البقرة)

অবশ্য আমি (আল্লাহ্‌) তোমাদেরকে ভয়-ভীতি, ক্ষুধা-দরিদ্রতা, ধন-সম্পদের

বিনাশ, ফল-ফসলের ধ্বংস এবং নিজেদের জীবনের উপর বালা মুছিবত অবতীর্ণ করে পরীক্ষা করবো। (সূরা আল্-বকারা)

অন্যত্র বলা হয়েছেঃ-

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ - (العنكبوت)

মানুষ কি মনে করেছে যে, তারা বলবে আমরা ঈমান এনেছি আর এমনিই তাকে ছেড়ে দেয়া হবে অথচ কোন পরীক্ষা করা হবে না?

(সূরা আল-আনকাবুতঃ ২)

আলোচ্য হাদীসে প্রথম প্রকারের শাস্তির হুমকী দিয়েছেন।

(১) হাদীসে গনীমতের মাল চুরির কথা বলে খেয়ানতের দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। কারণ যুদ্ধলব্ধ সমস্ত সম্পদ বন্টনের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্র তরফ থেকে তা আমানত। তাই কোন অবস্থাতেই খেয়ানত করা উচিত নয়। তাছাড়া চুরি বা খেয়ানতের কারণে অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায়। ফলে মনের মধ্যে কাপুরুষতা স্থায়ীভাবে আসন গ্রহণ করে। এগুলো হচ্ছে ইহকালীন শাস্তি। পরকালীন শাস্তিতো আরও ভয়াবহ।

(২) কোন সমাজে যেনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পেলে মৃত্যুর হার বেড়ে যায় অর্থাৎ সমাজ যৌন উচ্ছৃংখলতার স্বীকার হ'লে বিভিন্ন প্রকার ঘাতক ব্যাধি আক্রমণ করে ঐ সমাজকে ধ্বংস করে দেয়। যেমন গণোরিয়া, সিফিলিস, এইডস্ ইত্যাদি। তাছাড়া অন্যভাবেও মৃত্যুর হার বাড়িয়ে দিয়ে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট করে দেন। বস্তুত ঐ সমাজের শান্তি চিরতরে বিদায় নেয়। মানুষ প্রতিটি মুহূর্তেই শান্তির অন্বেষায় পাগলের মতো ঘুরে বেড়ায় কিন্তু ব্যর্থ হয়ে হতাশার সাগরে নিমজ্জিত হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়।

(৩) পরিমাপে কম দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ। কেননা আল্লাহ্ বলেনঃ-

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ - الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ - وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ -

'ধ্বংস ঐ সকল পরিমাপকারীদের জন্য যারা লোকের কাছ থেকে পরিমাপে পুরোপুরি গ্রহণ করে কিন্তু তাদেরকে দেয়ার বেলায় পরিমাপে কম দেয়।'

(সূরা আল মুতাফফিফীন ১-৩)

অন্যত্র বলেছেনঃ-

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ - (بنى اسرائيل)

'যখন তোমরা পরিমাপ করবে তখন পাত্র পূর্ণ করে পরিমাপ করবে এবং ওজন করলে সঠিকভাবে ওজন করবে।' (সূরা বনী-ইসরাঈল)

আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন এত করে বলার পরও যদি কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে এ রোগ সংক্রামিত হয়; তখন আল্লাহ্ ঐ জাতির রিজিক কমিয়ে দেন। তখনো যদি তারা তওবা করার সিদ্ধান্ত নেয় তবে আল্লাহ্ মা'ফ করতে পারেন। অন্যথায় পরকালে এর চেয়েও ভয়াবহ আজাবের সম্মুখীন হতে হবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মানুষ কোনরূপ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে উড়িয়ে দিতে চায়। কখনো খরায় কখনো বান-বন্যায়, আবার কখনো নানা রকম পোকা-মাকড়ের আক্রমণে ফসলের ক্ষতি হয়। পরিণতিতে দেশ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হয়। এগুলো অবশ্যই প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কিন্তু প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন কে? এর প্রতিউত্তরেই নিহিত আছে হাদীসে বর্ণিত বক্তব্যের তাৎপর্য।

(৪) অতঃপর হাদীসে ন্যায় বিচার বা আইনের শাসন কার্যকর করার জন্য বলা হয়েছে। এটি ধনী-গরীব, উঁচু-নীচু, শাসক-প্রজা, মনিব চাকর-সকলের জন্যই কল্যাণকর। আল্লাহ্ বলেনঃ-

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ - (النساء)

'মানুষের পরস্পরের মধ্যে যখন কোন ব্যাপারে তোমরা ফায়সালা করবে, তখন পূর্ণ সুবিচার ও নিরপেক্ষতার সাথে ফায়সালা করবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে অত্যন্ত ভালো কাজের উপদেশ দিচ্ছেন।' (সূরা আন-নিসা)

অপরাধীকে যথাযোগ্য শাস্তি প্রদান করতে কোনরূপ দুর্বলতা প্রকাশ অথবা পক্ষপাতিত্ব করা হারাম। সর্বাবস্থায় ন্যায় বিচার করতে হবে এমনকি তা যদি কোন নিকটাত্মীয় অথবা স্বয়ং নিজের বিরুদ্ধেও যায়। আল্লাহ্ বলেনঃ-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا-

(النساء)

"হে ঈমানদারগণ। ইনসাফের উপর মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো, আল্লাহ্‌র জন্য সত্যের সাক্ষ্যদাতা হও। সে সাক্ষ্য যদি তোমাদের নিজেদের, পিতা-মাতার কিংবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধেও হয়। সে ধনীই হোক অথবা দরিদ্রই হোক না কেন (সত্যের সাক্ষ্য দিতে কুণ্ঠিত হবে না)। তাদের প্রতি আল্লাহ্‌ তোমার চেয়ে অধিক সহানুভুতিশীল। কাজেই তোমরা কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব করে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার পরিত্যাগ করোনা। তবুও যদি তোমরা সত্যের সাক্ষ্য দাও অথবা সঠিক দায়িত্ব পালনে অবহেলা কর; তবে জেনে রাখো, আল্লাহ্‌ তোমাদের সমস্ত কৃতকর্মের খবর রাখেন।' (সূরা আন-নিসা)

ইনসাফ কায়েমের জন্য এটিই ইসলামের চরম ও অমোঘ নির্দেশ। নবী করীম (সা) এর সময়ে মদীনার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটি মেয়ে চুরি করে ধরা পড়ে। বিচারের জন্য যথারীতি নবী করীম (সা) এর নিকট আনা হলো। উসামা বিন যায়েদ আসামীর পক্ষে সুপারিশ করলেন। রাগত স্বরে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) ঘোষণা করেনঃ-

أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ- إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا-

(بخاری، مسلم)

আল্লাহ্‌র আইনের ব্যাপারে সুপারিশ করো? পূর্ববর্তী মানুষ ঠিক তখনই ধ্বংস হয়ে গেছে, যখন কোন সম্ভ্রান্ত বংশের লোক চুরি করতো তখন তাদেরকে মা'ফ

করে দিতো এবং নীচু বংশের কোন লোক কিংবা দুর্বল কোন লোক যদি চুরি করতো তবে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হতো। আল্লাহ্‌র কসম! আমার কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে আমি তারও হাত কেটে দেবো। (বুখারী, মুসলিম)

আসামীদের পক্ষে অবৈধ সুপারশকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেনঃ-

هانتم هؤلاء جادلتم عنهم في ٱلْحَيَوٰةِ الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم ٱلْقِيَـٰمَةِ ام من يكون عليهم وكيلا (النساء)

"শোন, তোমরা দুনিয়ার জীবনে তো অপরাধীদের পক্ষে উকালতী করলে কিন্তু কিয়ামতের দিন তাদের পক্ষে কে উকীল হবে? (সূরা আন-নিসা)

এর পরও যদি কোন সামাজ ন্যায় বিচার কায়েমে ব্যর্থ হয় তবে হাদীসে বর্ণিত শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতেই হয়। এটি তো সাধারণ কথা যে, যদি ন্যায় বিচার না করা হয় তবে ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এক শ্যেণীর লোক সমাজের হর্তা-কর্তা সেজে বসে। আবার ঐ শ্রেণীকে পরাস্ত করতে আরেক শ্রেণীর তৎপরতা শুরু হয় পেশী শক্তির মাধ্যমে। তাছাড়া আইনের শাসন কায়েম না থাকলে আইন লংঘনকারীদের দুঃসাহস সীমা অতিক্রম করে যায়। এভাবেই সামাজ থেকে শান্তি-শৃংখলা বিতাড়িত হয়।

(৫) চুক্তি করে প্রথম চুক্তি ভঙ্গকারীদের আল্লাহ্ কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করেছেন। সূরা বারা'তে আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে চুক্তি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্বাসঘাতক সম্প্রদায়ের উপর তার শত্রুদের বিজয়ী করে দেয়া এটি আল্লাহ্‌র একটি নির্ধারিত নীতি। হাদীসে এদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَحَاضُنَّ عَلَى الْخَيْرِ اَوْلَيُسْحِتَنَّكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا بِعَذَابٍ اَوْلَيُؤَمِّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُوا خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ.

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা) হতে বর্ণিত, নবী কারীম (সা) বলেছেনঃ "তোমরা অবশ্যই মা'রূফ এর আদেশ করবে, মুনকার হতে নিষেধ করবে এবং তাদেরকে কল্যাণময় ইসলামী কাজ করার জন্য উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করবে। অন্যথায় আল্লাহ্ যে কোন আজাবের মাধ্যমে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন অথবা তোমাদের মধ্য থেকে সর্বাধিক পাপাচারী, অন্যায়কারী ও জালিম লোকদেরকে তোমাদের উপর শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দেবেন। তখন তোমাদের মধ্য হতে সৎ লোকেরা মুক্তি লাভের জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ–প্রার্থনা ও কান্নাকাটি করবে; কিন্তু তা আল্লাহ্র দরবারে কবুল করা হবে না।"

(মুসনাদে আহমদ, তিরমিযি)

শব্দার্থ

لَتَأْمُرُنَّ –অবশ্যই তোমরা নির্দেশ দিবে। لَتَنْهَوُنَّ –অবশ্যই তোমরা নিষেধ করবে। لَتَحَاضُنَّ –তোমরা অবশ্যই উৎসাহিত করবে। لَيُسْحِتَنَّكُمْ –তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। اَوْ –অথবা। لَيُؤَمِّرَنَّ –অবশ্য শাসক নিযুক্ত করবেন। شِرَارَكُمْ –তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট ব্যক্তি। ثُمَّ –অতঃপর। يَدْعُوا –দোয়া করবে। خِيَارُكُمْ –তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিগণ। فَلَايُسْتَجَابُ لَهُمْ –কিন্তু তাদের দোয়া কবুল করা হবে না।

নাম হুযাইফা। লকব আবু আব্দুল্লাহ্। পিতা হুসাইল ইবনে জাবের, মা রাবাব বিন্তে কা'ব। হযরত হুযাইফা (রা) এর পিতা স্বীয় গোত্রের একজন লোককে হত্যা করে মদীনায় গিয়ে আশহাল গোত্রের মিত্রতায় সেখানেই বসবাস করেন। হুযইফা (রা) এর পিতার আদি বাসস্থান ছিলো ইয়েমেন। এজন্য তাদের সব ভাই-বোনকে এলাকার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে 'ইয়েমেনের সন্তান' বলা হতো। হুযাইফা (রা) এর পিতা-মাতা এবং তাঁরা দুভাই মাত্র মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁর মুসলমান ভাইয়ের নাম সাফওয়ান (রা)।

উহুদের যুদ্ধের সময় মুসলমানগণ হযরত হুযাইফা (রা) এর পিতাকে মুশরিকদের কাছাকাছি দেখে ভুলক্রমে তাঁকে হত্যা করে। হুযাইফা দূর থেকে চিৎকার করে নিষেধ করেছিলেন কিন্তু সে চিৎকার মুসলমানদের কর্ণে পৌঁছেনি। পিতার নিহত হবার ঘটনাটি স্বচক্ষে অবলোকন করেও ধৈর্য্যের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বলেন, "আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন।" যা হোক ঘটনাটি নবী কারীম (সা) শুনে নিজ হাতে তাঁকে ক্ষতিপূরণ দান করেন এবং তাঁর ধৈর্য্যের প্রশংসা করেন।

হযরত হুযাইফা (রা) ছিলেন শীর্ষস্থানীয় আলেমদের অন্যতম। শুধু তাই নয়, কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে এমন কিছু সম্বন্ধে রাসুলে আকরাম (সা) যা ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন তার সবটুকুই ছিলো তাঁর স্মৃতিপটে গাঁথা। হুজুরে পাক (সা) এর অনেক গোপনীয় বিষয় গোপন রাখতেন এজন্য সাহাবাগণ তাকে 'সাহিবুস্ সির্‌রি'- গোপনীয়তার রক্ষক'-বলে ডাকতেন।

হুজুরে আকরাম (সা) তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র মুখে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। তিনি খুব কমই রাগ করতেন, তবে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ দেখলে অগ্নিশর্মা হয়ে যেতেন। তিনি নির্লোভ, সাদাসিধা জীবন-যাপন করতেন এবং দান করতে কার্পণ্য করতেন না। এমনকি খাবার সময় কেউ এসে পড়লে তাকে সাথে নিয়েই খানা খেতেন।

নবী কারীম (সা) এর সময় হতে খোলাফায়ে রাশেদীনের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা) এর সময়কাল পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন ছিলেন এবং দক্ষতার সাথেই দায়িত্ব পালন করেছেন। হযরত উসমান (রা) এর সময়

ইয়েমেনের শাসন কর্তা ছিলেন। তিনি বাবের যুদ্ধ শেষে মাদায়েনে প্রত্যাবর্তন করেই উসমান (রা) এর শাহাদাতের ঘটনা শুনেন এবং এর ৪০ দিন পরে হিজরী ৩৬সনে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা একশ'র চেয়ে কিছু বেশী।

হাদীসটির গুরুত্ব

মুসলমান একটি মিশনারী জাতি। এ জাতির দায়িত্ব ও কর্তব্য কি এবং তা যথাযথভাবে পালন না করলে তার পরিণতি কতো ভায়াবহ হ'তে পারে অত্র হাদীসে তার কিছু ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। ইসলামী নীতিতে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা এবং ইসলামের বিপরীত আদর্শের মত ও পথ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইত্যাদিকে মুলোৎপাটনের চেষ্টা করাই হচ্ছে ঈমানের দাবী, মুসলমানের কর্তব্য। সে কর্তব্য কাজে অবহেলা করলে তার পরিণতি এমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে যা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কোন মানুষেরই নেই। তাই বিপর্যয়ের পূর্বেই করণীয় কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রতিটি মুসলমানের জীবনে এ হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

এ হাদীসটি আমর ইবনে আবু আমর (রা) এর সনদে ইমাম ইবনে মাজা এবং তিরমিযি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযি (রহ) বলেন- হাদীসটি উত্তম। তাছাড়া সামান্য পার্থক্য সহকারে এ ধরনের আরেকটি হাদীস হযরত আয়েশা (রা) থেকে মুসনাদে আহমদ ও ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা

'আমর বিল মারুফ' ও 'নাহি আনিল মুনকার' আল্-কুরআনের নিজস্ব দু'টি পরিভাষা। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- সৎ ও ন্যায় কাজের আদেশ দান এবং অসৎ ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করা। কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ ব্যাপক ও সর্বাত্মক। ইসলামী পরিভাষায় মারুফ হলো ইসলামী জীবন ব্যবস্থা دين اسلام এবং আমর হচ্ছে তার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ও কার্যকরীকরণ। মুনকার বলতে বুঝায় যা ইসলামী জীবন ব্যাবস্থার বিপরীত ও সাংঘর্ষিক।

চাই তা আকিদা–বিশ্বাস, চিন্তা–চেতনা, আদর্শ–মতাদর্শ, শিক্ষা–সংস্কৃতি ইত্যাদি যে কোন নামেই হোক না কেন।

হাদীসে ব্যবহৃত শব্দ দু'টিকে লাম 'ل' এবং 'ن' দিয়ে একই সাথে তাকিদ বা নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আরবী ব্যকরণে একে لام تاكيد با نون تاكيد ثقيلة (লাম বা নুনে তাকিদ ছাকিলাহ্) বলা হয় আরবী ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী যখন কোন ক্রিয়ার প্রথম এবং শেষে যথাক্রমে লাম 'ل' এবং নুন 'ن' দিয়ে তাকিদ দেয়া হয় তখন ঐ ক্রিয়া অবশ্যই করণীয় বলে বিবেচিত হয়। হাদীসের শেষের দিকের কথাগুলো প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এ দায়িত্ব কত গুরুত্বপূর্ণ। একটু শিথিলতা প্রদর্শনের পরিণতিতেই হয় প্রাকৃতিক আজাব না হয় অসৎ লোকের দুঃশাসন।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে, যারা কল্যাণের (ইসলামের) পথে মানুষকে ডাকবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করবে। তারাই সফলকাম। সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসার পরেও যারা মতভেদ করেছে এবং বিভক্ত হয়েছে, তোমরা তাদের মতো হয়ো না। কেননা তাদের জন্য বিরাট শাস্তি রয়েছে। (সূরা আলে-ইমরানঃ ১০৪-১০৫)

যারা মতভেদ করেছে এবং বিভক্ত হয়েছে— এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ) বলেন, "এখানে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী উম্মতের মতো পরস্পর বিছিন্ন হওয়া এবং মতানৈক্য সৃষ্টি করা ও তাদের মতো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা পরিত্যাগ করার পরিণতি সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর ২য় খন্ড ৫৩২ পৃঃ,

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত)

উপরোক্ত আয়াত হ'তে বুঝা যায় যে, এটি এমন একটি সুফলদায়ক কাজ যা সঠিকভাবে পালন করলে মর্মান্তিক ও দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হবে না। তবে এ কাজটি একাকী করার কোন সুযোগ নেই। করতে হবে সদলবলে- সংঘবদ্ধ ভাবে। যে সমাজে একাজ অব্যহত থাকে সে সমাজকে আল্লাহ্ ধ্বংস করেন না। এ ব্যাপারে আল্-কুরআনে বলা হয়েছেঃ

জালিম লোকদের শাসন সম্পর্কে এ হাদীসে যদিও পৃথক ভাবে কথাটি বলা হয়েছে তবু তা আল্লাহ্র আজাবেরই একটি ধরণ মাত্র। সম্ভবত একথাটি পৃথক করে বলার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্র আইন ও সৎলোকের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধের চূড়ান্ত রূপ। আর এ কাজে যখন সমাজের প্রতিটি লোকই ব্যর্থতার পরিচয় দেবে তখন সৎলোক সৃষ্টির ধারা বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নেতৃত্ব অসৎ খোদাদ্রোহী শক্তির হাতে চলে যাবে। এটি নিঃসন্দেহে দেশ ও জাতির জন্য একটি বিপর্যয়। (এ ব্যাপারে আল্লাহ্ই ভালো জানেন)

এ কথা কয়টিই আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন সূরা রা'দে অন্যভাবে বলেছেন

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ٥

যে জনপদের অধিবাসীগণ সংশোধন মূলক কাজে ব্যাপৃত থাকে তোমার আল্লাহ্ তাদেরকে জুলুম বা গুনাহ্র কারণে ধ্বংস করেন না। (সূরা হুদঃ ১১৭)

হাদীসে আল্লাহ্র আজাবের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আজাবের ধরন বলা হয়নি। তা সে আজাব বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দূর্যোগের মাধ্যমে হতে পারে, আবার অর্থনৈতিক দূরাবস্থা, নৈতিক অবক্ষয় অথবা মহামারীর আকারে কোন ঘাতক ব্যাধিও হতে পারে। তখন আল্লাহ্র রহমত নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য সমাজের সৎলোকগণ আল্লাহ্র নিকট দু'আ ও কান্নাকাটি করবে কিন্তু কিছুই কবুল করা হবে না ।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ

'প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতোক্ষণ পর্যন্ত জাতির লোকেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে।'

(সূরা রা'দ ঃ১১)

উক্ত আয়াতটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা আম গাছে যেমন কাঁঠাল ফলে না তেমনিভাবে অসৎ লোককে ক্ষমতায় বসিয়ে ভালো কিছু আশা করা যায় না। মজার ব্যাপার হচ্ছে- আমরা আম গাছে কাঁঠাল না চাইলেও অসৎ লোকের কাছে ভালো কিছু চাই। যার কারণে দেখা যায় ভোটের সময় যারা চোর-বাটপার, অসৎ হিসেবে সমাজে পরিচিত তারাই দল পাল্টে এবং বোল পাল্টে জনগণের কাছে আসে ভোট ভিক্ষা করতে । জনগণও মনে করে এবার অমুক প্রার্থী বা অমুক দল ক্ষমতায় গেলে দুধের নহর বইয়ে দেবে। ক'দিন পরই তাদের ঘোর কেটে যায়। তখন কপালে করাঘাত করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। তারা মুখে যতই ভালো কথা বলুক না কেন তারাও স্বীকার করে যে, তাদের সমস্ত কাজকর্মই চাতুরীপূর্ণ। যেমন ধরুন যখন কোন সৎলোক নেতৃত্বে এগিয়ে আসে তখন উক্ত নেতারাই চিৎকার করে বলতে থাকে উনার মতো ভালো মানুষ, সৎ মানুষ এ খারাপ কাজে কেন এলো? উনিতো এখানে এলেই খারাপ হয়ে যাবেন। তাদের কথায়ই প্রমাণ হয় তারা ভালো মানুষ নয়। ব্যস! জনগণও না বুঝে তার সুরে সুর মিলিয়ে বলতে থাকে হুজুর আপনি আলেম মানুষ, আপনাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করি। আপনি খারাপ কাজে যাবেন না । একটু চিন্তা করে দেখুন কাজটি যদি এতই খারপ হতো তবে নবী করীম (সা) করলেন কেন? সম্মানিত সাহাবাগণ কেন নেতৃত্ব দিলেন? জবাবে বলবেন সে কথা আলাদা। তখনকার সমাজই ছিলো অন্য রকম। তবে আমি প্রশ্ন করবো ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে সেখানকার সমাজে কোন ভালো লোকটি নেতৃত্বে ছিলো? সত্যি কথা বলতে কি, কাজটি খুবই মহৎ এতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু অসৎ নেতৃত্ব সে পদে সমাসীন হয়ে তাকে কলুষিত করছে। তাই এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য একটিমাত্র রাস্তাই খোলা আছে। তা হচ্ছে- সৎলোকদেরকে নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করা। অর্থাৎ সৎ লোকের শাসন কায়েম করা। এ কথাগুলোই উপরোক্ত আয়াতে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। মানুষের সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করছে তার সুখ অথবা দুঃখ । এখন তারা যা সিদ্ধান্ত নিবে আল্লাহ্ তাই তাদের জন্য সহজ করে দেবেন। অবস্থা পরিবর্তন করে কল্যাণের চেষ্টা করলে আল্লাহ্ কল্যাণের পথ তাদের জন্য সহজ করে দেবেন।

অকল্যাণের চেষ্টা করলে তাও তাদের জন্য আল্লাহ্ সহজ করে দেবেন। তবে পরিণতি কি হবে তা পূর্বেই ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে।

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেনঃ আমি নবী করীম (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ

مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا -

'যে জাতিতে কোন লোক পাপে লিপ্ত থাকে আর ঐ লোককে পাপের পথ হতে ফেরানোর ক্ষমতা ঐ জাতির লোকদের থাকা সত্ত্বেও না ফেরায় তবে মৃত্যুর পূর্বেই তাদের (সকল) কে আল্লাহ্ শাস্তি দিবেন।' (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

অন্যত্র বলা হয়েছে-

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوا فَإِذَا فَعَلُوا ذَالِكَ عَذَّبَ اللّٰهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ -

'আল্লাহ্ কোন জাতিকে তাদের বিশেষ কোন লোকের পাপের কারণে শাস্তি প্রদান করেন না, যতোক্ষণ না ঐ জাতির অধিকাংশ লোক ঐ পাপের কথা জানতে পারে যে, তাদের মধ্যে খারাপ কাজ করা হয়েছে কিন্তু তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্বেও প্রতিরোধ করেনি। যখন তারা এরূপ (নীরবতা অলম্বন) করে , তখন আল্লাহ্ ঐ জাতির সবাইকে সমানভাবে শাস্তি প্রদান করেন।'

(শরহে সুন্নাহ)

তথ্য সূত্র

১। তাফসীরে ইবনে কাসীর -২য় খন্ড (বাংলা) ইসলামিক ফাউন্ডেশন.ঢাকা

২। তাফহীমূল কুরআন- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহ)

৩। হাদীস শরীফ (১ম খন্ড) -মাওঃ আবদুর রহীম (রহ)

৪। সাহাবা চরিত (৫ম খন্ড)-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা

৫। ইসলামে জিহাদ– মাওঃআবদুর রহীম (রহ)

عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ (وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ وَاللّٰهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ) بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - وَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ اِلَّا اَنْ يُرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثِيِّ جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ -

হযরত হারিছ আল্‌ আশয়ারী হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেনঃ আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে আদেশ দিচ্ছি, (অন্য বর্ণনায় আছে আমার আল্লাহ্‌ আমাকে এ পাঁচটি বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন) (১) জামা'য়াত গঠনের, (২) আদেশ শ্রবণের (প্রস্তুত থাকা), (৩) আনুগত্য করার (নিয়ম-কানুন মেনে চলা), (৪) হিজরত করার ও (৫) আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার (জন্য)। আর যে ব্যক্তি জামা'য়াত হতে এক বিঘত পরিমাণ বাইরে চলে গেলো, সে অবশ্যই ইসলামের রশি তার গলা হতে খুলে ফেললো। অবশ্য যদি জামা'য়াতে ফিরে আসে তবে ভিন্ন কথা। আর যে ব্যক্তি জাহেলী কোন মতবাদ ও আদর্শের দিকে লোকদেরকে আহবান করবে। সে জাহান্নামী। যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম বলে মনে করে।

(তিরমিযি, মুসনাদে আহমাদ, মিশ্‌কাত)

শব্দার্থ

اٰمُرُكُمْ -আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি। بِخَمْسٍ -পাঁচটি বিষয়ে। بِالْجَمَاعَةِ -সংগঠন। اَلسَّمْعُ -নির্দেশ শুনা। اَلطَّاعَةُ -আনুগত্য। اَلْهِجْرَةُ -হিজরত। مَنْ -যে। خَرَجَ -বের হয়ে গেল। مِنَ الْجَمَاعَةِ -সংগঠন হ'তে। قَيْدَ شِبْرٍ -এক বিঘত। فَقَدْ خَلَعَ -সে খুলে ফেললো। رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ -ইসলামের রশি। مِنْ عُنُقِهِ

–গলা হ'তে (রূপক অর্থে)। أَنْ يُرَاجِعَ –যদি ফেরৎ আসে। مَنْ دَعَا –যে আহবান করবে। بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ –জাহেলী মতবাদের দিকে। فَهُوَ –তবে সে। مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ –জাহান্নামের ইন্ধন হবে। إِنْ صَامَ –যদি রোযা রাখে। صَلَّى –নামাপয পড়ে। زَعَمَ –ধারণা করে। أَنَّهُ مُسْلِمٌ –সে মুসলমান।

হাদীসটির গুরুত্ব

এ হাদীসটি দিয়ে ইসলামের এমন পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা বাদ দিলে ইসলামী সমাজের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। ইসলামের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তাও ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। কেননা ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টা রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত সফল হয়না। আবার রাষ্ট্রীভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে এবং তা প্রতিষ্ঠিত রাখতে হলে অত্র হাদীসে বর্ণিত নেতৃত্ব , আনুগত্য ও সংগঠন ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয় । নামায, রোযা, হজ্ব, কালেমা ও যাকাতকে যেমন ইসলামের ভিত্তি বলা হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে ঐ হাদীসে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয় হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী সমাজের ভিত্তি। এ পাঁচটি ভিত্তি ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না এবং তা কায়েম থাকতেও পারেনা । এর আরেকটি দিক হচ্ছে কোন মুসলমান এ পাঁচটি কাজকে অবজ্ঞা করলে সে মুসলমানই থাকতে পারেনা । কারণ এ পাঁচটি কাজ সরাসরি ঈমান ও আমলের সাথে জড়িত। তাই বুঝা যায় প্রতিটি মুসলমানের জীবনে হাদীসটির গুরুত্ব কত অপরিসীম।

ব্যাখ্যা

হাদীসের শুরু হয়েছে آمُرُكُمْ শব্দটি দ্বারা। শব্দটির অর্থ হচ্ছে "আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি।" আবার অন্য বর্ণনানুযায়ী বুঝা যায় যে, এ নির্দেশ নবী করীম (সা) নিজে থেকে দেননি বরং আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েই দিয়েছেন। হাদীস ভান্ডারে সম্ভবত এটিই একমাত্র হাদীস যা উপরোক্ত (নির্দেশ বাচক) শব্দ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। যা হোক বর্ণনার ধরন এবং বিষয়বস্তু হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এ হাদীসটিকে পাশ কাটানো মানেই ইসলাম থেকে পাশ

কাটানোর প্রচেষ্টা মাত্র।

(১) اَلْجَمَاعَةُ (আল্ জামা'য়াত)ঃ মূল শব্দ হচ্ছে ع - م - ج - جَمَعَ অর্থ- বিক্ষিপ্ত কোন বস্তুকে একত্র করা। جَمع শব্দ হ'তে গঠিত হয়েছে جَمَاعَةٌ। এর অর্থ হচ্ছে দল, জামা'য়াত, সংগঠন। জামা'য়াতের ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে Organisation ইংরেজীতে Organisation বলা হয় যা সমস্ত Organ (অংশ) কে একত্রিত করে। জামা'য়াতের আরেকটি কুরআনী পরিভাষা হচ্ছে-উম্মাতুন اُمَّمْ। যেমন সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছেঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ـ ـ

'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকতেই হবে, যারা মানব জাতিকে কল্যাণের পথে আহবান করবে।' (সূরা আলে ইমরানঃ১০৪)

ইসলামী সংগঠন ও নেতৃত্বঃ

ইসলামী সংগঠনের বা জামা'য়াতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনটিঃ (ক) ইসলামী নেতৃত্ব (খ) ইসলামী কর্মী বাহিনী ও (গ) ইসলামী পরিচালনা বিধি।

(ক) ইসলামী নেতৃত্বঃ ইসলামী নেতৃত্বকে খলিফা, ইমাম ও আমীর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থ ও তাৎপর্যের দিক দিয়ে এক, যদিও শব্দ তিনটি। এ ছাড়া আরেকটি কুরআনী পরিভাষা হচ্ছে উলিল আমর। এখানে উল্লেখ্য যে, কেউ ইসলামের নামে একটি দল গঠন করে নিজে প্রধান হয়ে বসলেই তাকে ইসলামী নেতৃত্ব বলে না। ইসলামী নেতৃত্ব মনোনীত কোন পদের নাম নয় বরং এটি হচ্ছে জনসাধারণ বা ইসলামী কর্মীবাহিনী কর্তৃক নির্বাচিত একটি পদ। যিনি ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্ব দিবেন তার মধ্যে নিম্ন লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা একান্ত অপরিহার্য। যেমনঃ

১। জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বঃ নবী করীম (সা) বলেছেনঃ

يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ ـ

জনগনের ইমাম বা নেতা হবে সে, যে আল্লাহ্‌র কিতাব সম্বন্ধে সর্বাধিক ইলম (জ্ঞান) রাখে। (মিশকাত)

২। উন্নত আমলঃ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন বলেনঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ۔

তোমাদের মধ্যে সে- ই সম্মানী যে আল্লাহ্‌কে বেশী ভয় করে।

৩। নম্র ব্যবহারঃ রাসূলে আকরাম (সা) বলেনঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ أَوْ لِيَصْمُتْ۔

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে। (বুখারী)

অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ۔

আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই নিকৃষ্ট, যার অশালীন ও অশোভন আচরণ হতে বাঁচার জন্য লোকজন তাকে এড়িয়ে চলে। (বুখারী)

৪। ধৈর্য্যঃ আল্লাহ্‌র বাণী- إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ۔

অবশ্যই আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের সাথে থাকেন (সূরা আল -বাকারা)

৫। সাহসিকতাঃ নবী করীম (সা) বলেছেনঃ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে দুনিয়ার সবকিছু তাকে ভয় করে। পক্ষান্তরে যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে না দুনিয়ার সব কিছু তাকে ভয় দেখায়।"

৬। পরিশ্রম প্রিয়তাঃ নেতাই যদি কাজ না করে তবে কর্মীগণ উৎসাহ্ পাবে কোত্থেকে? এ জন্যই নবী করীম (সা) এক যুদ্ধে নিজে কাঠ কাটার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে নিজে দু'জনের সমান মাটি বহন করেছেন।

৭। কর্মীদের মাঝে ইনসাফ কায়েমঃ নেতার কর্তব্য সবাইকে ভালোবাসা। তিনি তাদের সবাইকে এজন্য ভালোবাসবেন যে, তারা আল্লাহ্‌র বান্দা এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রাণ। রাসূলে আকরাম (সা) বলেনঃ

اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهٖ -

হে খোদা! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন প্রকার দায়িত্বশীল হয়ে তাদেরকে অশান্তি ও দুঃখ কষ্টে নিপতিত করলো তুমি তার উপর দুঃখ কষ্ট ও সংকীর্ণতা চাপিয়ে দাও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের দায়িত্বশীল হয়ে তাদের প্রতি ভালোবাসা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তুমি তার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করো।

(মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ)

অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

مَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ اُمَّتِيْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُمْ بِمَا يَحْفَظُ بِهٖ نَفْسَهٗ وَاَهْلَهٗ اِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ -

আমার উম্মাতের কেউ যদি মুসলমানদের দায়িত্বশীল হয়ে ঠিক সেভাবে তাদেরকে হিফাজত না করে যেভাবে সে নিজের ও পরিবারের সদস্যদের হিফাজত করে তবে সে (জান্নাতে যাওয়া তো দূরের কথা) জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। (তাবারাণী)

৮। পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্তঃ নেতা কোন বিষয়ে হুট করে কোন সিদ্ধান্ত দিবেন, সে অধিকার ইসলামী নেতৃত্বে নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ নিজেই সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ -

সৎকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো। কোন বিষয়ে তোমার মত সুদৃঢ় হয়ে গেলে আল্লাহ্র উপর ভরসা করো। (সূরা আলে ইমরান)

৯। ইসলামী নেতৃত্বের জবাবদিহিতাঃ নেতা তার কাজ কর্মের জবাবদিহি দু'জায়গায় করতে বাধ্য। (ক) জনসাধারণ, কর্মী বাহিনী অথবা নির্বাচক মন্ডলীর নিকট এবং (খ) আদালতে আখিরাতে স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের নিকট।

(খ) ইসলামী কর্মী বাহিনীঃ ইসলামী সংগঠনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে

ইসলামী কর্মী বাহিনী। ইসলামী কর্মী বাহিনীর বৈশিষ্ট্য দু'টি। যা উল্লেখিত হাদীসের ২ ও ৩ নং এ বলা হয়েছে। (ক) আদেশ শ্রবণে প্রস্তুত থাকা ও (খ) আনুগত্য করা। তবে এ শ্রবণ ও আনুগত্য শর্তহীন নয়। অবশ্যই শর্তযুক্ত। সে শর্তটি হচ্ছে যতোক্ষণ আল্লাহ্ ও রাসূলের আইন বিধানের অধীন হবে ততোক্ষণ আনুগত্য করা। কিন্তু যখনই আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধানের বিপরীত নির্দেশ জারী করা হবে তখনই তার প্রতিবাদ করা এবং ঐ কথার উপর আনুগত্য প্রকাশ না করা। ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ -

'যারা পৃথিবীতে সংশোধনের পরিবর্তে ফিত্না ফাসাদ সৃষ্টি করে, এ ধরনে সীমা লংঘনকারীদের তোমরা অনুসরণ ও আনুগত্য করবে না।' (সূরা আশ শুর

অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ -

'তোমরা একে অপরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করো ন্যায়নীতি ও তাকওয় ভিত্তিতে। (সাবধান!) পাপিষ্ট, শান্তি-শৃংখলা ও সামাজিক জীবনে বি সৃষ্টিকারীকে কখনো সমর্থন বা সাহায্য করো না।' (সূরা আল মায়িদাঃ

নবী করীম (সা) বলেছেনঃ

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ

فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ -

প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা এমন সব ব্যাপারেই যা সে পছন্দ করে এবং যা সে পছন্দ করে না। কিন্তু যদি কোন নাফরমানী ও গুনাহ্র কাজের আদেশ করা হয়, তবে তা শুনা যাবে না এবং মানাও যাবে না। (বুখারী, মুসলিম)

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে আমীর যদি কালো কুৎসিত হাবশী ক্রীতদাসও হয় যার মাথা আঙ্গুরের মতো সে যদি নির্দিষ্ট সীমার ভিতর থেকে নেতৃত্ব দেয় তবে অবশ্যই তার আনুগত্য করতে হবে।

(গ) ইসলামী পরিচালনা বিধিঃ ইসলামী সংগঠনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সংগঠনের অথবা রাষ্ট্রের পরিচালনা করতে হলে তা ইসলামী বিধি অনুযায়ী করতে হবে। ইসলামী বিধানের মৌলিক উৎস হবে দু'টি, কুরআন এবং সুন্নাহ্। এ দু'টি ব্যাপারে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের ঘোষণা হচ্ছেঃ

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ -

হুকুম- শাসনের অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র। তাঁর নির্দেশ, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো দাসত্ব ও আনুগত্য করতে পারবে না। (সূরা ইউসুফঃ ৪০)

আল্লাহ্ তা'আলার যাবতীয় আদেশ নির্দেশের একমাত্র ব্যাখ্যাতা রাসূলে আকরাম (সা)। তাই তাঁর নির্দেশাবলী মানাও আল্লাহ্‌র নির্দেশ মানার অন্তর্ভূক্ত। ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا -

এবং রাসূল তোমাদের জন্য যেসব বিধি ব্যবস্থা ও আইন-কানুন এনেছেন তা গ্রহণ কর এবং যে সব বিষয়ে নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকো।

(সূরা আল হাশরঃ৭)

অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ -

যে রাসূলের আনুগত্য করলো সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করলো।

(সূরা আন-নিসাঃ৮০)

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য গুলো যে দল বা সংগঠনের থাকবে তাকে ইসলামী দল বা ইসলামী সংগঠন অথবা ইসলামী জামা'য়াত বলা হবে। অন্যথায় তাকে ইসলামী সংগঠন বা জামা'য়াত বলা যাবে না। কুরআন ও হাদীসে জামা'য়াত সংক্রান্ত যা বলা হয়েছে তা উক্ত বৈশিষ্ট্যমন্ডিত জামায়াতকেই বলা হয়েছে। এবার আমরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করবো যে, ঈমান ও ইসলামের সাথে জামা'য়াতের সম্পর্ক কতটুকু।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন ইরশাদ করেনঃ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔

তোমরা সে সব লোকদের মতো হয়োনা, যারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে এবং স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নির্দেশ পাওয়ার পরও মত বিরোধে লিপ্ত রয়েছে, তাদের জন্য আছে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা। (সূরা আলে-ইমরানঃ১০৫)

আরো বলা হয়েছেঃ

وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا۔

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রজ্জুকে শক্তভবে ধারণ করবে সে অবশ্যই সিরাতে মুস্তাকিমের সন্ধান পাবে। (সূরা আলে-ইমরানঃ১০১)

আবার বলা হয়েছেঃ

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔

আল্লাহ্‌র সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে পরস্পরের ঘোরতর দুশমন তখন তিনিই তোমাদের হৃদয়কে জুড়ে দিলেন এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ও মেহেরবানীতে ভাই ভাই হয়ে গেলে। (সূরা আলে ইমরানঃ ১০৩)

সূরা শুরা'য় বলা হয়েছেঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا
وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔

আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সেই দীনকে নির্ধারিত করেছেন যা তিনি নূহ এর প্রতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন আর তোমার প্রতি যে ওহী নাযিল করেছি তা আমরা ইব্রাহিম, মূসা ও ঈসাকে একই নির্দেশ দিয়েছিলাম। (তা ছিলো) এ দীনকে

প্রতিষ্ঠিত করো। বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়, সংঘবদ্ধভাবে। (সূরা আশ-শুরাঃ১৩)

জামা'য়াতবদ্ধ জীবন যাপনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে নবী করীম (সা) বলেছেনঃ

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ -

জামা'য়াতকে ভালোভাবে আকড়ে ধরো এবং পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হওয়া থেকে দূরে থাকো। (তিরমিযি)

فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ -

অতএব জামা'য়াতবদ্ধ হয়ে থাকা তোমাদের কর্তব্য। কেননা পাল হতে বিচ্ছিন্ন ছাগলকে নেকড়ে সহজেই খেয়ে ফেলে। (আবু দাউদ)

يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شُذَّ إِلَى النَّارِ -

জামা'য়াতের প্রতি আল্লাহ্র রহমতের হাত প্রসারিত থাকে। যে জামা'য়াত ছাড়া একা চলে সে তো একাকী দোজখের দিকেই ধাবিত হয়। (তিরমিযি)

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আরো কঠোর ভাষায় বলা হয়েছেঃ

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً -

যে নেতার আনুগত্য পরিহার করে নেয় এবং জামা'য়াত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে। (মুসলিম)

আরো বলা হয়েছেঃ

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْكُنَ مَجْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ -

যে ব্যক্তি জান্নাতের আনন্দ উপভোগ করতে চায় তার অবশ্যই জামা'য়াতের অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত।

এ ব্যাপারে হযরত উমর (রা) এর একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেনঃ

لَا اِسْلَامَ اِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ اِلَّا بِاِمَارَةٍ وَلَا اِمَارَةَ اِلَّا بِطَاعَةٍ -

জামা'য়াত ছাড়া ইসলাম হ'তে পারে না। আবার নেতৃত্ব ছাড়া জামা'য়াত হতে পারে না। আর আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব (প্রতিষ্ঠিত) হতে পারে না।

(জামিউল বয়ান)

জামা'য়াতবদ্ধ জীবন যাপনে অনেক বালা মুসিবত হতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং মুনাফিকী হতে আল্লাহ্ হিফাজতে রাখেন। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ

ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ اِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْاَمْرِ وَلُزُوْمُ الْجَمَاعَةِ فَاِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَّرَائِهِمْ -

তিনটি জিনিস এমন- তার বর্তমানে কোন মুসলমানের অন্তরে মুনাফেকী সৃষ্টি হতে পারে না।

(ক) যা করবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করবে।

(খ) যারা দায়িত্বশীল (নেতা) তাদের সাথে সৌজন্য মূলক ব্যবহার করবে।

(গ) জামা'য়াতের সাথে একান্তভাবে জাড়িত থাকবে, জামা'য়াতের অন্যদের দু'আ তাকে রক্ষা করবে। (আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজা,বাইহাকী, ইবনে হাব্বান)

হিজরতঃ

হিজরতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ত্যাগ করা। যেমন রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেনঃ

اَنْ تَهْجُرَ مَاكَرِهَ رَبُّكَ

হিজরত অর্থ আল্লাহর অপছন্দনীয় ও নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করা। এছাড়া ইসলামী পরিভাষায় এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে ইসলামী আদর্শের অনুকরণে জীবন

যাপন করতে কোথাও বিঘ্ন সৃষ্টি হলে অপেক্ষাকৃত ভালো দেশে বা জায়গায় স্থানান্তর হওয়া। এ হাদীসে উপরোক্ত দু'টি অর্থই গ্রহণীয়।[১]

আল্লাহ্র পথে জিহাদঃ

জিহাদ جِهَادٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন লক্ষ্যে পৌছার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা। ইসলামী পরিভাষায় জিহাদ বলা হয় আল্লাহ্র দীনকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টাকে। আল্লাহ্র পথে জিহাদ কথাটি আল কুরআনের একটি নিজস্ব পরিভাষা।

এর তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ্র দীনকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত করার এবং যদি তা প্রতিষ্টিত হয়ে যায় তবে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা। প্রয়োজনে যুদ্ধ করা। এটা ফরজ। সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে এই ফরজ কখনো 'ফরজে আইন' (ব্যক্তিগত অবশ্য করণীয়)[২] আবার কখনো 'ফরজে কেফায়া' (সমষ্টিগত অবশ্য করণীয়)[৩] হিসেবে পরিগণিত হয়। যখন রাষ্ট্রীয় ভাবে পরিপূর্ণ দীন কায়েম হয়ে যায় তখন বিভিন্ন শক্তি তাকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠে। এমতাবস্থায় একদল লোক এর মুকাবেলা করলেই যথেষ্ট। সমস্ত জনশক্তির প্রয়োজন হয় না। এ অবস্থাকে বলা হয় ফরজে কেফায়া। আর যদি কোন কাফের অথবা মুশরিক শক্তি সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং ইসলামী শক্তির সৈন্য বাহিনী পূর্ণভাবে মুকাবেলা করতে সমর্থ না হয় তবে ঐ রাষ্টের প্রতিটি মুসলমানের উপর জিহাদ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ অবস্থার নাম ফরজে আইন। তাছাড়া জিহাদ ফরজে আইন হবার আরেকটি শর্ত হচ্ছে, যেখানে ইসলাম পরিপূর্ণভাবে কায়েম নেই এবং ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করাও সম্ভব নয় সেখানে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা করা।

---

(১) হিজরত সম্পর্কে আরো জানতে হলে দেখুন দরসে হাদীস ১ম খন্ড ৫পৃঃ

(২) যা পৃথক পৃথক ভাবে সব মুসলমানের উপর ফরজ এবং যা প্রতিটি মুসলমানের নিজ দায়িত্বে আদায় করা কর্তব্য তাকে ফরজে আইন বলে। যেমন নামায, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি।

(৩) যা পৃথক পৃথক ভাবে সব মুসলমানের উপর ফরজ কিন্তু তাদের মধ্য হতে যদি কিছু লোক তা আদায় করে দেয় তবে সকলেই দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায়। তাকে ফরজে কেফায়া বলা হয়। যেমন জানাযার নামায ইত্যাদি।

তাই জিহাদ না করার পরিণতি নবী আকরাম (সা) এর একটি বাণীতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছেঃ

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُو وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ

যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ সে জিহাদ করেনি বা জিহাদের কোন চিন্তা, সংকল্প ও ইচ্ছা করেনি সে যেন মুনাফিকের মতো মৃত্যুবরণ করলো। (মুসলিম)

উপরোক্ত আলোচনায় বুঝা গেল, জিহাদের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তা একক প্রচেষ্টায় লাভ করা সম্ভব নয়। তাই আল্ কুরআনে এবং হাদীসে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় জামা'য়াত গঠনের নির্দেশ দেয়া হযেছে। আবার এ হাদীসের শেষ দিকে বলা হয়েছে জামা'য়াত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার অর্থই হচ্ছে ইসলাম থেকে সরে যাওয়া অর্থাৎ ইসলামী আদর্শের অনুকূলে জীবনযাপন করা তার জন্য আদৌ সম্ভব নয়।

পরিশেষে বলা হয়েছে ইসলাম বিরোধী মতবাদ, আদর্শ, দর্শন ও চিন্তা-বিশ্বাসের প্রচার-প্রসার হারাম। কেননা সে এর দ্বারা যে শুধু ইসলামের বিরোধিতা করে শুধু তাই নয় এবং তার এ প্রচেষ্টার ফলে ইসলামী জামা'য়াত বা সমাজ ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণও হয়ে যেতে পারে। এই কারণেই এ কাজের পরিণামে জাহান্নামের শাস্তি অবধারিত। আরো বলা হয়েছে যে, সে যদি সুবিধা মতো কিছু ইবাদাত বন্দেগী করেও তবু তা এ কঠিন আজাব থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারবে না এবং তার মুসলমান দাবীও কোন কাজে আসবে না।

তথ্য সূত্র

(১) হাদীস শরীফ ১ম খন্ড- মাওঃ আবদুর রহীম
(২) ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন- মাওঃ মতিউর রহমান নিজামী
(৩) ইসলামের পূর্ণাঙ্গরূপ-মাওঃ সদরুদ্দীন ইসলাহী

عن عبادة بن صامت رضـ وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من اصحابه بايعوني
على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم
ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف
فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذالك شيئا فعوقب في
الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذالك شيئا ثم ستره الله فهو الى
الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فبايعناه على ذالك ـ (بخارى)

"হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা) হ'তে বর্ণিত– তিনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী এবং আকাবা রাত্রিতে নিযুক্ত নেতাদের অন্যতম–তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন–তখন তাঁর চারদিকে একদল সাহাবী উপস্থিত ছিলেন– তোমরা আমার নিকট এ কথার উপর 'বাইয়াত' করো যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কোন জিনিসের শরীক করবে না। চুরি করবে না, যেনা–ব্যাভিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তোমরা পরস্পর পরস্পরের উপর অপবাদ দিবে না এবং ভালো কাজের ব্যাপারে কখনো নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই 'বাইয়াত' যথাযথভাবে পালন করবে তার বিনিময় ও পুরষ্কার স্বয়ং আল্লাহ্ দিবেন। আর যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কাজগুলোর মধ্যে কোন একটি কাজও করবে এবং এজন্য পৃথিবীতে কোন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে, তবে তা তার গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারা হিসাবে পরিগণিত হবে। আর যদি কোন নিষিদ্ধ কাজ কেউ করে ফেলে এবং আল্লাহ্ তা ঢেকে রাখেন, তবে এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র উপর বর্তাবে। তিনি ইচ্ছে করলে তাকে মা'ফ করে দিবেন অথবা ইচ্ছে করলে তাকে শাস্তি দিবেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ

অতঃপর আমরা কথাগুলো মেনে নবী করীম (সা) এর 'বাইয়াত' গ্রহণ করলাম।" (বুখারী)

শব্দার্থ

شَهِدَ –উপস্থিত ছিলো। اَلنُّقَبَاءُ –প্রতিনিধিবর্গ। لَيْلَةً –রাত্রি। اَلْعَقَبَةُ –আকাবা (মিনা নামক স্থানে অবস্থিত একটি পাহাড়। حَوْلَهُ –তাঁর চতুর্দিকে। بَايِعُوْنِى –আমার নিকট 'বাইয়াত' করো। لَاتُشْرِكُوْا –শরীক করোনা। بِاللهِ –আল্লাহ্‌র সাথে لَاتَسْرِقُوْا –তোমরা চুরি করো না। لَا تَزْنُوْا – ব্যাভিচার করোন لَا تَقْتُلُوْا –হত্যা করোনা। أَوْلَادَكُمْ –তোমাদের সন্তান। لَاتَاْتُوْا –তোমরা আরোপ করে না। بُهْتَانٍ –মিথ্যা অপবাদ। بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ –সামনা–সামনি। لَاتَعْصُوْا –সীমা লংঘন করোনা। اَجْرُهُ –তার বিনিময়। عَلَى اللهِ –আল্লাহ্‌র উপর। اَصَابَ –সম্পাদন করা। فَعُوْقِبَ অতঃপর হদ্ (নির্দিষ্ট শাস্তি) জারী করা হয়। سَتَرَهُ اللهُ –আল্লাহ্ তাকে গোপন রাখলেন। اِنْشَاءَ – যদি চান। عَفَاعَنْهُ –তা মাফ করবেন। عَاقَبَهُ –তাকে শাস্তি দিবেন।

বর্ণনাকারীর (রাবীর) পরিচয়

নাম উবাদা। ডাক নাম আবুল ওয়ালিদ। পিতা সামেত ইবনে কায়েস। মাতা কুররাতুল আইন। মদীনার খাজরাজ বংশের সালেম গোত্রের লোক। তিনি ছিলেন আনসার সাহাবী।

তিনি সাহাবাদের মধ্যে দু'টি বিষয়ে সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন। একটি হচ্ছে, আকাবার প্রথম শপথে অংশগ্রহণ সহ মদীনা হতে ক্রমাগত তিন বৎসরে মক্কায় আগত প্রত্যেকটি প্রতিনিধি দলের সংগে তিনি শামিল ছিলেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তিনি ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী। তাছাড়া তিনি নবী করীম (সা) এর সাথে সবগুলো যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেছেন এবং 'বাইয়াতে রিদওয়ান' এর সময়ও তিনি রাসুলে করীম (সা) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। হযরত

উবাদা (রা) উচুঁ স্তরের একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি শুদ্ধরূপে কুরআন পাঠ করতেন এবং পবিত্র কুরআনের হাফিজ ছিলেন। আহলে সুফফাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য যে মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তিনি ছিলেন তার তত্ত্বাবধায়ক ও শিক্ষক। মহানবী (সা) তাঁকে যাকাত আদায়ের কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তাছাড়া তিনি হযরত উমর (রা) এর সময় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পলন করেন। সিরিয়া ও হোমসের শাসনকর্তা এবং ফিলিস্তিনের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। হিজরী ৩৪ সনে ৭২ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৮১টি। তারমধ্যে ৬টি হাদীস বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির গুরুত্ব

বুখারী শরীফে হাদীসটি পাঁচ জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া মুসলিম, তিরমিযি ও নাসায়ী শরীফেও সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে বর্ণিত হয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের পূর্বে কি ধরনের নেতৃত্ব সৃষ্টি করা প্রয়োজন এবং তাদের নৈতিক ও তাকওয়ার মান কিরূপ হওয়া উচিত তা অত্র হাদীসে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। আরও তুলে ধরা হয়েছে একটি ইসলামী সমাজ কিভাবে ধ্বংস হয় সেই চোরা পথগুলো। যেহেতু আল্লাহ্র রাসূল (সা) একটি ইসলামী রাষ্টের স্বপ্ন দেখছিলেন সেহেতু নিষিদ্ধ রাস্তাগুলোর প্রবেশ দ্বারে অর্গল এঁটে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। যেন একটি সুখী-সমৃদ্ধ সুন্দর সমাজ দেহে কোন ক্রমেই পঁচন না ধরে।

ব্যাখ্যা

বাইয়াতঃ 'বাইয়াত' শব্দটি আরবী بَيْعَةٌ শব্দ থেকে গঠিত। অর্থ বিক্রি করা, ক্রয় করা, চুক্তি, শপথ, অংগীকার, শ্রদ্ধা প্রদর্শন আনুগত্য স্বীকার করা ইত্যাদি।[১]

(১) বাইয়াতের হাকিকত ২য় প্রষ্ঠা দ্রষ্টব্য

প্রতিটি মু'মিন স্বেচ্ছায় এবং সন্তুষ্টির সাথে নিজের জান এবং মালকে আল্লাহ্র নিকট বিক্রি করে দেয়; তাঁর সন্তোষ ও জান্নাতের বিনিময়ে। আর আল্লাহ্ও শুধুমাত্র মু'মিনদের নিকট হতে জান-মাল খরিদ করেন। আল্লাহ্ মুমিন ছাড়া আর কারো সাথে ক্রয়-বিক্রয় করেন না। করা সম্ভবও নয়। কেননা বিক্রিত বস্তু ক্রেতার নিকট চাহিবা মাত্র হস্তান্তর করতে বিক্রেতা বাধ্য। এ মূলনীতি অনুসরণ করা একমাত্র মু'মিনদের পক্ষে সম্ভব। কারণ প্রতিটি মু'মিনের অন্তরে এ অনুভূতি সর্বদা জাগ্রত থাকে যে "আমার জান এবং মালের মালিক আমি নই। আল্লাহ্ মেহেরবানী করে তা আমার নিকট আমানত রেখেছেন মাত্র। কাজেই তিনি যেভাবে চান সেভাবেই এর ব্যবহার করতে হবে। পক্ষান্তরে একজন মুনাফিক, কাফের কিংবা মুশরিক তা মনে করে না। এজন্য আল্লাহ্ তাদের সাথে কেনা বেচাও করেন না। এটা তো একটি সাধারণ কথা যে, যে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হতে মূল্য আদায় করতে চায় কিন্তু তাকে বিক্রিত মাল হস্তান্তর করতে চায় না তার সাথে কোন বুদ্ধিমানই ক্রয়-বিক্রয় করবে না। সূরা তওবায় বলা হয়েছে-

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ قف وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ

নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের জান মাল জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছে। তাহা আল্লাহ্র পথে লড়াই করে, (দুশমনকে) হত্যা করে এবং নিজেরাও নিহত হয়। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তাদের জন্য (জান্নাত দেবার এ ওয়াদা) আল্লাহ্র দায়িত্বে একটি পাকা ওয়াদা -বটে। (তাওবাঃ ১১১)

কাফেরদের সাথে এ বেচা-কেনা এজন্য সম্ভব নয় যে তারা পরকালকেই অস্বীকার করে। আর মুশরিক এবং মুনাফিকেরা যদিও পরকালকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না তবুও তারা অস্বীকার করার মতো ধৃষ্টতাও প্রদর্শন করে না। এরা দুনিয়ার জীবন এবং ভোগ বিলাসকে সব কিছুর উপর প্রাধান্য দেয়। পক্ষান্তরে একজন মুমিন দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতের জীবনকে প্রাধান্য দেয়। এজন্য পৃথিবীর

লোভ-লালসা, মায়া-মোহ, কোন কিছুই তাকে পিছনে টানতে পারে না। প্রয়োজনে সর্বাধিক প্রিয়বস্তু জীবনটাও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তাঁর দ্বীনের পথে উৎসর্গ করে দেয়।

বিক্রিত জান-মাল আল্লাহ্ নিজে এসে গ্রহণ করেন না। আবার নিজে নিজেও তা সঠিক ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। এজন্য আল্লাহ্ কর্তৃক ক্রয়কৃত জান-মাল তাঁর আদিষ্ট পথে ব্যয় করার জন্য একজন প্রতিনিধির প্রয়োজন। আর সেই প্রতিনিধি হচ্ছেন নবী-রাসূলগণ। কিন্তু যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সা) এর পরে আর কোন নবী ও রাসূল নেই তাই মুমিনদের নির্বাচিত খলিফা বা নেতাই হচ্ছেন সেই প্রতিনিধি। তাঁর নিকট বাইয়াত করা প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য। তবে নবী করীম (সা) এর হাতে বাইয়াত এবং অন্য ইমাম বা নেতার হাতে বাইয়াতের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। নবী করীম (সা) এর আনুগত্য হচ্ছে বিনা শর্তে কিন্তু অন্য নেতাদের আনুগত্য হচ্ছে শর্ত সাপেক্ষে। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে কিন্তু রাসূল (সা) ছাড়া আর কারো আনুগত্য অন্ধভাবে করা যাবে না। সে আনুগত্য হতে হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সা) অধীন। বাইয়াতের মাধ্যমে যে দাবীগুলো পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেয়া হয়, সেগুলো হচ্ছেঃ

(১) জান-মাল আল্লাহ্‌র নিকট যে বিক্রি করা হয়েছে তা বাইয়াতের মাধ্যমে তাঁর নিকট সোপর্দ করা, যেন তিনি জান ও মাল আল্লাহ্ ও রাসূল প্রদত্ত নিয়মে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে পারেন।

(২) বাইয়াত গ্রহণকারী ব্যক্তির পক্ষ হতে তাকে সে নির্দেশ দেয়া হবে তা যদি কুরআন সুন্নাহ্ বিরোধী না হয় তবে বিনা দ্বিধায় তা মানতে হবে। এ ব্যাপারে পার্থিব কোন ক্ষয় ক্ষতির পরওয়া করা যাবে না।

(৩) যদি বাইয়াত গ্রহণকারী ব্যক্তির কোন নির্দেশ সঠিক নয় বলে মনে হয় তবে এ ব্যাপারে তাঁর সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসায় পৌঁছতে হবে। কিন্তু নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্দেশ না মানা কোনক্রমেই ঠিক নয়।

(৪) কোন বিশেষ কারণে যদি নির্দেশ পালন করা সম্ভব না হয় তবে তাঁকে অবহিত করতে হবে এবং তাঁর সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত মনে করতে হবে।

ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করতে গেলেই প্রথমে প্রয়োজন একটি সুসংঘবদ্ধ জামায়াতের। দীন কায়েম করা যেমন ফরজ ঠিক তেমনি জামায়াত

বদ্ধ হওয়াও ফরজ। কেননা জামায়াতবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া কোন ক্রমেই আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আবার জামায়াতবদ্ধ হবার বন্ধনসূত্রই হচ্ছে বাইয়াত।

এজন্যেই ইসলামে বাইয়াতের গুরুত্ব এত বেশী।

আকাবার ১ম, ২য়, ৩য় বাইয়াত এবং হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় যে বাইয়াত সংঘটিত হয়েছিল যাকে "বাইয়াতে রিদওয়ান" বলা হয়, এ সমস্ত বাইয়াত ছাড়াও নবী করীম (সা) বিভিন্ন সময় পুরুষ ও মহিলা সাহাবীদের নিকট হতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। সাহাবীগণ বাইয়াতকে ঈমানের রুহ্ মনে করতেন। তাই দেখা যায় কোন পুরুষ অথবা মহিলা সাহাবী যদি কখনো কোন ভুল করে ফেলতেন সাথে সাথে নবী করীম (সা) এর নিকট এসে পুণরায় বাইয়াত করানোর অনুরোধ করতেন। যদি আল্লাহ্র রাসূলের (সা) নিকট কালেমা পড়াই যথেষ্ট হতো তবে বাইয়াতের ব্যাপারে এমন পেরেশানী তাদের মধ্যে থাকতো না। এ সমস্ত ঘটনা থেকেও বুঝা যায় যে, ইসলামে বাইয়াতের গুরুত্ব কতটুকু।

শিরক না করাঃ শিরক হচ্ছে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাউকে এমন মনে করা যা একমাত্র আল্লাহ্রই হওয়া বা করা সম্ভব। এ রকম ধারণা বা কর্ম করা যাবে না। অর্থাৎ কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ যাই হোক না কেন আল্লাহ্ ছাড়া কেউই তা করতে সক্ষম নয়। প্রয়োজন পূরণকারী, বিপদ মোচনকারী, প্রার্থনা শ্রবণকারী, রিজিক প্রদানকারী, বিপদাপদে আশ্রয়স্থল একমাত্র আল্লাহ্। তাছাড়া কাউকে এ রকম প্রভাবশালী মনে না করা যার সুপারিশে আল্লাহ্র ফায়সালা পরিবর্তন হতে পারে। বৈষয়িক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক যে কোন বিষয়েই হোকনা কেন আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো দ্বারস্থ হওয়া যাবে না। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো আইন-কানুন মানা যাবে না। চাই, রাজনৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক যাই হোকনা কেন। এসব সিদ্ধান্ত মনে প্রাণে গ্রহণ করে তার উপর অবিচল থাকাই হচ্ছে তৌহিদের দাবী বা শির্কমুক্ত জীবন-যাপন।

চুরি না করাঃ চুরি হচ্ছে কোন বস্তু তার মালিকের অগোচরে ও অসম্মতিতে নিজে ভোগ করা বা এর মালিক হয়ে যাওয়া। ইসলামী বিধানে এটা একটি গুরুতর ফৌজদারী অপরাধ। শরীয়তের পরিভাষায় কবিরা গুনাহ্। তবে মানুষ যাতে খেতে পরতে না পেয়ে চুরি করতে বাধ্য না হয় সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব

হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের। যদি কোন চোর ধরার পর প্রমাণিত হয় যে জীবন বাঁচানোর জন্য চুরি ছাড়া আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা তার ছিলো না; তবে তাকে শাস্তি দেয়া তো দূরের কথা সরকারের প্রতিটি ব্যক্তিই উল্টা তার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য।

ব্যাভিচার না করাঃ আল্লাহ্ জাল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا (اسرى)

তোমরা ব্যাভিচারের ধারে কাছেও যেও না কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জ কাজ ও অতীব নিকৃষ্ট পথ। (সূরা বনী ইসরাইলঃ৩২)

উপরোক্ত আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, ব্যাভিচার করা তো দূরের কথা এমন কাজ বা আচরণ করাও হারাম যা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ব্যাভিচারের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। যে সব কাজ মানুষকে যৌন সুড়সুড়ি দেয় সেগুলোও উপরোক্ত আয়াতের আদেশের আওতাভুক্ত। যেমন অশ্লীল যৌন আবেদনমূলক পত্র-পত্রিকা, যৌন সুড়সুড়িমূলক সাহিত্য, নারী দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ভঙ্গির অশ্লীল চিত্র, নগ্ন ও অর্ধনগ্ন চিত্র ইত্যাদি। এ সমস্ত কাজে যারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে অংশগহণ করবে তাদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ -

যারা চায় যে, মুসলমানদের মধ্যে নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার প্রচার হোক, তাদের জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।

সন্তান হত্যা না করাঃ মানুষ প্রধানত দুই কারণে সন্তান হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

এক— বেশী সন্তান হলে তাদেরকে ঠিকমত খাওয়ানো পরানো যাবে না এবং তাদেরকে মানুষ করা যাবে না। অভাব অনটনে নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ؕ

অভাব অনটনের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না।

(বনী ইসরাইল)

দুই— কন্যা সন্তান হলে সমাজে তাদের নিরাপত্তা নেই। বয়োঃসন্ধিকালে উপযুক্ত পাত্র ক্রয়ের অসামর্থ্যতা। মেয়ে সন্তানের জনক জননীকে সমাজে হেয় মনে করা এবং তাদেরকে মানসিক পীড়া দেয়া।

এখন প্রশ্ন হতে পারে ভ্রুণ হত্যা সন্তান হত্যার আওতাভুক্ত কিনা? হ্যাঁ। অবশ্যই ভ্রুণ হত্যা সন্তান হত্যারই শামিল। কেননা ভ্রুণ হত্যা করা হয় সন্তানের জন্মকে ঠেকানোর জন্যেই। এ প্রবণতা অত্যন্ত মারাত্মক। আমি বাসে উঠছি আর কউকে উঠতে দেবো না, এ রকমই যেন এক স্বার্থপর মনোভাব একাজে উদ্বুদ্ধ করে। স্বার্থপরতা নামক বিষবৃক্ষ হতেই এর অংকুরোদগম হয়।

কাউকে দোষারোপ না করাঃ কাউকে দোষারোপ করার প্রবণতা একটি নৈতিক ব্যাধি। এ ব্যাধি যখন মাহামারীর আকার ধারন করে তখন সমাজ তিক্ততায় জর্জরিত হয়ে যায়। তখন সমাজ হতে ভালোবাসা, সম্প্রীতি, স্নেহ-মমতা ইত্যাদি নির্বাসিত হয়। ইসলামী সমাজ এটাকে কোন ভাবেই মেনে নিতে রাজী নয়। তাই শরীয়ত এটাকে শাস্তি মূলক অপরাধ বলে গণ্য করেছে।

ভালো কাজের নাফরমানী না করাঃ এ ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতি হচ্ছেঃ

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ -

তোমরা একে অপরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করো ন্যায়নীতি ও তাকওয়ার ভিত্তিতে। (সাবধান) যা গুনাহ ও সীমা লংঘনের কাজ তাতে কারও এক বিন্দু সাহায্য ও সহযোগিতা করো না। (সূরা আল মায়েদাঃ২)

নবী করীম (সা) ইরশাদ করেনঃ

اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ -

'মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের সামাজিক ও সামগ্রীক দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি (উলিল আমর) দের কথা শোনা ও মানা। তা পছন্দ হোক বা না হোক।

যতোক্ষণ না অন্যায় কাজের আদেশ দিবে। আর যখন কোন অন্যায় বা পাপ কাজের আদেশ দিবে তখন তা শোনা কিংবা মানা মুসলমানদের কর্তব্য নয়।'

(বুখারী, মুসলিম)

পরিশেষে বলা হয়েছে, এর পরও যদি কেউ উল্লিখিত অপরাধসমূহের কোন একটি করে এবং ধৃত হয় তবে অবশ্যই তাকে শরীয়তের দন্ড ভোগ করতে বাধ্য করা হবে।

বিভিন্ন হাদীস ও আসার[২] হতে একথা প্রমাণিত যে কোন অপরাধীকে শরীয়তের দন্ড প্রদানের পর তার অপরাধকৃত পাপের কাফফারা হয়ে যায়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাকে ঐ অপরাধের জন্য পুনরায় শাস্তি দিবেন না। যেমন হযরত আলী (রা) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে-

وَمَنْ اَصَابَ ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهٖ فِى الدُّنْيَا فَاللّٰهُ اَكْرَمُ مِنْ اَنْ يُّثَنِّىَ بِالْعُقُوْبَةِ عَلٰى عَبْدِهٖ فِى الْاٰخِرَةِ-

কোন অপরাধীকে যদি পৃথিবীতে তার কৃত অপরাধের জন্য দন্ডিত করা হয় তবে পরকালেও তাকে আল্লাহ্ দ্বিতীয় বার শাস্তি দিবেন-আল্লাহ্ এ সবের উর্ধে।

আর যদি অপরাধ করে ধৃত না হয় এবং আল্লাহ্ তা গোপন রাখেন তবে সে অপরাধের দায়-দায়িত্ব কোন ইসলামী সরকাররের নয়। আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাকে মা'ফ করবেন অথবা শাস্তি দিবেন। অথবা তাকে প্রথমে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে নির্ধারিত শাস্তি দিয়ে পরে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র ইখতিয়ারভূক্ত।

২। সাহাবাদের কথা, কাজ ও অনুমোদনকে হাদীসের পরিভাষায় 'আসার' বলা হয়।

তথ্য সূত্র

১। তাফহীমুল কুরআন-সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ)
২। হাদীস শরীফ ২য় খন্ড- মাওঃ আবদুর রহীম (রহ)
৩। বাইয়াতের হাকীকাত-অধ্যাপক গোলাম আযম
৪। সাহাবা চরিত-৫ম খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
৫। মাসিক পৃথিবী-বিভিন্ন সংখ্যা।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَّلَا وَصَبٍ وَّلَا هَمٍّ وَّلَا حُزْنٍ وَّلَا اَذًى وَّلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ (بخارى)

"আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইয়াহ (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ যখন কোন মুসলমান মুসিবতে পড়ে, চাই তা কোন যাতনা, অথবা কোন রোগ যন্ত্রনা অথবা কোন উদ্বেগ–দুশ্চিন্তা বা নির্যাতন অথবা মনোকষ্ট যা–ই হোক না কেন, এমনকি তার একটি কাটাও যদি ফুটে এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তার সব গুনাহ মাফ করে দেন। (বুখারী)

শব্দার্থ

مَا يُصِيْبُ –যে মুসিবত হয়। نَصَبٌ –যাতনা। هَمٌّ – রোগ যন্ত্রনা। حُزْنٌ –দুশ্চিন্তা। اَذًى –জুলুম–নির্যাতন। غَمٌّ –শোক, মনোকষ্ঠ। شَوْكَةٌ –কাঁটা। يُشَاكُهَا –যখন–তা ফুটে। كَفَّرَ اللّٰهُ –আল্লাহ্ মা'ফ করে দেন। خَطَايَاهُ– –তার গুণাহ্সমূহ।

রাবীর পরিচয়

আবু হুরাইরার (রা) পরিচয় দারসে হাদীস ১ম খন্ড ও অত্রপুস্তকের ২নং ও ৯নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) ঃ উহুদ যুদ্ধের মুজাহিদ রিক্রুট হচ্ছে। তের বছরের এক বালক। পিতা তার সন্তানের জন্য সুপারিশ করছেন রাসূলে আকরাম (সা) এর নিকট। হুজুর (সা) বয়সের স্বল্পতার কারণে অনুমতি দিলেন না। পুনরায় ঐ বালকের পিতা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার শরীরতো বেশ হৃষ্টপুষ্ট। তাছাড়া হাড়গুলোও বেশ মোটাসোটা। এতো কিছুর পরও ঐ বালকের যুদ্ধে যাবার

অনুমতি পাওয়া গেলো না। তখন পিতা ছেলেকে না নিতে পেরে একাই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে যুদ্ধে গেলেন এবং শাহাদাত বরণ করলেন। এ বালকই ছিলেন হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)। আবু সাঈদ কুনিয়াত। নাম সা'দ ইবনে মালেক। মদীনার খাজরায গোত্রের বনু খুদরু গোত্রের লোক। এজন্য খুদরী বলা হয়। আনসার সাহাবী। উহুদের পরবর্তী সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর পিতার শহাদাতের খবর শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট এলেন কিছু প্রার্থনার উদ্দেশ্যে। তখন হুজুর (সা) দেখে বললেন-'যে সবর চায় তাকে আল্লাহ্ সবর দান করেন। যে আল্লাহ্র নিকট পবিত্রতা প্রার্থনা করে আল্লাহ্ তাকে পরিবত্রতা দান করেন। যে ব্যক্তি ধনঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করে তাকে আল্লাহ্ ধন-ঐশ্বর্য্য দান করেন।" একথা শুনে তিনি কিছু না চেয়ে ফিরে আসলেন। বিনিময়ে মহান আল্লাহ্ তাকে জ্ঞানের ঐশ্বর্য্য দান করেছিলেন। কেননা তখন তরুণ ও যুবক সাহাবীদের মধ্যে তার জ্ঞানের তুলনা ছিলোনা। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবুবকর, উমর, উসমান, আলী এবং যায়েদ ইবনে সাবিতের (রা) কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবার তার নিকট হ'তে ইবনে আব্বাস, ইবনে উমার, জাবির, মাহমুদ ইবনে লাবীদ, আবু উমামা, আবু তুফায়েল (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ এবং অনেক তাবেয়ীনগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি মোট ১১৭০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ৮৪ বৎসর বয়সে ৭৪হিঃ মতান্তরে ৬৪হিঃ তিনি ইন্তেকাল করেন।

গুরুত্ব

মানুষকে পৃথিবীতে জীবনের সফরে বিভিন্ন প্রকার চড়াই-উৎরাই, ঘাত-প্রতিঘাত, বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হয়। আর এ প্রতিকূলতার মধ্যেই পথ করে নিতে হয় জীবনের। হয়তো সে পথ কখনো হয় সুগম এবং কখনো হয় দুর্গম। ঈমানদারদের জন্য এ সফরের পথ দুর্গম হওয়াই স্বাভাবিক। তাই কোন ঈমানদার যেন দুর্গম পথের ক্লান্তিতে বিভ্রান্ত হয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে ব্যর্থ না হয় এজন্য তাদেরকে অগ্রিম সান্ত্বনা বাণী শুনানো হচ্ছে। কবির ভাষায়ঃ-

আসছে পথে আঁধার নেমে-
তাই বলে কি রইবি থেমে;
বারে বারে জ্বালবি বাতি-

হয়তো বাতি জ্বলবে না,
তা বিলে তোর ভীরুর মতো
বসে থাকলে চলবে না।
বস্তুত হাদীসটি বিপদগ্রস্ত মুমিনের জন্য আঁধারের আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

ব্যাখ্যা

পৃথিবীতে মাত্র চারটি কারণে বিভিন্ন ধরনের বালা মুসিবত আসতে পারে। যথা (১) গজব, (২) সর্তকতা, (৩) পরীক্ষা, (৪) গুনাহ্রে কাফ্ফারা স্বরূপ। তারমধ্যে প্রথম দুটি শুধুমাত্র কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট এবং শেষোক্ত দু'টি মুমিনদের জন্য। এছাড়া অন্য কোন কারণে পৃথিবীতে কোন বালা মুসিবত আসে না। আর আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়াও কোন মুসিবত আসতে পারে না। অন্য কথায় যে ধরণের মসিবতই আসুক না কেন তা অবশ্যই আল্লাহ্ জানেন। সূরা আত্ তাগাবুনে বলা হয়েছেঃ

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ

কোন বিপদ কখনো আসে না কিন্তু (যখন) আসে (তখন) আল্লাহ্র অনুমতি ক্রমেই আসে। (সূরা আত্ তাগাবুনঃ১১)

সূরা আল হাদীদে বলা হয়েছেঃ

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ

"এমন কোন বিপদ নেই যা পৃথিবীতে কিংবা তোমাদের নিজেদের উপর আপতিত হয়, যা আমরা তা সৃষ্টি করার পূর্বে একটি কিতাবে লিখে রাখিনি।"

(সূরা আল-হাদীদঃ ২২)

উক্ত আয়াতে কিতাব বলতে ভাগ্যলিপি-তাকদীরকে-বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি বস্তুই কিভাবে চলবে বা ব্যবহৃত হবে তার নিয়মনীতি। আবার যদি ঐ

বস্তু ঠিকমত না চলে বা ব্যবহৃত না হয় তবে কোন ধরণের বিপর্যয় ঘটবে ইত্যাদি বিষয় আল্লাহ্ তার নির্দিষ্ট দপ্তরে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

সত্যি কথা বলতে কি, অবিশ্বাসীগণ বিপদের মুহূর্তে পেরেশান হয়ে যায়। কিংকর্তব্যবিমঢ় হয়ে দিকবিদিক ছুটাছুটি করে। তবু তারা আশার কোন আলো দেখতে পায় না। পক্ষান্তরে মুমিনগণ বিপদকে আল্লাহ্র তরফ হতে পরীক্ষা অথবা গুণাহের কাফফারা স্বরূপ মনে করে। ফলে তাদের মনোবল বেড়ে যায় এবং স্বস্তির সাথে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে। আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ط

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছে (বিপদের মুহূর্তে) আল্লাহ্ তার দিলকে হেদায়েত দান করেন।" (সূরা আত্ তাগাবুনঃ১১)

অর্থাৎ তাকে ধৈর্য্যধারণের উপযোগী একটি দিল আল্লাহ্ উপহার দেন। হাজারো বিপদ মুসিবতেও যে দিল প্রকম্পিত হয় না। এজন্যই নবী করীম (সা) বলেছেনঃ

عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهٗ كُلَّهٗ لَهٗ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذٰلِكَ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهٗ وَاِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهٗ ـ

মুমিনের সকল কাজই বিস্ময়কর। তার প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর (এ সৌভাগ্য) মু'মিন ছাড়া আর কেউই লাভ করে না। দুঃখ কষ্টে সে সবর করে, এটি তার জন্য কল্যাণ ডেকে আনে। আবার সুখ শান্তি লাভ করলে সে শোকর আদায় করে। আর এটিও তার জন্য কল্যাণই বয়ে আনে।" অর্থাৎ সর্বাবস্থায় সে কেবল কল্যাণই লাভ করে। (মুসলিম)।

তিরমিযি শরীফের এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ

وَبِالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللّٰهَ تَعَالٰى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ.

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মুমিন নর নারীর উপর সময় সময় বিপদ ও পরীক্ষা এসে থাকে। কখনো সরাসরি তার উপর বিপদ আসে। কখনো তার সন্তান মারা যায়, আবার কখনো তার ধন সম্পদ ধ্বংস হয় (আর এ সকল মুসিবতে ধৈর্য্যধারণ করার ফলে তার কাল্‌ব পরিস্কার হতে থাকে এবং পাপ পংকিলতা হতে মুক্ত হতে থাকে), অবশেষে সে এমন অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হয় যে, তার আমলনামায় আর কোন গুণাহ্ অবশিষ্ট থাকে না।

(তিরমিযি)

পরীক্ষা ছাড়া যেমন কোন ছাত্র/ছাত্রীর মূল্যায়ন করা যায় না, ঠিক তেমনি ভাবে পরীক্ষা ছাড়া ঈমানের মূল্যায়ন করা যায় না। এজন্য মুমিনদেরকে আল্লাহ্ বিভিন্ন ধরণের আপদ বিপদ, বালা মুসিবত দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন। একথাটি স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজেই বলেছেনঃ

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُّتْرَكُوْا أَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝

"মানুষ কি মনে করে- আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি- একথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ কোন পরীক্ষাই তাদেরকে করা হবে না।"

(সূরা আনকাবুতঃ ২)

অতঃপর আল্লাহ্ বলেনঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ -

আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো ভয়-ভীতি ও ক্ষুধা-দারিদ্র দিয়ে এবং ধন সম্পদ, ফল-ফসল ইত্যাদি নষ্ট করে দিয়ে। এমনকি তোমাদের নিজেদের জীবনের উপরও বিভিন্ন ধরণের মুসিবত দিয়ে। (এ অবস্থায় যারা ধৈর্য্য অবলম্বন করে, হে নবী) আপনি ঐ সমস্ত ধৈর্য্যশীলদেরকে সুসংবাদ দিন।"

(সূরা আল বাকারাঃ ১৫৫)

তবে ঈমানের পক্ষে যেমন পরীক্ষা দিতে হবে তেমনিভাবে সে পরীক্ষায় কিভাবে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে তার পথও বাতলে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ -

(যখন তোমরা বিপদাপদে নিপতিত হও, তখন তোমরা) নামায ও ধৈর্য্যের বিনিময়ে (বিপদ থেকে উত্তীর্ণের জন্য) আমার নিকট সাহায্য চাও।

(সূরা আল বাকারা)

নবী করীম (সা) বলেছেনঃ

مَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَّاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ -

"যে ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণের চেষ্টা করবে আল্লাহ্ তাকে ধৈর্য্যের শক্তি প্রদান করবেন। ধৈর্য্য হ'তে অধিক উত্তম ও কল্যাণকর কোন বস্তু আর কাউকে দান করা হয়নি। (বুখারী, মুসলিম)

পরীক্ষা যতো কঠিন হবে তার প্রতিদানও হবে ততো মুল্যবান। যেমন নবী রাসূলদের মধ্যে হযরত ইব্রাহিম (আ) ছাড়া আর কাউকে আল্লাহ্ এত কঠিন পরীক্ষায় ফেলেননি। তাই তার মর্যাদাও সবচেয়ে বেশী বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাকে 'মুসলিম জাতির পিতা' বানিয়ে চির স্মরণীয় করে রেখেছেন। শুধু তাই নয়, নবী করীম (সা) পর্যন্ত বলেছেন যে, ইব্রাহিম (আ) ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর আল্লাহ্ যে ধরনের রহমত ও বরকত অবতীর্ণ করেছিলেন আমার উপর সেই ধরনের রহমত ও বরকত অবতীর্ণের জন্য দু'আ করো। যার প্রেক্ষিতে আমরা সালাতেও দরূদে ইব্রাহিম পড়ে থাকি।

নবী করীম (সা) বলেছেনঃ

اِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضٰى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ -

বিপদ ও পরীক্ষা যতো কঠিন হবে তার প্রতিদানও হবে ততো মুল্যবান। (এ

শর্তে যে মানুষ বিপদে ধৈর্য্যহারা হয়ে হক পথ থেকে যেন পালিয়ে না যায়)। আর আল্লাহ্ যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন তখন-অধিক যাচাই ও সংশোধনের জন্যে তাদেরকে বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অতঃপর যারা আল্লাহ্র সিদ্ধান্তকে খুশী মনে মেনে নেয় এবং ধৈর্য্য ধারণ করে, আল্লাহ্ তাদের উপর খুশী হন। আর যারা এ বিপদ ও পরীক্ষায় আল্লাহ্র উপর অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহ্ও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন।" (তিরমিযি)।

অনেক দুর্বল ঈমানের লোক পরীক্ষার সময় বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তাদের কথাও আল্লাহ্ বলেছেন। সূরা আল ফজরে বলা হয়েছেঃ

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي
أَكْرَمَنِ ۝ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝

"মানুষের অবস্থা এই যে, তার রব যখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তাকে সম্মান ও নিয়ামত দান করেন, তখন সে বলে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর যখন তিনি তাকে (পরীক্ষা মূলক) বিপদের সম্মুখীন করেন এবং তার রিজিক তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে বলে, আমার রব আমাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করেছেন।" (সূরা আল ফজরঃ ১৫-১৬)

বস্তুত একজন ভালো ছাত্র যেমন সর্বদা তার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকে তদ্রুপ একজন মু'মিনও পরীক্ষার মাধ্যমে তার মর্যাদা মহান রবের দরবারে উঁচু করার জন্য তথা রবের সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য সদা তৎপর থাকেন। যে সমস্ত গুণের কারণে একজন মুমিন জান্নাতে যেতে পারে তার মধ্যে ধৈর্য্য অবলম্বন করাও একটি গুণ। সূরা রা'দে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছেঃ

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ
لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

" তারা রবের সন্তুষ্টির জন্য বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করে, সালাত কায়েম করে। আমাদের দেয়া রিজিক থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে দান করে, আর অন্যায়কে

ন্যায় দ্বারা প্রতিরোধ করে। বস্তুত পরকালের ঘর এই লোকদের জন্যই নির্দিষ্ট।"
(সূরা আর রা'দঃ ২২)

সূরা আদ দাহ্‌রে বলা হয়েছেঃ

وَجَزٰهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ۝

"আর তাদের ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন।"
(সূরা আদ-দাহরঃ১২)

শিক্ষাবলী

(১) রোগ, শোক, বিপদাপদ-এগুলো আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আসে।

(২) বালা-মুসিবত, দূঃখ-কষ্ট, ঈমানদারের জন্য আল্লাহ্‌র তরফ থেকে হয় পরীক্ষা না হয় গুণাহ্ মা'ফের কাফফারা স্বরূপ।

(৩) বিপদের মুহূর্তে সালাত (নামায) ও ধৈর্য্যের বিনিময়ে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য চাইতে হবে।

(৪) আল্লাহ্ সর্বদা ধৈর্য্যশীলদের সাথে থাকেন এবং ধৈর্য্যের বিনিময়ে তার গুনাহ্ সমূহ মাফ করে জান্নাত দিবেন।

(৫) যেহেতু বিপদের মুহূর্তে ধৈর্য্য না ধরে অন্য কোন প্রতিকার আমাদের হাতে নেই, তাই ধৈর্য্য ধারণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তথ্য সূত্র

(১) তাফহীমুল কুরআন-সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহ)
(২) মিশকাত শরীফ
(৩) সাহাবা চরিত্র ৫ম খন্ড-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা
(৪) বুখারী শরীফ।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رض قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأُحِبُّكَ فَقَالَ انْظُرْ مَاذَا تَقُوْلُ قَالَ وَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأُحِبُّكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِيْ فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلٰى مَنْ يُحِبُّنِيْ مِنَ السَّيْلِ مُنْتَهَاهُ ـ

"হরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) হ'তে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা) এর খেদমতে হাজির হয়ে বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র কসম, আমি আপনাকে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ তুমি কি বলছো তা একবার ভেবে দেখো। সে বললোঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমি আপনাকে ভালোবাসি। সে কথাটি তিনবার উচ্চারণ করলো। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বললেনঃ তুমি যদি সত্যিই আমাকে ভালোবাস তবে দরিদ্রতার কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। কেননা, যে ব্যক্তি আমাকে ভালোভাসে সে নিম্ন ভুমির দিকে পানি যেভাবে তীব্রগতিতে প্রবাহিত হয় তদাপেক্ষাও দ্রুত গতিতে দরিদ্রতার দিকে অগ্রসর হতে বাধ্য হয়।" (তিরমিযি)

শব্দার্থ

وَاللّٰهِ –আল্লাহর কসম। وَ (ওয়াও)–কসম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। إِنِّيْ –নিশ্চয় আমি। لَأُحِبُّكَ –অবশ্যই আমি আপনাকে ভালোবাসি। এখানে لَ (লাম) তাকিদের জন্য বা গুরুত্ব দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। উপরোক্ত শব্দটি তিনটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। (যথা لَ অবশ্যই أُحِبُّ আমি ভালোবাসি كَ আপনাকে) فَقَالَ –অতঃপর তিনি বললেন। اُنْظُرْ –দেখ, চিন্তা ভাবনা করো ইত্যাদি। مَاذَا –যা, تَقُوْلُ –তুমি বলছো। ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

-তিনবার। اِنْ -যদি। كُنْتَ -তুমি থাক। تُحِبُّنِى -আমাকে ভালোবাস। (এখানে দু'টি শব্দ تُحِبُّ -ভালোবাস, نِى -আমাকে।) فَاَعِدَّ -তবে তৈরী হয়ে যাও। لِلْفَقْرِ -দরিদ্রতার জন্য। اَسْرَعُ -তীব্র গতিতে। مِنَ السَّيْلِ مُنْتَهَاهُ -নীচু ভূমির দিকে প্রবাহিত হয়।

হাদীসটির গুরুত্ব

নবীকে ভালোভাসার দাবী শুধুমাত্র মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দেয়াই যথেষ্ট নয় এবং নবী যে আদর্শ ও মিশন নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং যে পদ্ধতিতে তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, সে আদর্শকে নিজে গ্রহণ করা এবং রাসূল (সা) এর মতো করে জীবন পরিচালনা করাই হচ্ছে ভালোবাসার তাৎপর্য। অন্যথায় এ ভালোবাসার দাবী অর্থহীন ও অসার।

নবীর পথে চলতে গেলে বহু বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে। এমনকি জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিতে হবে। তাছাড়া পৃথিবীতে বল্গাহীন জীবন যাপন ও আরাম আয়েশের সমস্ত পথই তার জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। তখন সাধারণ ভাবে জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীও হালাল উপায়ে সংগ্রহ করা তার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। একথাগুলো ভালোভাবে বুঝে শুনে মনে প্রাণে গ্রহণ করে তবেই রাসূলের (সা) ভালোবাসার দাবী করা যেতে পারে। অন্যথায় তা হবে মুনাফিকী। কাজেই ভালোবাসার মৌখিক দাবী করে মুনাফিকের কাতারে না গিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেয়াই হচ্ছে এ হাদীসের দাবী। সত্যি কথা বলতে কি, অত্র হাদীসে নবী প্রেমের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্যাখ্যা

এক হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেনঃ

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ -

"তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যতোক্ষণ না তার নিকট তার পিতা, সন্তানাদি ও সমস্ত মানুষ অপেক্ষা আমি অধিকতর প্রিয় হবো।"

(বুখারী, মুসলিম)

উপরোক্ত হাদীস ছাড়াও এ অর্থের আরো বেশ ক'টি হাদীস অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আছে। সব হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) এর ভালোবাসা। মুসলিম জাহানের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আল্লামা কাজী ইয়ায ভালোবাসার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেনঃ "রাসূল (সা) কে ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে তার আদর্শ গ্রহণ, পালন ও রক্ষা করা। রাসূল প্রদত্ত শরীয়তকে বিলয় হতে রক্ষা করা। প্রয়োজনে তার জন্য জীবন উৎসর্গ করা। তাছাড়া ঈমান কখনো পূর্ণত্ব লাভ করতে পারে না।"

বস্তুত পিতা-মাতা সন্তানাদি এবং অন্যান্য মানুষকে যেভাবে ভালোবাসা যায় তার চেয়েও গভীরভাবে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)কে ভালোবাসতে হবে। যদি কখনো অন্য মানুষের ভালোবাসার সাথে নবী করীম (সা)এর ভালোবাসার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, হোক সে পিতা-মাতা, কিংবা আদরের সন্তান অথবা প্রিয়তমা স্ত্রী বা অন্য কোন মানুষ-তবে সবকিছুকে উপেক্ষা করে নবী প্রেমে অটল থাকা ও তাঁর মর্যাদা এবং দাবীকে যথাযথভাবে রক্ষা করে চলাই ঈমানের দাবী।

প্রকৃতিগত টান এবং নফসের প্ররোচনাই হলো পার্থিব ভালোবাসার চালিকা শক্তি। এ দু'টোর প্রভাব বলয় হ'তে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং রাসূল (সা) এর উপস্থাপিত আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ঈমানের দাবীও অসার। কেননা হুজুরে পাক (সা) নিজেই বলেনঃ

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهٖ -

"তোমাদের মধ্যে কেউই পূর্ণ মু'মিন হতে পারে না, যতোক্ষণ না তার নফস বা কামনা বাসনা আমার উপস্থাপিত আদর্শের অনুগত ও অনুগামী হবে।"

(শরহুস সুন্নাহ্)

এ কথার সাক্ষ্য আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন নিজেই দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ه

"হে নবী। লোকদেরকে বলে দাও। তোমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহ্র ভালোবাসা পোষণ করো তবে আমার অনুসরণ কর; তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ্ মা'ফ করে দিবেন। তিনি বড়োই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।" (সূরা আলে ইমরানঃ ৩১)

রাসূলের আনুগত্য আল্লাহ্র আনুগত্যের সমান মর্যাদা সম্পন্ন। আল্লাহ্ বলেন-

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ-

'যে ব্যক্তি রাসূলের অনুসরণ করলো সে যেনো স্বয়ং আল্লাহ্র অনুসরণ করলো (সূরা আন-নিসাঃ ৮০)

সুতরাং নবী করীম (সা) এর অনুসরণ করে চলা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা উপরোক্ত আয়াত হতেই স্পষ্ট হয়ে যায়। বাস্তবে নবীর অনুসরণ অনুকরণ না করা নবীকে অস্বীকার করার শামিল। মুখে যতো দাবীই করা হোক না কেন তার কোন মূল্যই হতে পারে না যতোক্ষণ না নবীর আনুগত্য ও অনুসরণ করা যায়। এমন কি জান্নাতে যাওয়া অথবা না যাওয়ার ফায়সালা ও নবীর অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قِيلَ وَمَنْ أَبَى؛ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى-

"আমার উম্মতের প্রত্যেকই জান্নাতে যাবে কিন্তু যে (আমাকে) অস্বীকার করেছে, (সে জান্নাতে যেতে পারবে না।) জিজ্ঞেস করা হ'লোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে অস্বীকার করেছে? উত্তরে নবী করীম (সা) বললেনঃ যে আমার অনুসরণ করলো সে জান্নাতে যাবে, আর যে ব্যক্তি অনুসরণ করলোনা সে-ই অস্বীকার করলো।" (বুখারী)

বস্তুতঃ এতায়াত বা অনুসরণই হচ্ছে নবী প্রেমের একমাত্র মাধ্যম। যদি কেউ এ মাধ্যম অবলম্বন করে তবে তা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রামে নিয়োজিত হয়; তবে সেটা এত কঠিন ও দূরূহ কাজ যে, তার সমস্ত সামর্থ্য ও কর্মক্ষমতা এ পথেই নিয়োজিত করতে হয়। ফলে জীবিকা অর্জনের সময়টুকুও ঠিকমত জোটেনা। তাই বাধ্য হয়েই তাকে দরিদ্রতার জীবন যাপন করতে হয়।

তাছাড়া ইসলাম তথা নবীর শিক্ষাই হচ্ছে ইহকালের চেয়ে পরকালের গুরুত্ব দেয়া। কেননা দুনিয়ার চাকচিক্য, মায়া-মোহ, লোভ-লালসা মানুষকে পরকালের চিন্তা হতে উদাস করে দেয়। সামান্য ক'দিনের সুখ ভোগ অনন্তকালের শাস্তির কারণ হয়েও দাঁড়াতে পারে। তাই পরকালের শাস্তি থেকে বাঁচার আশায় দুনিয়ায় দুঃখ কষ্টকে স্বীকার করে নেয়াই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ পরকালিন সুখ শান্তিই হচ্ছে চিরন্তন ও শ্বাশত। তাই আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে রাসূল প্রেম কোন মৌখিক দাবী বা বিলাসিতার বিষয় নয় বরং কঠিন পরীক্ষা ও দুঃখ কষ্টের জন্য প্রস্তুতির অঙ্গীকার মাত্র।

শিক্ষাবলী

(১) রাসূল (সা) কে ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে তাঁর আদর্শকে ভালোবাসা ও তাঁর অনুসরণ করা।

(২) নবী প্রেমকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে বহু বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে। এমনকি জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিতে হবে।

৩। পিতা-মাতা, আদরের সন্তান অথবা প্রিয়তমা স্ত্রী বা অন্য যে কোন মানুষের ভালোবাসার উর্দ্ধে রাসূলের ভালোবাসার স্থান ও মর্যাদা দিতে হবে।

(৪) নিজের ইচ্ছা কামনা-বাসনা সবকিছুকে রাসূল (সা) প্রদত্ত আদর্শের ছাঁচে ঢেলে সাজাতে হবে।

(৫) রাসূল (সা) এ অনুসরণ-অনুকরণ করাই হচ্ছে আল্লাহ্র ভালোভাসা ও অনুগ্রহ লাভের একমাত্র মাধ্যম। এমন কি রাসূল (সা) এর অনুসরণ আল্লাহ্কে অনুসরণের সমতুল্য।

(৬) রাসূল (সা) কে অনুসরণ অনুকরণ করা না করার মাধ্যমেই জান্নাত-জাহান্নামের ফায়সালা নিহিত।

(৭) রাসূল (সা) প্রদত্ত মিশনকে বাস্তবায়নের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

(৮) ইহাকালের চেয়ে পরকালের গুরুত্ব বেশী দিতে হবে এবং পৃথিবীতে সাদাসিদা জীবন যাপন করতে হবে। এমনকি দরিদ্রতাকে হাসিমুখে বরণ করে নিতে হবে।

তথ্য সূত্র

(১) তাফহীমুল কুরআন-সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রাহ)
(২) হাদীস শরীফ ১ম খণ্ড-মাওঃ আবদুর রহীম
(৩) বুখারী শরীফ-
(৪) মুসলিম শরীফ-
(৫) ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ-মাওঃ সদরুদ্দীন ইসলাহী।



প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭, ফোন: ৮৩৫৮৭৩৪, ০১৭১১-১২৮৫৮৬

